রহস্যাবৃত ভাওয়াল সন্ন্যাসী

বারিদবরণ ঘোষ

পরিচয় পাবলিশার্স

উৎসর্গ

তপন বসু

অরুণ বসু

সাগরিকা মিত্র

স্বজনগণ

আত্মপক্ষ

বিশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকের অবিভক্ত বঙ্গদেশ একটি লোমহর্ষক মামলার কারণে খুবই আলোড়িত হয়েছিল। এর কিছুকাল আগে প্রায় একই চরিত্রের একটি মামলা নিয়েও ভারতীয় সংশ্লিষ্ট মহলে খুবই হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। পাঠকের হয়তো মনে পড়ে যাবে বর্ধমান রাজপরিবারের জাল প্রতাপচাঁদ মামলার কথা। এই কাহিনি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একখানি উপন্যাস পর্যন্ত লিখে ফেলেছিলেন *জাল প্রতাপচাঁদ* নামে। সেই আলোড়নের ঢেউ একাল পর্যন্ত বয়ে এসেছিল। ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাভাজন গৌতম ভদ্র এই মামলার পুনর্বিচার করে পুনশ্চ একটি বই লিখতে উৎসাহিত হয়েছিলেন।

ঢাকার 'ভাওয়াল-বংশের' রাজপরিবার নিয়েও এমনতর ছদ্ম-ব্যক্তি-পরিচয়ের একটি মামলা নিয়ে বোধকরি আরও আলোড়িত হয়েছিল এই দেশ। প্রতাপচাঁদের মতোই এই পরিবারের মেজরাজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়ের অসুখ, মৃত্যু, নিরুদ্দেশ, প্রত্যাবর্তন, পরিচয়ের হেঁয়ালি, সেই হেঁয়ালি ভেদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটা প্রায় তিনদশকব্যাপী একটি মামলার সঙ্গে রাজপরিবার, সাধারণ মানুষ এবং সমাজ খুবই জড়িয়ে পড়েছিল। প্রথম দফায় এই মামলার ঐতিহাসিক রায়, পরে হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্ট-প্রিভি কাউন্সিল হয়ে সেই প্রাথমিক রায়েরই বহাল হয়ে যে রহস্য ঘনীভূত হয়—তা খুবই মনোরম। প্রথম বিচারক অধ্যাপক পান্নালাল বসু যে রায় দিয়েছিলেন—এক সময় সেই দীর্ঘ রায় ইংরেজিতে বই আকারে প্রকাশিতও হয়। মোটামুটি সেই রায়কে ভিত্তি করে বাংলায় একাধিক বইপত্রও লেখা হয়; কেউ কেউ তার অক্ষম অনুবাদও করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এই মামলা যে এখানে শেষ হয়নি—বিলেত পর্যন্ত ঘুরে এসেছিল যে মামলা—তার বিবরণ নিয়ে বাংলাতে বই লেখা আর হয়ে ওঠেনি। অথচ এর পরবর্তী পর্যায়টিতে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়। মেজকুমারের আবার জিত

হয়, শেষ মামলাতে জয়লাভের সংবাদে ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে পুজো দিতে গিয়ে তাঁর অভাবিত মৃত্যু। ভাওয়াল রাজবংশের শেষ পরিণাম, এমনকী রাজবাড়ির হালফিল সংবাদ নিয়ে আর কেউ বাংলায় কালি খরচ করলেন না তেমন করে। এর মধ্যে তারা আলি বেগের মতো মহিলারা মেজকুমারের পত্নীর সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি মনোরম উপন্যাস এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো নিষ্ঠিত পরিশ্রমী লেখক একটি সন্দেহকে সজীব রেখে ইংরেজিতে যে বই লেখেন তাদের কাছে বর্তমান লেখকের মতো ঋণ স্বীকার করে কোনও উদ্যোগ ইদানিংকালে দেখলাম না। এমনকি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো অনুসন্ধিৎসু মানুষ, ১৯৩০ সালে প্রকাশিত নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের *The Bhawal Kumar Mystery* এবং শৈলেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত *ভাওয়াল মামলার রায় ও কুমারের আত্মকথা* নামক দুটি অতি উল্লেখযোগ্য বই দেখতে পাননি—তা ভেবে অবাক লাগে। নীলকান্তবাবু আবার স্বচক্ষে-স্বকর্ণে এই মামলার আদিপর্বের খোঁজখবর রেখেছিলেন এবং দ্বিতীয় বইটি দুষ্প্রাপ্য সব নথি, ছবির আকর ছিল। ঘটনাচক্রে আমি এগুলি দেখতে পেয়েছি এবং সেজন্যেই সাহস করে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলাটির আদি ও অন্ত্যপর্ব নিয়ে বাংলাতে প্রথম একটি বই লিখতে সাহসী হই। এই লেখাটি কোনও মতেই সম্ভবপর হত না—যদি না *বর্তমান* পত্রিকার শ্রীমতী কাকলি চক্রবর্তী ও তাঁর স্বামী প্রিয়ভাজন সহকর্মী অধ্যাপক ড. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী এটি লেখার জন্যে আমাকে বরাত না দিতেন।

লেখাটি *বর্তমান* শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হলে বহু মানুষের আশীর্বাদ-শুভেচ্ছায় আমি প্লাবিত হই। কিন্তু দু-একজন তন্নিষ্ঠ পাঠক আমার তথ্যে অবিশ্বাস প্রকাশ করেন। পাঠকবর শ্রীপ্রসিত রায়চৌধুরী পত্রিকা বিভাগে একটি চিঠিতে আমাকে 'গঞ্জিকা সেবী' বলে রচনায় উদ্ধৃত সুভাষচন্দ্র বসু-এমিলি শেঙ্কেল পত্রালাপ ও ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার যে প্রসঙ্গ আমি লিখেছিলাম, তাকে কটুকথায় অস্বীকার করেছেন। অতিসম্প্রতি, বইটি যখন ছাপা হচ্ছে তখন শালিখা-বাসী লেখক অনুপম মুখোপাধ্যায় টেলিফোনে আমাকে এই বিষয়টির যোগ্যতা বিষয়ে সতর্ক করে জানান—এ বিষয়ে আমাকে তাঁরা একটি চিঠি দিতে চলেছেন। প্রসিতবাবুর চিঠির উত্তর আমি দিতে পারিনি—যা আমার স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। কারণ অকারণ তিক্ততা আমি পরিহার করতে চেয়েছি।

অনুপমবাবুকেও আমি সৌজন্যে সহাস্যে বিষয়টি যে কল্পিত ব্যাপার নয়— তা জানাই। তবে ফোনে তাঁকে উৎসবিষয়ে সঠিকভাবে অবহিত করিনি— গ্রন্থের ভূমিকায় তা জানাবো বলেই। বস্তুত শ্রদ্ধেয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ই এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শিশিরকুমার বসু ও সুগত বসু সম্পাদিত *Netaji Collected Works*-এর সপ্তম খণ্ডে মুদ্রিত 'Letters to Emilie Schenkl 1934-1942' অধ্যায়ে (পৃ. ৮১-৮৪) মুদ্রিত সুভাষচন্দ্রের একটি চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধার করে দিলেই, ভরসা করি, সকলে তুষ্টিলাভ করবেন। আমি প্রসিতবাবুসহ সকলেরই প্রসন্নতা প্রার্থনা করি। সুভাষচন্দ্র এসময়ে জাতীয় কংগ্রেসের নেতা এবং কার্সিয়াং-এ অন্তরীণ ছিলেন। অস্ট্রিয়াবাসী এমিলি শেঙ্কলকে তিনি লিখেছিলেন :

C/o The Superintendent of Police
Darjeeling
The 29th August, 1936

Dear Friend Schenkl
...During the last few days our papers are full of a sensational case in which judgement has been delivered by the judge, after a hearing lasting about 3 years. The facts of the case are so fantastic that one can very well say that 'truth is stranger than fiction'. Since you are in the habit of writing articles, I am sending you some cuttings from which you will get material for writing an article. I believe magazines like Das Magazin, Wiener Magazin of even Sunday editions of New Frie Press or Wiener Tagblatt would welcome such an aritcle for the entertainment of their readers about the 'exotic East'........

অনেকেই এসময়ে মুদ্রিত বেশ কয়েকটি পুস্তিকা, কবিতা, ইত্যাদি দেখে থাকবেন। আমি প্রায় ৪০টি পুস্তিকা দেখেছি, কয়েকটি ব্যক্তিগত সংগ্রহেও আছে। তা থেকে কিছু কবিতা উপহার দিয়েছি। পান্নালাল বসু প্রদত্ত রায় ইংরেজিতে পুনর্মুদ্রিত হলে যা প্রায় সাড়ে চারশো পৃষ্ঠা হবে—তা আমরা ছাপতে পারিনি। কিন্তু এই রায়ের যে সংক্ষিপ্তসার বাংলায় পেয়েছি—তা পরিশিষ্টে ছেপে দিলাম, সঙ্গে দিলাম মেজকুমারের 'আত্মকথা'টিও। এটিও

সমকালে মুদ্রিত হয়েছিল। ফলে বইটি আরও তথ্যবহুল হল। আমি প্রকাশিত যাবতীয় তথ্য দেখতে ত্রুটি করিনি, তবুও কিছু নথি যে দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি— এমনটিই বা বলি কি করে!

বইটিতে রায়-পরিবারের বিবিধজনের ছবি ছাপানো গেল—সাম্প্রতিককালের কোনও বইতে যা পাওয়া যাবে না। এই রচনাটি লেখার সুবাদে আমার আত্মীয়লাভ ঘটেছে—এটি সানন্দে ঘোষণা করে আমি গর্ব অনুভব করছি। *বর্তমান*-এ লেখাটি প্রকাশের পর পত্রিকাদপ্তর থেকে আমার টেলিফোন নম্বর সংগ্রহ করে পান্নালাল বসুর অন্যতম পুত্র শ্রীতপন বসু আমাকে আশীর্বাদ করেন। পরে অন্যতম পুত্র শ্রীঅরুণ বসুও আমাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তপনবাবুর কন্যা সাগরিকা মিত্র স্বামী অঞ্জন মিত্র ও পুত্রসহ আমাকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধেছেন। তাঁরা আমার অর্জন ও প্রাপ্তিবিশেষ। প্রকাশক গৌরদাস সাহাও আমার অর্জন, তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

ভাওয়াল রহস্যের কিনারা করা যায় কিনা জানি না। আমি আইনকানুন মেনে চলি—আদালতের মানহানি করে কারাদণ্ড পাবার কিছুমাত্র বাসনা নেই। আমারও মনে হয়েছে সন্ন্যাসীই রাজা। আমাদের মনে হওয়াতে কিছুই যায় আসে না এখন। কিন্তু রহস্যটির অভিনবত্ব এখনও কৌতূহল জাগায়। রসিক পাঠক সে কারণেই এতে স্বাদ পাবেন ভরসা করি।

বারিদবরণ ঘোষ

সূচি

এক

ক

ইংরেজি ১৯২০-২১ সালের কথা। শেষ ডিসেম্বর-জানুয়ারির শুরুতে ঢাকায় বেশ শীত পড়েছে। সন্ধে হতেই সবাই ঘর-মুখো। তারপর জানলা-দরজা বন্ধ। মাঝরাতে হাওয়ার শিরশিরানি শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। গোটা শহর চাদরমুড়ি দিয়ে নিদ্রামগ্ন। রাত নিশুতি, বারোটার ঘণ্টা বেজে গেছে। হুস হুস করে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল ঢাকা স্টেশনে। স্টেশন-মাস্টারবাবুটি আপাদমস্তক চাদর-টুপিতে ঢেকে ঘরের বাইরে পা দিতে পর্যন্ত ভরসা পাচ্ছেন না। প্যাসেঞ্জারের ওঠা-নামার সংখ্যা হাতে গোনা যায়। একজন লোকের দিকে তাঁর নজর গেল। একজন সাধু। এই চরম শীতেও নগ্নগাত্র, এক চিলতে উড়ানি পর্যন্ত গায়ে নেই, পরনে শুধু একটি লেংটি। মাথায় জটা, সমস্ত মুখটা এমন করে দাড়িগোঁফে জড়ানো যে ঠাহর করে দেখলেও তাঁর মুখটি চেনার জো নেই। একটা পুঁটলি, একটা লোটা মাত্র সম্বল। গোটা গায়ে ছাই মাখানো। লোকটা ফরসা কি কালো, বোঝে কার বাপের সাধ্যি।

স্টেশনে পা দিয়েই, অত রাতেও সাধুবাবার মনে হল, স্টেশনটা তাঁর বড্ড চেনা, যেন কতবার এর উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করেছেন। নাক-বের-করা টুপি পরা স্টেশন মাস্টারের ভ্রূ-দুটো কুঁচকে রইল, সাধুবাবা আস্তে আস্তে রেলচত্বর পার হয়ে গেলেন কিন্তু কোথায় যাবেন? এত রাতে কোথায় পাবেন আশ্রয়! তাই আবার ঘুরে সেই স্টেশনে ঢুকলেন—সব শুনশান। রেল অফিসের বড়ো দরজাগুলো পর্যন্ত ভেজানো। চোরেও এত ঠান্ডায় চুরি করার কথা পর্যন্ত ভাবে না। প্ল্যাটফর্মে একটা বড়ো গাছের নীচে একটা লম্বা বেঞ্চ। তাতেই গিয়ে সাধুবাবা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। আকাশে তারাদের চাঁদোয়া, ক্ষীণ

চাঁদের ম্লান আলো বড়ো মায়াময়। হিন্দিতে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করে সাধুবাবা শুয়ে পড়লেন। একটু দূরে আর একটা গাছের নিচে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে একটা কুকুর। সে পর্যন্ত একটিবার চোখ খুলে দেখেই আরও গুটিয়ে গেল। নিদবুড়ি এল—সাধু ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোর হতেই তিনি উঠে পড়লেন। গুছিয়ে নিলেন লোটা-কম্বল। রওনা দিলেন তাঁর যেন অনেকদিনের চেনা সদরঘাটের দিকে। এখন এই রাস্তা ঢাকা শহরের ব্যস্ততম অঞ্চল সদরঘাট-পারঘাটের দিকে প্রসারিত। বুড়িগঙ্গা নদীর চর পার হয়ে এক পার থেকে অন্য পারে এগিয়ে গেলেন সাধুবাবা। তারপরে গিয়ে উঠলেন সুবিখ্যাত বাকল্যান্ড ব্রিজের উপরে। ব্রিজের ধারে, ঢাকার সেকালের প্রসিদ্ধ জমিদার প্রয়াত রূপলাল দাসের বাড়ি। সামনে (সে বাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে ভগ্নদশা নিয়ে প্রাচীন ঐতিহ্য আর সম্ভ্রম জাগিয়ে) একটা ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানেই বসে পড়লেন তিনি। বুড়িগঙ্গায় স্নান করে সমস্ত শরীরে ছাই মেখে এসে প্রতিদিন এই সন্ন্যাসী ধুনি জাগিয়ে বসে থাকতে লাগলেন। আসা-যাওয়ার পথে পথচারীরা কৌতূহলে দেখেন এক দীর্ঘদেহী সাধুবাবা অহোরহ ধুনি জ্বালিয়ে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সর্বদা সেই আচ্ছাদনহীন জায়গায় আসীন। সাধুবাবা মৌনী, কথাই বলেন না। দু-চারজন ভক্তিপরবশ হয়ে একটা-দুটো আধলা-আনি-দু' আনি-তামার পয়সা ছুড়ে দেয়, সাধুবাবা তাকিয়েও দেখেন না। কেউ কেউ একটু বেশি কৌতূহলী হয়ে দেখেন, পুরোনো মানুষদের কেউ কেউ ঠাহর করে দেখে ভ্রূ কুঁচকে কী-যেন ভাবতে ভাবতে চলে যান। মানুষটাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। সুগঠিত কমনীয় দেহ, মনে সম্ভ্রম জাগায়!

এমনি করে মাস চারেক কেটে গেল। সাধুবাবা নট নড়নচড়ন। অনেকে ভিড় করেন, সাধুবাবা বিকারহীন। তাঁরা জড়িবুটি চাইলে শেষে সাধুবাবার মুখ ফুটল; তিনি হিন্দিতে জবাব দেন—ওসব আমি জানি না, হামি ওর বেওসা করি না। দু-একজন পরে বলতে লাগলেন—সাধুবাবা তাঁদের বলেছেন—তিনি নাকি পাঞ্জাব থেকে এসেছেন, কোন্ ছোটোবেলায় তিনি ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এসেছেন। কেউ রটিয়ে বেড়ান—সাধুবাবা তাঁর বাবা-মা-স্ত্রীকে ছেড়ে পালিয়ে এসে সন্ন্যাসী হয়েছেন। জড়িবুটির জন্যে যাঁরা জেদাজেদি করেন—তাঁদের তিনি ধুনি থেকে তুলে কিংবা পুঁটলি থেকে বের করে এক চিমটে

ছাই দেন বড়ো জোর—জড়িবুটি কখনও নয়। এরই মধ্যে কেউ কেউ রটিয়ে দিলেন—দেখো দেখো, এই সাধুবাবার চেহারার সঙ্গে ভাওয়ালের 'হারিয়ে যাওয়া' মেজকুমারের কী আশ্চর্য মিল। লোকমুখে শুনতে পেয়ে ভাওয়াল রাজবাড়ির বড়োমেয়ে জ্যোতির্ময়ীর ছেলে বুদ্ধু এসে খুঁটিয়ে দেখে গেলেন। মাকে গিয়ে বললেন—মা, এ আমাদের মেজমামা ছাড়া আর কেউ নয়!

১৯২১ সালের ৫ এপ্রিল, কাশিমপুরের জমিদার পরিবারের কনিষ্ঠ অতুলপ্রসাদ রায়চৌধুরি এইসব কানাঘুসো শুনে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সন্ন্যাসীকে নিয়ে এলেন তাঁদের বাড়িতে। তিনি ভাওয়ালের মেজকুমারকে বিলক্ষণ চিনতেন। আসলে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল—ইনি যদি সাধুবাবাই হন, তবে তাঁকে দিয়ে একটা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়ে নেবেন যাতে অপুত্রক পরিবারে একটা পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। সব শুনে সন্ন্যাসী বললেন—বাপু, আমি এসব যজ্ঞের অ-আ-ক-খ কিছুই জানিনে। তিনি জমিদার বাড়িতে থাকলেন না পর্যন্ত। সপ্তাহখানেক একটা গাছের নীচে কাটিয়ে দিলেন। ১২ এপ্রিল তাঁকে নিয়ে আসা হল জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে একটা হাতির পিঠে চড়িয়ে। হাতি এসে দাঁড়াল রাজবাড়ির দেউড়িতে। তখন সবে সন্ধে লেগেছে।

খ

ভাওয়াল— মেজকুমার— জ্যোতির্ময়ী— বুধু— জয়দেবপুর— রাজবাড়ি— সন্ন্যাসী— এ-সব কী? এঁরা কারা? —এঁরা যাঁরা, তাঁদের নিয়ে গত শতকের প্রথম পাঁচটি দশকের বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশই বা বলব কেন, ভারতবর্ষের অনেকগুলো দেশই প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছিল। পুরোনো পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিভাগের একটা বড়ো পরগনা ছিল ভাওয়াল। এটা নাকি এক সময়ে চেদিরাজ শিশুপালের রাজ্য ছিল। অনেক পরে 'ভাওয়াল গাজি' নামের এক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে এর জায়গির পান, আর তারই নামে জায়গার নাম হয় 'ভাওয়াল'। এখানে একটা থানা ছিল, সেকালের ই বি রেলওয়ের অধীনে একটা রেলস্টেশনও ছিল। নারায়ণগঞ্জ থেকে মাইল তিরিশেক আর ময়মনসিংহ থেকে ৫৬ মাইল দূরবর্তী এই স্থান। ভাওয়াল গাজির বংশধর

ফজল গাজির ছেলে ছিলেন দৌলত গাজি। তাঁর সরকারে দেওয়ান পদে যোগ দেন বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ, নাম কুশধ্বজ। বাবার মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে বলরাম রায়ও ওই দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত হন। নানা ঘটনা বিপর্যয়ে ওই তালুক দৌলত গাজির হাতছাড়া হয় এবং নবাব বলরামকেই সম্পত্তির মালিক করে দিয়ে 'রায়চৌধুরি' উপাধি দান করলেন। এই বলরাম রায়ই আমাদের 'মেজকুমারে'র জয়দেবপুর-রাজবংশের সূত্রপাত ঘটান। বলরামের ছেলে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ রায়চৌধুরি। তিনি কুশধ্বজের বাসস্থান চান্না (বা চান্দনা) গ্রাম থেকে ভদ্রাসন সরিয়ে নিয়ে আসেন 'পীড়াবাড়ি'তে ('পীড়াবাড়ি' নামেও পরিচিত)। শ্রীকৃষ্ণ রায়চৌধুরির তিন ছেলে—জগৎ, শ্যাম আর জয়দেব। এই জয়দেব রায়চৌধুরির নাম থেকেই পীড়াবাড়ির নাম একেবারে বদলে গিয়ে হয় জয়দেবপুর। জয়দেববাবুর একটি মাত্র ছেলে ইন্দ্রনারায়ণ। ইন্দ্রনারায়ণের তিন ছেলের মধ্যে ছোটোছেলে কীর্তিনারায়ণ। কীর্তিনারায়ণেরও তিন ছেলে। কিন্তু এমনই কপাল তাঁর যে, তিনটি ছেলেকেই বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়। তখন রাজ্যরক্ষার জন্যে জ্যাঠামশাই উদয়নারায়ণের ছেলে রাজনারায়ণকে জমিদারির ভার দেওয়া হয়। এক সময় তাঁরও মৃত্যু ঘটল। তখন জমিদারি পান কাকা লোকনারায়ণ (কীর্তিনারায়ণের মেজভাই)। তিনি বিয়ে করেছিলেন সিদ্ধেশ্বরীদেবীকে। পত্নী সিদ্ধেশ্বরীকে রেখে লোকনারায়ণ যখন মারা যান তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলোকনারায়ণ একেবারে নাবালক। ফলে সম্পত্তি নিয়ে তাঁকে খুব নাস্তানাবুদ হতে হয়। গোলোকনারায়ণ ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলে বড়ো হয়ে সম্পত্তির দেখাশোনায় বিমুখ হন। সিদ্ধেশ্বরীদেবী বাধ্য হয়ে তাঁর প্রায়-নাবালক কনিষ্ঠ সন্তান কালীনারায়ণকে জমিদারির ভার অর্পণ করেন।

এই কালীনারায়ণই পরে সরকার-কর্তৃক 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। জয়দেবপুরের রায়চৌধুরি (পরে শুধু 'রায়') বংশ তখন থেকেই রাজবংশের তকমা পেয়ে গেল। সে হল গিয়ে ১৮৭৮ সালের কথা। লাটসাহেব নর্থব্রুক নিজে দিলেন তকমা ঝুলিয়ে—কালীনারায়ণকে তিনি বলতেন—'পূর্ববঙ্গের গৌরব'। জানি না, এটা ব্রিটিশ-তোষণের ফললাভ কিনা! কিন্তু গোলোকনারায়ণই নিজ প্রাসাদের পশ্চিমে বিশাল দিঘি, ঘাট, মাধববিগ্রহ স্থাপন ও দেবমন্দির নির্মাণ করেন। পরে ঢাকা শহরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে নলগোলায় একটি দারুণ

সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। গোলোকনারায়ণ মারা যান বাংলা ১২২৬ সনের ১৩ পৌষ।

গ

কালীনারায়ণ আদব-কায়দাদুরস্ত, ইংরেজিতে চোস্ত ছিলেন। সাহেবদের কাছে বন্দুক চালাতে শিখেছেন। জমিদারির আয় বাড়ালেন বিলক্ষণ। সুপ্রশস্ত রাজপথ, বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ডাকঘর আর অতিথিশালা তৈরি করিয়ে তিনি রাজপরিবারের গৌরব অনেকখানি দিলেন বাড়িয়ে। আরও একটা কাজ করলেন তিনি। ঢাকার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বুড়িগঙ্গার পাড় বাঁধানোর জন্যে বিশ হাজার টাকা দিলেন। বাকল্যান্ড সাহেবের নামানুসারে ওই বাঁধের নাম হল বাকল্যান্ড বাঁধ। ওই বাঁধের উপরেই আমাদের সাধুবাবা গিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে ডেরা বানিয়েছিলেন।

কালীনারায়ণ তিনটি বিয়ে করেছিলেন। ছোটোপত্নী ছিলেন সত্যভামা। একমাত্র ইনিই একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁদের নাম ছিল যথাক্রমে, রাজেন্দ্রনারায়ণ ও কৃপাময়ী। রাজেন্দ্রনারায়ণের পত্নীর নাম বিলাসমণি। পিতা তাঁকে জমিদারির ভার দিয়ে *বান্ধব* সম্পাদক সুখ্যাত সাহিত্যসেবী কালীপ্রসন্ন ঘোষকে তাঁর ম্যানেজার নিযুক্ত করে দেন। কালীপ্রসন্নকে পরে তহবিল তছরূপ ও নানান অপকর্মের দায়ে কর্মচ্যুত হতে হয়। তা ছাড়া সভাকবি গোবিন্দচন্দ্র দাসকে তাঁর জন্যই জন্মভূমি থেকে নির্বাসিত হতে হয়।

ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা ভাওয়াল আমার প্রাণ
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান।
তার সে মধুর প্রীতি, মনে জাগে নিতি নিতি
তাহার মমতা মায়া বুকে ডাকে বান।
ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ।

সেখানের লোকে বলতেন—এক ঢিলে নাকি দুই 'কোঁড়া' মরে না। সেই প্রবাদটাই সার্থক হয়েছিল।

রাজেন্দ্রনারায়ণ জয়দেবপুরে একটি সুরম্য প্রাসাদ তৈরি করালেন—নাম তার 'রাজবিলাস'। এমনকি জলের কলের জন্যে প্রচুর পয়সাকড়ি খরচ করেন।

বাংলা ১২০০ সনে তাঁকেও সরকার 'রাজা বাহাদুর' উপাধিভূষিত করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হল। তিন পুত্র রণেন্দ্রনারায়ণ, রমেন্দ্রনারায়ণ আর রবীন্দ্রনারায়ণকে নিয়ে বিলাসমণি বিধবা হলেন। তাঁদের অছি হয়েই তিনি জমিদারি চালাতে লাগলেন যতদিন পর্যন্ত না কোর্ট অফ ওয়ার্ডস (সম্পত্তি অভিভাবকহীন) হল। ইংরেজ সরকার কোর্ট অফ ওয়ার্ডসকে তার নজরদারির ভার দিলেন তখন। ১৯০৭ সালে বিলাসমণির মৃত্যু পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। তিন পুত্র ছাড়া রাজেন্দ্রনারায়ণের তিনটি কন্যাও ছিল। রণেন্দ্রনারায়ণের বড়ো ছিলেন দুই দিদি—ইন্দুময়ী আর জ্যোতির্ময়ী আর রবীন্দ্রনারায়ণের পরেই জন্মেছিলেন তড়িন্ময়ী। এই তিন বোনের স্বামীরা ছিলেন যথাক্রমে গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বড়োকুমার রণেন্দ্রনারায়ণের বিয়ে হয়েছিল সুখ্যাত সুরেন্দ্র মতিলালের (পরে ইনি এই পরিবারের ম্যানেজারও হন) কন্যা সরযূবালার সঙ্গে। মেজকুমার রমেন্দ্রর বিয়ে হয় উত্তরপাড়ার সুন্দরী বিভাবতী ব্যানার্জির সঙ্গে (এঁর অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ আমাদের এই 'মনোহর কহানিয়া'র নাটের গুরু) এবং ছোটোকুমারের স্ত্রী ছিলেন আনন্দকুমারী। কোনো ভাইয়েরই সন্তান হয়নি। শেষ অবধি ছোটোরানি আনন্দকুমারী তাঁর নিজের ভাইপোকে দত্তক নেন সরকারের অনুমতিতে। এই দত্তকপুত্রের নাম হয় রামনারায়ণ।

এত সব পড়ার পর পাঠককে চশমা মুছতে হবে, মাথা চুলকোতে হবে কিংবা ঠিকঠাক মনে রাখার জন্যে একটা লম্বা ঘুমও দিতে হতে পারে। কিন্তু ওই সাধুবাবাকে জানতে হলে এঁদের সবার কথা জানতে হবে, মানতে হবে এবং মনে রাখতে হবে। এঁদের হাত ধরেই তো রহস্যের জাল একটু একটু করে খুলে যাবে। এরা সবাই 'চিচিং ফাঁকে' সেই মন্ত্রশব্দরাজি।

তাহলে আবার কিছু পরিচয় দিয়ে দিই। তিন কুমারের কথা বলেছি, বলেছি তাঁদের বউদের কথা (আবার পরে হয়তো আরও বিস্তারিত বলতে হবে)। এখন তিন কন্যার সাকিন জানাই। বিয়ে হয়ে গেলেও তিন কন্যার সাকিন কিন্তু জয়দেবপুর রাজবাড়ি। তাঁরা শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন না। জামাই বাবাজীবনরা ঘরজামাই ছিলেন এমন কথা বলা চলবে না, তবে অনেকটা সেইরকমই। বড়োমেয়ে ইন্দুময়ীর তিন ছেলে জিতেন্দ্র (বিলু), ক্ষিতীন্দ্র (জাবু), দ্বিতীন্দ্র (টেবু)। এঁর একটি মেয়ে সুরমা-ডাকনাম কেনি। মেজকন্যা জ্যোতির্ময়ীর এক

ছেলে, দুই মেয়ে। ছেলের ভালোনাম জলদচন্দ্র, ডাকনাম বুধু. মেয়েদের ভালো আর ডাকনাম হল প্রমোদবালা/মণি, বিভুবালা/হেনি। প্রমোদবালার স্বামী সতীনাথ (সাগর) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভুবালার বর বিভূতি বাঁড়ুজ্যে, তাঁর আরও একটি নাম ছিল—শেখর।

ছোটোমেয়ে তড়িন্ময়ীর বিয়ে হয়েছিল ব্রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বড়োবউ সরযূর বাবার কথা বলেছি। মেজবউ বিভাবতীর মা ছিলেন ফুলকুমারী, বাবা বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষ্ণুবাবুর বাড়ি ছিল হুগলি জেলার নোয়াপাড়ায় আর ফুলকুমারীর বাবা ছিলেন উত্তরপাড়ার মুখুজ্যেবাড়ির ছেলে নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বিভাবতীর ছেলেবেলাতেই তাঁর বাবা বিষ্ণুবাবুর মৃত্যু হয়। বিভাবতীর দাদা, আমাদের সকল অকাজের কাজি, সত্যেনবাবুর কথা আগেই বলে এসেছি। ফুলকুমারীর (বিভাবতী-সত্যেনের মা) একাধিক ভাই ছিল—সূর্যনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণ। অর্থাৎ এঁরা বিভাবতীর মামা। রাজার বাড়ি যখন তখন আরও লোকজন, আত্মীয়স্বজন, চাকর-বাকর, পোষ্যবর্গ, হাতি-ঘোড়ারাও ছিল। তাদের কথাপ্রসঙ্গে জানাব। এখন আমাদের মন পড়ে আছে সাধুবাবার কাছে, লোক এখন যাঁকে বলছেন 'মেজকুমার'। সাধুবাবা মেজকুমার হবেন কেমন করে?

ঘ

রাজবাড়ির পুরুষ-মহিলাদের খোঁজখবর নিলাম, এবার খোদ রাজবাড়ির তালাশ করি। জয়দেবপুর যেন একটা ছোটোখাটো রাজ্য। বাড়িটা ছিল ২৯৭ গজ × ১১০ গজ—এখনকার হিসেবে প্রায় তিরিশ হাজার স্কোয়ার ফুট। ছোটোবড়ো নিয়ে বাড়ির সংখ্যা দশ, গেট দিয়ে ঢুকেই 'বড়ো দালান'—এখানে রাজবাড়ির কেউ থাকতেন না। সাহেব-সুবোরা হামেশাই শিকার করতে আসতেন। তাঁরা এই বড়ো দালানের অতিথিশালায় এসে উঠতেন। এক সময়ে এখানের ম্যানেজার মি. মেয়ার, যাঁকে বিলাসমণি দূর করে দিয়েছিলেন পরে, তিনিও এই বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। এর বাইরে ছিল কাছারিবাড়ি, খাজাঞ্চিখানা, নাটমন্দির, বিলাসভবন, হাওয়ামহল, মাধববাড়ি, দেবমন্দির, পিলখানা, আস্তাবল, তকতকে

জলভরা দিঘি। হাতিশালে থাকত হাতি; আরদালি, বাবুর্চি, চাপরাশি, মাহুত, সহিস, দারোয়ান, বেয়ারা, মালি, কোচোয়ান, পাঙ্খাওয়ালা, পালোয়ান, গাইয়ে-বাজিয়ে, দেওয়ান-ম্যানেজার, মুহুরি-সেক্রেটারি, শিক্ষক-পুরোহিত, ঝি-চাকর, ইয়ার-দোস্ত-মোসাহেব নিয়ে রাজবাড়ি দিনে-রাতে সরগরম। এমনি এলাহি ব্যাপার না হলে সে আবার কিসের রাজবাড়ি। দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন মহিমবাবু, পরে সে দায়িত্ব নেন তাঁর ছেলে ডাক্তার আশুতোষ দাশগুপ্ত—রানি বিভাবতীর ক্ষণজন্মা দাদা সত্যেন ব্যানার্জির সব কর্মের ডান হাত!

বড়োকুমার রণেন্দ্রনারায়ণ মানুষ ভালো, তবে সহসা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ। সুরায় যথেষ্ট ভক্তি এবং নারীতে সমধিক। মোটাসোটা মানুষ, মোসাহেবেরা যেমন বোঝান তেমনি বোঝেন, কার্যক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে অদৃশ্য হন। স্ত্রীকে যে ভালোবাসেন না, এমনটি নয়। বাইরে বাইরে থাকতেই ভালবাসেন। ছোটোকুমার রবীন্দ্রনারায়ণ মোটামুটি দাদার পথগামী। ঈশ্বরের ইচ্ছায় নারী সঙ্গ পেলে বহুত খুশি হন। আর মেজকুমার রমেন্দ্রনারায়ণের কথা আর কী বলব। অথচ ওঁর কথাই সাতকাহন করে বলতে হবে। উনিই হলেন আমাদের এই কাহিনির মধ্যমণি। ইনিই রাজা, আবার ইনিই কি সন্ন্যাসী?

তা 'সন্ন্যাসী' হবার আগে এঁর নিরাসক্তি-আসক্তির একটা খতিয়ান করে নিতে হবে, নইলে শেষ অবধি ঠিকে মিলবে না। একেবারেই কি মেলাতে পারব! রাজার ছেলে। বাপ-ঠাকুরদা ইংরেজের খেতাব পেয়েছেন, একটু লেখাপড়া না শিখলে কি চলে? দ্বারিকা মাস্টারমশাই আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ছাত্রের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন না। ছাত্র তাঁর ধুতি খুলে দেয়, নাকানিচোবানি খাওয়ায়—কিন্তু শাস্তি বিধান তো করতে পারবেন না। রাজার ছেলে বলে কথা! শেষ পর্যন্ত চাকরিটি খোয়াতে হবে, নয়তো গর্দানই যাবে। ফলে ক খ গ ঘ শেখানোও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে দ্বারিকাবাবুরা সৎ এবং গরিব—শত অপমানেও মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন, পরিবারের পোষ্যদের একজন হয়ে। বাড়িতে সাহেব-সুবোরা আসেন—দু-পাতা ইংরেজি পড়া দরকার। তাই রমেনের জন্যে সাহেব মাস্টার হোয়ার্টন সাহেব এলেন। এলেন বটে। কিন্তু অচিরেই রণে ক্ষান্তি দিলেন। হতাশ সাহেব রানি বিলাসমণিকে ইংরেজিতে চিঠি দেন :

Not only have your sons neglected their studies in every possible way, but they have in no way attempted to reform their deplorable bad habits, and it is quite in evidence to me. That they have no intention whatever of taking my advice or accepting my tuition'...

ভেবেছিলাম আপনার তিন ছেলেকে কিছু শেখাতে পারব। কিন্তু পড়াশোনায় তাদের অবহেলার অবধিমাত্র নেই, আমার কথা একটুও শোনে না। তাঁর অভিযোগের তির বেশি ছিল মেজকুমার রমেনের দিকে। একদিন সাহেবের শোলার টুপির মধ্যে সে একটা বিড়ালছানাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল। অমন সুন্দর জায়গা দেখে সে বেচারা ভয়ে-ডরে সেখানে যাবতীয় 'অপকম্ম' সেরে রেখেছিল। রমেনকে যখন বিলাসমণি জিজ্ঞেস করলেন—হ্যা বাবা, তুই সাহেব মাস্টারের কাছে ঠিক পড়িসনে কেন? রমেন মায়ের কথা শেষ হবার আগেই বলে বসেন—ওটা জানেটা কী? ওকে বরং আস্তাবলে পাঠিয়ে দাও; ঘোড়াদের ও বেশি ভালো সামলাতে পারবে। রানি দেখেশুনে ছেলেদের ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এরই মধ্যে ১৯০১ সালে তাঁদের বাবা রাজেন্দ্রনারায়ণ মারা গেলেন। বামুন গেল ঘর, তো লাঙল তুলে ধর। কুমারদের লেখাপড়ার এখানেই ইতি।

সরস্বতীর ঘরে অতএব তালা ঝুলল। কিন্তু অমন দুর্দান্ত ছেলেকে তো অন্দরমহলে বেঁধে রাখা যায় না। হাতির কান আর শুঁড় ধরে অবলীলায় তার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ানোতে তাঁর প্রবল উৎসাহ। রাজবাড়ির অতগুলো হাতির মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ফুলমালা হাতিটি। ঘোড়াশালায় গিয়ে তাদের দেখভাল করা, দানাপানি ঠিক পাচ্ছে কিনা, দলাই-মলাই ঠিকমতো হচ্ছে কিনা—এসব দেখায় রমেনের উৎসাহের অবধি নেই। ঘরেই একটা চিড়িয়াখানা বসিয়েছেন। সেখানে কুকুর, হাতি, চিতাবাঘ, ময়ূর, সাদা-লাল শেয়াল...কী আছে আর কী নেই! সোনালি গায়ের রং ছড়িয়ে কোঁকড়া চুল দুলিয়ে, খানিকটা কটা চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বাড়ি, পাড়া, গোটা জয়দেবপুর মাতিয়ে বেড়ান তিনি। ঢাকাতে টমটম রেসে নবাব সালিমুল্লাকে হারিয়ে বাজির হাজার টাকা জিতে নেন; ঘোড়দৌড়ে কলকাতায় এসে জিতে নেন ভাইসরয় কাপ, মণিপুর থেকে প্রশিক্ষক আনিয়ে রাজবাড়ির পোলো গ্রাউন্ডে পোলো খেলেন, বেআক্কেলি গাড়ি

হাঁকাতে ঢাকাতে তাঁর জুড়ি নেই, জোর করে মাছ ধরার নামে স্টেশনমাস্টারকে আটকে রেখে বিপর্যয় সৃষ্টিতেও ওস্তাদ এই মধ্যমকুমার। এইসব করতে গিয়ে একবার দিলবার হাতির পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে দাঁত পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল। সাধুবাবারও একটা দাঁত ভাঙা ছিল। আরও গুণ বেড়েছে বয়সের সঙ্গে বিলাসমণির এই আদরের খোকাটির। দিদি জ্যোতির্ময়ী গোসলঘরে স্নান করতে গেলে উঁকি-ঝুঁকি দিতে শিখেছেন এই গুণধর।

সবচেয়ে বিশ্রী ব্যাপারটা ঘটে গেল রাজবাড়িতে একটা নাচগানের জলসার আয়োজনে। রাতের নাচের আসর এলোকেশী খেমটাওয়ালির নাচে যখন বিলোল আর মেদুর, তখন তাকে দেখে রমেনের সারা শরীরে কামনার ঝড়। নাচের শেষে এলোকেশীকে বড়ো দালানের একটা নিভৃত ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘটান সেই ঝড়ের উপশম। অনেক আগেই হোয়ার্টন ছাড়া আর যে একজন সাহেব শিক্ষক ছিলেন, মি. মায়ার, তিনি রিপোর্ট দিয়েছিলেন বড়োকুমারের চরিত্রহীনতা সম্বন্ধে—'বড়োকুমার ওই বয়সেই দুশ্চরিত্রা নারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে।' আগ নাংলা যেমনে যায়, পাছ নাংলা তেমনি চায়। দাদার পথ ধরলেন রমেন এবং একটু বেশি এগিয়ে গেলেন। শুধু সেই রাতেই এলোকেশীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল না—এর জের চলল হাওয়াখানায় তাকে কদিন ধরে লুকিয়ে রাখার পর (মা বিলাসমণি বুঝি একটু কড়া হয়েছেন।) রমেন্দ্রনারায়ণের যাতায়াত বেড়ে গেল এলোকেশীর ঢাকার বেগমবাজারের বাড়িতে পর্যন্ত। যাওয়া-আসা এখানে নিয়মিত। অমিতাচারের চূড়ান্ত।

শুধু এলোকেশীতে মন আটকে থাকল না। ইয়ারবকশিদের নিয়ে নগদ টাকার আদ্যশ্রাদ্ধ করতেন মেয়েমানুষের পিছনে। বিখ্যাত নটী মালিকাজানের পিছনে একবার হাজার দশেক টাকা ঢেলে এলেন, ধার-কর্জ করতেও এ জন্যে তাঁর বাধে না। আর নটী কৃষ্ণভাবিনীরাও তো ছিলেন। দোস্ত আবদুল মানান তো সব কথাই কবুল করেছিলেন রমেনের কাছে যখন দেখা হয়েছিল। এত দোষ রমেনের, কিন্তু মদে তাঁর গভীর অনাসক্তি।

ঙ

দেখেশুনে বিলাসমণি বেশ বিচলিত। এর দাওয়াই হল ছেলের বিয়ে দেওয়া। তাই বড়োকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করে রমেন্দ্রনারায়ণের বিয়ে ঠিক করলেন। কনে রাজা রাজড়ার মেয়ে না হলেও চলবে। কিন্তু সহবতে খানদানি হতে হবে, আর সুন্দরী তো হতেই হবে। দেখেশুনে কামাখ্যা ঘটক ঠাকুর উত্তরপাড়ায় সম্বন্ধ করলেন। কনে কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের আলোকিত মানুষদের পরিবেশে বড়ো হয়েছেন। কাজেই উচ্চ সহবতে তাঁর হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছিল। তার উপরে সুন্দরী তো বটেই। বিভাবতীর আরও দুটি বোন ছিলেন—মলিনা আর প্রভাবতী। বিধবা হবার পর মা ফুলকুমারী তিন মেয়েকে আর ছেলেকে নিয়ে নোয়াপাড়া ছেড়ে উত্তরপাড়াতেই থাকতেন। এখানেই কনে দেখা হল। বড়ো বেহাই সুরেন্দ্র মতিলালের কনে পছন্দও হল। রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়েছিল ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে। কালাশৌচ কেটে যেতেই ১৯০২ সালেই বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম করেই। বিয়ের পর বিভাবতীকে ভাওয়ালে এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন তাঁর এক মামা প্রতাপনারায়ণ, তাঁর মামিমা এবং অবশ্যই অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আইন পড়ছেন, ছাত্রাবস্থা। বিভা যদি জানতেন—কার গলায় তিনি মালা দিলেন! আর তাঁর দাদা আল্লাপদর মনের মধ্যেই বা কী রয়েছে?

চ

বড়ো ভুল চাল দিয়েছিলেন বিলাসমণি! এলোকেশীর কেশপাশে এমন করে আবদ্ধ মধ্যমকুমার যে ঘরে সুন্দরী বউ পাত্তাই পেলেন না। তেরো বছরের কিশোরী বধূ শ্বশুরবাড়িতে প্রথম রাত কাটালেন। ফুলশয্যা হল তাঁর কণ্টকশয্যা। আঠারো বছর বয়সেই মেজকুমার রক্ষিতার ঘরে রাত কাটান। যে দিন বাড়িতে থাকেন সেদিনও ওই বারবাড়িতেই রাত কাটান। অন্দরমহলে এক শয্যায় রিক্তশূন্য হয়ে মেজবউরানির রাত কাটে। তবুও তো দিনের বেলায় শাশুড়ি-জায়েরা, লোকজনেরা কথা বলেন। রাত হতেই জীবনে নামে তাঁর বিভীষিকা।

ক্রমে শুনলেন এলোকেশীর কথা। চুল এলিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একদিন বিভাবতীর চোখের জলও বুঝি শুকিয়ে গেল। একটা তীক্ষ্ণ প্রতিশোধের স্পৃহা তাঁকে পেয়ে বসল, তাঁর ভরা যৌবনকে এতখানিই অবহেলা! এই তাঁর স্বামী? স্বামী নামে ঘেন্না...

এরই মধ্যে মা বিলাসমণি মারা গেলেন ১৯০৭ সালের ২৭ জানুয়ারি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে। যেটুকু বাঁধ-বন্ধন—ছিল-সব এখন আলগা। আলগা মেজকুমারের সব রাশ। এলোকেশীদের নিয়ে রমেনের পস-কলকাতার জঘন্য রাতগুলো কাটে। আর তাতেই তিনি আক্রান্ত হলেন জঘন্যতম রোগে—সিফিলিসে—উপদংশে। সারা শরীরে পারা ফুটে উঠেছে। এহেন স্বামীর সঙ্গে কোন্ স্ত্রী ঘর করতে চায়? তা ছাড়া স্বামী তো ঘরেই আসেন না, বাইরের মহলেই রাত কাটান। দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করা, এতটা বেহায়াপানা এ বাড়িতে বরদাস্ত হয় না; আর চাকর-বাকরদের সামনে দিয়ে বের হয়ে রাতের বেলা বার-বাড়িতে অভিসার! কী লজ্জা! কী লজ্জা! তা ছাড়া বিভাবতীর জীবনে তো ঘেন্নাটাই বাসা বেঁধে বসেছে—কী দরকার তার স্বামী-সঙ্গে—ম্যাগো...ওই নোংরা অসুখওয়ালা লোকটা তার স্বামী! ভাবলেই গা গুলিয়ে বমি উঠে আসে! কেবল বিপিন খানসামা ঘরে-বাইরে খবর দেওয়া-নেওয়া করে চলে।

এর মধ্যে দাদা সত্যেনের বিয়ে হয়ে গেল ১৯০৮ সালে। এই একবার সম্ভবত স্বামীর সঙ্গে বিভাবতী বাপের বাড়িতে এলেন দাদার বিয়ে উপলক্ষ্যে। তিন সপ্তাহ কাটিয়ে বিভাবতী আবার জয়দেবপুরের নরকে ফিরে এলেন। এখন তিনি আরও উদাস, যেন নিরাশ্রয়! ভাত-কাপড়ই তো জীবনের সবটা নয়। দাদাটারও বিয়ে হয়ে গেল। সেই দাদা কি আর আগের মতো তারই থাকবে। দাদা যে তার কতটা কাছের, কাকে সে বোঝাবে! দাদা এখন বিয়ে করেছে, চাকরির দরকার—সেই সুবাদে জয়দেবপুরের বাড়িতে আসছে বটে, দেখাশুনোও হচ্ছে,...কিন্তু। বড়োকুমারের একটা সার্টিফিকেট নিয়ে আইনের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ চাকরির আশায় শিলং গেল নিদেনপক্ষে একটা সাব-ডেপুটিরও চাকরি পেতে। চাকরি হল না, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বাড়িতেও ফিরে গেলেন না, জয়দেবপুরেই এসে রয়ে গেলেন। ওদিকে ফুলকুমারী অস্থির। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে ছেলের এমনি করে পড়ে থাকা তাঁর ভালো লাগে না। সত্যেন্দ্র যে কেন পড়ে আছেন!

বোন আছে? নাকি আরও কিছু মতলব? মা চিঠির পর চিঠি দেন, সত্যেন্দ্র নট নড়ন-চড়ন। বরং তাঁর দাপটে জয়দেবপুরের রাজবাড়ি সম্ভবত একটু বেসামাল। বালির তাপ সহ্য করা যায়, বানরের কিচকিচিনি তো সইতে পারা মুশকিল।

কিন্তু বিপত্তি বাড়েই। মা কি কিছু আন্দাজ করেছেন। বিভাবতীকে তিনি 'বুকের ধন' বলে সম্বোধন করে চিঠি লেখেন সেই ১৯০৩ সাল থেকেই। বিভার বুক ফাটে তবুও মুখ ফাটে না। চিঠি লেখে—'মা, আমি খুব ভালো আছি, আমার জন্যে ভেবো না।' কিন্তু সেই ভাবনাটাই এখন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। মেজকুমারের অসুখ বড্ড বেড়ে গেছে। বাড়ির আশু ডাক্তার, রমেনের বন্ধুর মতো, চিকিৎসা করে কিছু করতে না পেরে পরামর্শ দিলেন—কলকাতায় দেখিয়ে এসো। তাই ১৯০৮-এর ডিসেম্বরের প্রথমেই ৬৫ জনের দলবল বেঁধে মেজকুমারকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। বড়োকুমারের সঙ্গে বড়ো-ছোটো দুই রানিও এলেন। এসে উঠলেন কলকাতার বিখ্যাত জহুরি লাভচাঁদ মতিচাঁদের পুলিশ হসপিটাল স্ট্রিটের গেস্টহাউসে। আগে থেকেই টেলিগ্রাম করে এখানে ওঠার ব্যবস্থা সেরে রেখেছিলেন বড়োকুমার রণেন্দ্রনারায়ণ। অসুস্থ মেজরানি সম্ভবত এলেন না। ছোটোকুমারও সম্ভবত পরে এসে এখানে উঠেছিলেন। অনেকগুলো ডাক্তার দেখলেন, বিশেষ করে দেখলেন কর্নেল সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম.ডি—তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ ছুঁই ছুঁই। দেখেশুনে তারা বললেন—হ্যাঁ, সিফিলিসই হয়েছে এবং অবস্থা সংকটজনক। চিকিৎসা চলতে থাকল।

খবর পেয়ে ফুলকুমারী আবার চিঠি লেখেন—'তোর শরীরের এই হাল, একটুও যত্ন নিস না শরীরের, আমার মনের যা অবস্থা তোকে কী বলে বোঝাব। আমার মরণের কথা ভেবে তোর শরীরের যত্ন নিবি। ডাক্তার তোকে মাংসের জুস খেতে বলেছেন সকাল-সন্ধে। খাবার আগে ডাক্তারসাহেবের দেওয়া লাল মিক্সচারটা মনে করে খাবি। মনে সাহস রাখিস—খোকার তো পড়াশোনা আছে—তোকে তাই প্রত্যেকদিন দেখতে যেতে পারে না। থার্মোমিটার দিয়ে প্রত্যেকদিন জ্বর দেখবি দু'বেলা। আর লক্ষ্মী-সোনাটা, একদিন অন্তর আমাকে চিঠি দিবি।'...রমেনের কথা নেই তাতে...

ফেব্রুয়ারি মাসে গোড়ায় আবার তাঁরা সদলবলে জয়দেবপুরে ফিরে এলেন। লর্ড কিচেনার আসছেন তাঁদের কাছে শিকারে যাবেন বলে। তা ছাড়া কলকাতার ডাক্তারেরা বলেছেন—গরমে বাইরে বের হবেন না, বরং কিছুদিন পাহাড়ে ঠাণ্ডায় কাটিয়ে আসুন—রোগের প্রকোপ কমতো পারে তাতে।

দুই

ক

ঠাণ্ডার দেশে যেতে হবে। সে দার্জিলিং হতে পারে, আবার হতে পারে মুসৌরিও। দেখি, সত্যেন কী বলে! কলকাতায় অসুখের তদারকি করার ছলে সত্যেন বেশ কাছেই এসে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ রায় দিলেন দার্জিলিং-ই ভালো। রমেন্দ্র ডেকে পাঠালেন তার খাস কেরানি মুকুন্দ গুঁইকে। তারপরে দুজনকে বললেন—তাহলে দার্জিলিং-এ গিয়ে ওঠা-থাকার ব্যবস্থাটা করে এসো। মুকুন্দ তো এক পায়ে খাড়া। সে আবার আড়ালে নিজেকে মেজকুমারের পেরাইভেট সেকরেটারি বলে প্রচার করত। ওঁরা দার্জিলিং গেলেন। যাবার আগে দালান কাছারির কাছে জোলার পাড় জঙ্গলে মেজকুমার একটা বাঘ শিকার করলেন। বাঘকে নিয়ে একটা ছবিও তোলা হল—সেটাই আপাতত মেজকুমারের শেষ ফটো। যাবার আগের দিন কুমার আশু ডাক্তারের বাবা মহিম ডাক্তারের বাড়িতে রাতের বেলা পেটভরে নেমন্তন্ন খেয়ে এলেন। বোঝা গেল, ওই সিফিলিসের ক্ষতগুলো ছাড়া মেজকুমারের শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালোই আছে। অনেকটা খোশমেজাজে মেজকুমার যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। সত্য আর মুকুন্দ ফিরে এসে জানালেন দার্জিলিং-এর ম্যাল অঞ্চলে, চৌরাস্তায় একটা বাড়ি খালি রয়েছে—নাম 'স্টেপ অ্যাসাইড' (এই বাড়িতেই ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন)। কে কে যাবেন সঙ্গে—কথা উঠল। যেতে চাইলেন বাড়ির মেয়েরা—কুমারের মেজদিদি জ্যোতির্ময়ী, তখন বিধবা। যেতে চাইলেন ঠাকুমা রানি সত্যভামাও!! কিন্তু সত্য জানালেন—বাড়িটি ছোটো, এত লোক ধরবে না, তা ছাড়া ওখানে বিধবাদের থাকা-খাওয়ার মতো পরিবেশ নেই। অতএব ঠিক হল মেয়েদের মধ্যে কেবল যাবেন মেজরানি বিভাবতী (দাদা আন্নাপদ—সত্যেন্দ্রনাথ কি এমনটা ভেবেছিলেন—দূরে, কুসঙ্গ থেকে অনেক

দূরে, সেবা করার অবকাশে বিভাবতী স্বামীর মনের কাছে পৌঁছে যাবে?—হায়!) কেবল। সত্য আর মুকুন্দ গুঁই ছাড়া সঙ্গে আরও জনা কুড়ি লোক যাবেন—ডাক্তার আশুতোষ দাশগুপ্ত, কেরানি বীরেন বাঁড়ুজ্যে, দর্জি সি জে কেব্রাল, মোসাহেব অ্যান্টনি মোরেল-সহ ভৃত্য-খানসামাদের মধ্যে জলধর, কামিনী, অখিল, প্রসন্ন, বিপিন, আরদালি শরিফ খান, পাচক অম্বিকা চক্রবর্তী, ফলন সিং, হরি সিং, গোর্খা গার্ড ধনমন সিং, বেয়ারা জিতলাল আর ঝগরি, বাবুর্চি আলিমুদ্দি, দাই তীর্থ, ঝি কামিনী। এই বিশাল পার্টি আর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্তর নিয়ে মেজকুমার ১৮ এপ্রিল ট্রেনে করে রওনা হলেন দার্জিলিং-এর উদ্দেশে। ঘুম স্টেশনে পৌঁছলেন ২০ এপ্রিল। নববধূ তেরো বছরের বিভাবতী এখন ২০ বছরের বিষাদময়ী প্রতিমা, তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথ, ডাকনাম আল্লাপদ, ২৪ বছরের ধুরন্ধর আর পঁচিশ বছরের ক্ষয়িষ্ণু মেজকুমার। আচ্ছা, বউকে ছেড়ে এসে কীসের ধান্ধায় সত্য এসব করছেন?

আগেই বলেছি, ওই সিফিলিসের ক্ষত আর জ্বালা ছাড়া মেজকুমার আছেন বেশ বহাল তবিয়তেই। এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানো পাহাড়ি পথে খেলছেন বিলিয়ার্ডও, ভাবছেন ঘন পাহাড়ি জঙ্গলে শিকারেও যাবেন। দেখতে দেখতে দিন পনেরো বেশ ভালোই কেটে গেল। হঠাৎ করে ৬ মে তারিখে রমেন্দ্রনারায়ণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নৈশপ্রহরী শরিফ খান আশু ডাক্তারকে ঘুম থেকে উঠিয়ে ডেকে আনল। জ্বরে মানুষটা যেন ঝুলঝাড়া। আর পেটে কলিক ব্যথায় অমন যে ফরসা রং—যেন কালিবর্ণ হয়ে উঠল। রাত থেকেই ব্যথা, একটু বেলা হতে যেন সামলে উঠলেন। কিন্তু আশুবাবু নিজে চিকিৎসা না করে দার্জিলিং-এর সে সময়কার সিভিল সার্জেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জে.টি ক্যালভার্টকে (ইনি পরে কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হন।) খবর দেবার জন্যে বললেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হয়েছিলেন, সেই পোশাকেই এলেন, এসে রোগীকে দেখে ভাবলেন গত রাতে হজমের গণ্ডগোল হওয়ার কারণে হয়তো পেট ফেঁপে এই ব্যথা আর জ্বর। তাই একটা মিক্সচার বানিয়ে দু-ঘণ্টা অন্তর খেতে বলে গেলেন। মিক্সচারে ছিল স্পিরিট অ্যামোন অ্যারোম্যাট, সোডি বাই কার্ব, টিঞ্চার কার্ডামন কম্পাউন্ড, স্পিরিট ক্লোরোফর্ম আর অ্যাকোয়া সিনামন। আর পেটের ব্যথা কমাবার জন্যে পেটে মালিশ করার জন্যে দিলেন লিন্ট অপিআই (Lint Opii) মালিশ। বিভা আড়াল থেকে সব দেখছেন,

শুনছেন। দেখেশুনে মুকুন্দ গুঁই জয়দেবপুরে টেলিগ্রাম পাঠালেন সকাল দশটায়—

> 10 AM Last night Kumar had fever below 99. No fever now. Kindly wire health.
>
> Mukunda.

পরের দিনের টেলিগ্রামে খবর গেল—কুমারের জ্বর, পেটে খুব যন্ত্রণা, সিভিল সার্জেন দেখছেন। আরও পরে কেবল-টেলিগ্রাম করা হল—দু-ঘণ্টা পরে পেটের ব্যথা কমে গেছে, কিছু চিন্তার নেই, আর ব্যথা নেই।

এ সময়ে একটা মজার ব্যাপার ঘটে যায় (আসলে ব্যাপারটা ঘটানো হয় সত্য কলকাতায় ফেরার পর। কিন্তু সাজানো হয় যেন তিনি তাঁর কলেজের নোটখাতায় ডায়েরি লিখছেন দার্জিলিং-এ বসেই। ডায়েরি তিনি নিয়মিত লিখতেন না, এই ডায়েরিও কাজ হাসিল হবার দিন পর্যন্ত লিখে শেষ করা হয়েছিল)—সত্য ডায়েরি লিখতে শুরু করেন ৭ মে থেকে—অসুখ হবার পরের দিন। ৭মে সত্যবাবু ডায়েরিতে লিখলেন ইংরেজিতে। আমরা বাংলা করে বলি—'রমেনের অসুখ চলছে, পেটে ব্যথা, জ্বরও আছে, রাতে ঘুমোয়নি। ফলের জন্যে বাড়িতে টেলিগ্রাম করলুম।' কিন্তু টেলিগ্রামের ভাষা তো অন্যরকম ছিল।

ওষুধ খেলেন রমেন, পাশে এসে বসেছেন বিভা। রমেন খুব একটা ক্লান্ত হাসি হাসলেন। তারপরে মৃদু স্বরে বললেন—একটু ভালো বোধ করছি, তবে বড্ড ক্লান্ত! বিভা খুঁজে পাচ্ছেন না কী করবেন। একবার প্রেসক্রিপশন, আর একবার ওষুধের শিশি, একবার নাড়ি দেখলেন।

আবার যেন যন্ত্রণাটা বাড়ল। রমেন্দ্র আশুকে ডেকে বললেন—আশু, ব্যথাটা যে খুব বাড়ল। বারবার পায়খানা যেতে শুরু করলেন। তবে কি হিল-ডায়েরিয়া হল! ডাক্তার ক্যালভার্ট তো দু-দিন আসতে পারবেন না বলে গেছেন। আশু ডাক্তার হতভম্ব। সত্য শরিফ খানকে ডেকে বললেন—যেমন করে পারো, যেখান থেকে পারো—সাহেব ডাক্তারকে ধরে আনো।

আশু যা হোক একটা ওষুধ দিয়ে যন্ত্রণাটা কমাও—রমেন কাতরান। খবর পেয়ে বিখ্যাত ডাক্তার নিবারণ সেন এলেন পাশের স্যানাটোরিয়াম থেকে। কিন্তু ক্যালভার্ট চিকিৎসা করছেন শুনে কিছুতেই নিজে থেকে ওষুধ দিলেন না, যদিও পরে আরও অনেকবার আসেন ও ওষুধপত্র দেন। তিনি আশুবাবুকে বললেন—তুমি যা হোক কিছু দাও; মরফিয়া দিতে পারো বা পেটের উদরাময়ের কোনও ওষুধ দাও। সত্য ও বীরেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁরা যেন এটাই চাইছিলেন।

কুমারকে আর খাটে রাখা যায় না—বিছানাতেই পায়খানা হয়ে যাচ্ছে যেন। মেঝেতে তাই বিছানা করা হয়েছে। আশু ডাক্তার ওষুধ দিলেন।

R/
Quinine Sulph Gr. iv
Aloin Gr. $\frac{1}{2}$
Ext. Nux Vomica Gr. $\frac{1}{2}$
Euonymin Gr. i
Acid Araimor (Arsenius) Gr. 1/100
Ext. Gent. Grs.
M ft. Pill (Silver) 1T.D.S.P.C.
Sd/A.T.Dasgupta

জ্বলজ্বল করছে সইটা। কিন্তু মোকদ্দমার সাক্ষ্যে বলেন—তিনি এসব করেননি, হয়তো অন্য ডাক্তার বলেছিলেন—তিনি লিখে দিয়েছিলেন মাত্র। এ কথা বলার কারণ—আশু ডাক্তারের ওষুধ পেটে যাওয়া মাত্রই রমেন্দ্র চিৎকার করে বলে ওঠেন—'এ কী ওষুধ তুমি দিলে আশু, আমার সারা বুক যে জ্বলে যাচ্ছে।' ভয়ংকর ছটফট করতে করতে কুমার বমি করতে লাগলেন। ছুটে এসে আরদালি শরিফ তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন—তার জামার হাতাতেই বমি করে ফেললেন তিনি। কী ছিল জানি না, পরে সাক্ষী দিতে উঠে শরিফ বলেন—তাঁর জামার

হাতায় যেখানে বমি লেগেছিল, সে জায়গাটা পরে ফুটো হয়ে যায়। বমির আওয়াজে ঝি ছুটে আসেন—দেখেন শ্বাস দ্রুততর হচ্ছে। ভোর শেষ হয়ে সকাল পর্যন্ত বারবার পায়খানা হচ্ছে—তার সঙ্গে সমানে রক্ত পড়ছে। বেড প্যান এল—আর কুমার উঠে বাথরুমে যেতে পারছেন না। মুকুন্দ টেলিগ্রাম পাঠালেন—'অবস্থা সঙিন'।

৮ তারিখের সকালে ডা. ক্যালভার্ট এলেন। কুমার মেঝেতে শুয়ে। ডাক্তার দেখলেন—দু-দিন আগে যা দেখে গেছেন—তার চেয়ে অবস্থার যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। তিনি মরফিন ইঞ্জেকশন দিতে চাইলেন। রমেনের ঘোর আপত্তি এই অবস্থাতেও—এই ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরই তাঁর মা বিলাসমণির মৃত্যু হয়েছিল। বিভার চোখে জল, তিনি অনুরোধ করলেন। ডা. ক্যালভার্ট ডা. নিবারণ সেনকে বলে গিয়েছিলেন চব্বিশ ঘণ্টা কুমারে স্বাস্থ্যের উপর নজর রাখতে। তিনিও এসে গেছেন। সকালে রাজি না হলেও বিকেলে রাজি হলেন কুমার, তাঁকে মরফিয়া ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। কিন্তু অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হতে থাকে। সত্যিই কি কুমারের বিলিয়ারি কলিক হয়েছিল! তাঁকে কি আশু ডাক্তারের আর্সেনিক-দেওয়া ওষুধ খাওয়ানো উচিত হয়েছিল? অন্য উদ্দেশ্য ছিল কি? কুমার ক্রমশ বিবর্ণ, রক্তশূন্য হতে লাগলেন। এতবার পায়খানা—ডিহাইড্রেশন হবারই কথা। খবর পেয়ে বিভার মামা সূর্যনারায়ণবাবু এলেন—তিনি তখন দার্জিলিং-য়েই থাকতেন। আসার সময় ডা. বি. বি. সরকারকে খবর দিয়ে এসেছিলেন। তিনিও কুমারকে দেখলেন, কিছু করার নেই দেখে চলেও গেলেন। রোগীর সমস্ত শরীর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আসছিল। বিভা গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, শুনলেন ডাক্তাররা নিচু গলায় নীচু সুরে কী সব বলাবলি করছেন...তবে কী...

শেষবারের মতো কুমার কাতরে উঠেছিলেন—আশু, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। তারপরে সব স্থির। বিভা আর্তনাদ করে উঠলেন সব হারানোর বেদনায়। কেমন করে মানুষটা শেষ হয়ে যেতে পারে—যতই তিনি তাঁর প্রতি বিমুখ হন—হিন্দুর মেয়ের পক্ষে স্বামী-সংস্কার ত্যাগ করা কঠিন। বিভা যে বিধবা হচ্ছে, তাঁর গায়ের গয়না খুলে ফেলবেন, মুছে ফেলবেন এয়োতির চিহ্ন সিঁদুর, ভেঙে ফেলতে হবে শাঁখা। অজান্তে তিনি গায়ের গয়না খুলতে থাকেন আর মনে মনে পরে নেন একটা আনকোরা ধুতি।

আল্লাপদ বলছেন, বিভা শুনছেন—এমন করো না, নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বে। লোকটাকে দাদা বলতে এখন ঘেন্না লাগছে। ফুল এল। ততক্ষণে আশপাশের লোকেরা জেনে গেছেন কুমারের মৃত্যু হয়েছে। লোকজনেরা নিচে ভিড় করতে শুরু করেছেন। গোর্খা প্রহরীরা অতিকষ্টে তাদের সামলাচ্ছেন। সত্যেন্দ্র-বীরেন্দ্র সাদা থান কাপড় দিয়ে সারা শরীর ঢেকে দিলেন (সাদা কাপড়ের জোগাড় ছিল আগে থেকেই!)। বাইরে কুয়াশার বাসা; বিভার অন্তরেও। এ-ঘরে ও-ঘরে তাঁর ছোটাছুটি।

কিন্তু কখন কুমার মারা গেলেন? সন্ধে রাতে, না রাত গড়িয়ে মাঝরাতে? ডাক্তার বি.বি. সরকার কি সন্ধে রাতে চলে যাবার সময়েই শেষ কথা শুনিয়ে গিয়েছিলেন? মেজরানি তো সে কথা স্বীকার করেননি পরে, বলেছেন তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল মাঝরাতে। সত্যবাবু আরও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন—রাত ১১-৪৫ মিনিট। পরের দিনে ডায়েরিতে তিনি লিখেছিলেন (এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে হিসেব করে ডায়েরি কিন্তু তিনি লিখে চলেছেন।)—

কুমার রমেন্দ্র মাঝরাতে মারা গেলেন দর্জিলিং-এর 'স্টেপ অ্যাসাইডে'। চারজন ডাক্তার দেখলেন—১. পরিবারের চিকিৎসক, ২. রায়বাহাদুর নিবারণ ঘোষ, ৩. বি.বি.সরকার, ৪. লে. কর্নেল ক্যালভার্ট। তিনি যখন মারা গেলেন তখন চারজনই উপস্থিত। মৃত্যুর মিনিটখানেক আগে সে আমাকে তাঁর শেষ কথা বলে—সত্য, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। বিভা মূর্ছা যেতে লাগল। ডাক্তাররা চলে গেলেন। কেবল দু-জন নার্স রইলেন। শরিফ খান পাগল প্রায়। বেহারাকে সেজমামার (সূর্যনারায়ণ) কাছে পাঠানো হল, তিনি ভোর তিনটে নাগাদ এলেন। উত্তরপাড়া আর জয়দেবপুরে খবর পাঠানো হল। সৎকারের কাজে লোকের দরকার। স্যানাটোরিয়ামে বেহারাকে পাঠানো হল।

সাজানো ডায়েরি। ভুলে ভর্তি—ডাক্তারের নাম নিবারণচন্দ্র সেন, ঘোষ নয়। চারজনেই হাজির ছিলেন না মৃত্যুর সময়ে—ডা. সরকার আগেই চলে গিয়েছিলেন। পারিবারিক ডাক্তার হিসেবে আশুতোষ দাশগুপ্তের নাম স্পষ্ট করে লেখা নেই। মৃত্যু হয়েছিল মাঝরাতে।

সকাল না হতেই শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সৎকার করা হয়—এই ছিল সত্যবাবুদের বয়ান। শবদেহ চলে যায়। জানলার কাছে মুখ

লাগিয়ে একদৃষ্টে দেখেন বিভা শেষ যাত্রার মত। বিলীনমান গতি। স্মৃতি এখন ভাঙা কাচের মতো টুকরো টুকরো...

খ

৯ মে সকাল ৯টায় রায়দেবপুরে ছোটোকুমার রবীন্দ্রনারায়ণ টেলিগ্রামটি পড়লেন। কী লেখা ছিল এতে? এতে লেখা ছিল মৃত্যুর সঠিক সময়টা। সেজন্যেই বুঝি সব টেলিগ্রাম পরে আদালতে পেশ করা হলেও এটিকে পেশ করা হয়নি। এতে যে 'সময়ে'র জুজু ছিল—সেটা বেরিয়ে পড়লেই তো চিচিং ফাঁক হয়ে যাবে। যা-ই হোক, টেলিগ্রাম পেয়েই সেই সাংঘাতিক খবর পেয়ে বড়োকুমারের প্রথমেই মনে হল—ঘরের ছেলেটা তো চলে গেল, কিন্তু ঘরের বউটাকে কি সত্য জয়দেবপুরে নিয়ে আসবে। সত্যেন কতখানি ধড়িবাজ, সেটা অন্তত তিনি আঁচ করে নিয়েছিলেন। তাই যাতে সে বোনকে উত্তরপাড়ায় নিয়ে গিয়ে হাজির হয়, তাই টেলিগ্রাম পেয়েই তিনি লোকজনকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা করিয়ে দিলেন যাতে পথ থেকেই মেজরানিকে সঙ্গে নিয়ে জয়দেবপুরে সবাই চলে আসতে পারে। বেশ বড়োসড় একটা দলে গেলেন অন্যদের মধ্যে দ্বারিক মাস্টারমশাইও। বড়োকুমার ভেবেছিলেন নিজেই যাবেন। কিন্তু ওই অপদার্থ লোকটাকে দেখা গেল যাবার আগেই বেপাত্তা! তবুও তিনি যে আশঙ্কা করছিলেন সত্য সম্বন্ধে—সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন সত্যবাবুও। নইলে ডায়েরিতে লিখবেন কেন যে ওরা 'সন্দেহ' করছে। সন্দেহ করার কারণও তো যথেষ্ট। জমিদারির আয় থেকে মেজরানির ভাগে যে লক্ষ টাকা পড়বে বছরে—বোনকে কুক্ষিগত করে সেটাকে বাগানোর লোভ সামলানো কি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সম্ভব! সাধে কি পরে মামলার বিচারক আইনের অল্পবয়স্ক ছাত্রটির মগজে ষাট বছরের পাকা লোকের মাথার অবস্থানটি দেখতে পেয়েছিলেন।

যা-ই হোক, দলবল ফিরে এল—রাজবাড়িতে কান্নার হাট, মেজরানি একেবারে ভেঙে পড়েছেন, সারাক্ষণ কেঁদে চলেছেন, লোক চিনতে তাঁর ভুল হয়ে যাচ্ছে। সে কি শুধু স্বামী হারিয়েছেন বলে! অসুখবিসুখে লোকটা চলে

গেলে এতটা মনে হত না। একটা জলজ্যান্ত সুস্থ মানুষ এমনি করে উবে গেল। আল্লাপদ এ কী করল। সত্যবাবু একবার বোনের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গেলেন। গভীর আক্ষেপে মুখ ফিরিয়ে বিভাবতী বললেন—'তুমিই আমাকে রানি করেছিলে, আবার তুমিই আমাকে ভিখারিনি করে দিলে!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে মেজরানি এসব কী বলছেন—আমাকে ভালোভাবে স্বামীসেবা করতে দেওয়া হয়নি, এমনকী অন্তিমকালে শবযাত্রার আগে আমাকে ভালোভাবে দেখতেও দেওয়া হয়নি!।

গ

ম্যানেজার সত্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—মেজকুমার কি কোনও উইল করে গেছেন? উত্তরে সত্য বললেন—রমেন দত্তক নিতে চেয়েছিল। যেই বলা, অমনি ছোটোকুমার অগ্নিশর্মা হয়ে সত্যর ঘাড় চেপে ধরলেন—দাদা দত্তক নেবার কথা বলেছে? ঘাবড়ে গিয়ে সত্যবাবু বললেন—না, না, সে এ কথা বলেনি, আমি 'জোক' করছিলাম।

—এই সময়ে Joke? তোমার কথা আমি একটুও বিশ্বাস করি না।

চারপাশেই একটা অবিশ্বাসের ছায়া গোটা রাজবাড়িটাকে ততক্ষণে ঘিরে ধরেছে। জ্যোতির্ময়ী, মোক্ষদা বিভার ঘরে এসে তার মাথায় হাত দিয়ে বলেন—বউ, দুপুর গড়িয়ে গেছে, মুখে কিছু তো দাওনি। দুটো মুখে দাও। বিভা ঘাড় নেড়ে ফুঁপিয়ে ওঠেন। ইন্দুমতী, যেন এলেন ঝোড়োপাতার মতো শুকিয়ে।

ইন্দুমতী সত্যকে জিজ্ঞেস করেন—অস্থি এনেছ?

সত্য উত্তর দেয়—হ্যাঁ এনেছি। একটা মাটির পাত্রে বসিয়ে। বীরেন্দ্র জ্যোতির্ময়ীকে বলেন—তিনিই মুখাগ্নি করেছেন, আর রাঁধুনি বামুন মন্ত্র পড়েছে। পরে পরে আরও সব কথা শোনা গেল তাঁদের কাছ থেকে আর বিপিন খানসামা, মুকুন্দদের কাছ থেকেও। অত রাতেও ব্রাহ্মণ পাওয়া গিয়েছিল। পাছে মড়া 'বাসি' হয়ে যায় বলে ৩/৪ ঘণ্টার মধ্যেই নাকি দাহ করার সব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। দার্জিলিং-এ উপস্থিত ঐতিহাসিক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়,

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ মৈত্রকেও নাকি শবযাত্রায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তারপর শবযাত্রায় নাকি অনেক লোক গিয়েছিলেন এবং ৯ তারিখের সকালে দেহ দাহ করা হয়।

কিন্তু পাশাপাশি ফিসফিসানি শোনা যেতে লাগল—দেহ দাহ করাই হয়নি। রাতে নাকি বৃষ্টি হয়েছিল, শবদেহ ফেলে রেখে শবযাত্রীরা চলে আসেন কাছের আশ্রয়ে, পরে ফিরে গিয়ে দেখেন শব উধাও। সাতটা কাঠি জ্বেলে দিয়ে তাঁরা পালিয়ে আসেন। ইন্দুময়ী বললেন—'দিদি ভেবে দেখো, ওঁরা দেহ ফেলে চলে এলেন, আর ওই বাঁধাছাঁদা দেহ উড়ে গেল! দিদি, কোনো দাহকার্য হয়নি।' শুনে জ্যোতির্ময়ী বুক চাপড়াতে লাগলেন।

সত্য সেই সময়ে অক্ষয় রায়কে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই জ্যোতির্ময়ী বললেন—ধন্যবাদ তোমাদের! আর আমি আমার ভাইয়ের মুখ দেখতে পাব না। সত্য, তুমি সত্যি বলবে! আমার ভাই কখন মারা গিয়েছিল, কখন দাহ হয়েছিল?

—সে মাঝরাতে মারা যায়, ওই যে শুনেছেন ঝড়-ঝাঁটি হয়েছিল, ওসব বাজে কথা, ওসব কিছু হয়নি। তাকে সকালে দাহ করা হয়। অস্থি নিয়ে এসেছি, আপনি দেখে যান।

বাড়ির ধাই অলকা সে সময়ে এসে বলে ওঠে—কার না কার হাড় নিয়ে এসেছে তার ঠিক নেই—নোকে তো তা-ই বলাবলি করছে!

ঘুরে দাঁড়িয়ে সত্য বলে—তোমরা কি সব পাগল হয়েছ? এসব গপ্পো কেন হচ্ছে। সব সত্যি। আমি দাহকাজ আর মৃত্যুর ডেথ সার্টিফিকেট এনে দেখাব। আর কী চাও সব! ফেরার পর থেকেই এসব উলটো-পালটা শুনছি, এবারে আমি পাগল হয়ে যাব।

তিনি রেগে চলে গেলেন, অক্ষয় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। ইন্দুময়ী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কী মনে হয়?

—কী জানি, কি যে বলব। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। চারিদিকে সবাই বলছে আমাদের কুশপুতুল দাহ করার দরকার, তারপরে শ্রাদ্ধ করা। কত কথাই না শুনছি।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন—নিচে দার্জিলিং-এ দাহ? ঝড় ওঠা? আশ্রয় নেওয়া? শব উধাও। পরের দিন অন্য একটা মৃতদেহ নিয়ে এসে দাহ? শবযাত্রায় টাকাপয়সা

ছোঁড়া—কিন্তু কার মৃতদেহ? কে সে তবে? অস্থি কার? তবে কি রমেন বেঁচে আছে? যদি বেঁচে থাকে তবে সে কোথায়?

অক্ষয় যেন কোন দূর থেকে কথা বলছেন—সম্ভবত, এটাই সত্যি। আমার বন্ধু ডা. প্রাণকৃষ্ণ আচার্যও তো দার্জিলিং-এ ছিলেন। স্টেপ অ্যাসাইড বাড়ির কাছেই তাঁর বাড়ি। তাঁকে ডেকে একটা পরামর্শ করার কথা কেন ওঁদের মনে হয়নি। (আসলে, পরে ডা. আচার্যই প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁকে রমেনের দেহ ছুঁতে, নাড়ি দেখতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। কারণ তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন এবং ব্রাহ্ম যদি ব্রাহ্মণের দেহ ছোঁয় তবে তা নাকি অপবিত্র হয়ে যায়! সত্যেন্দ্রের মাথার বলিহারি দিতে হয়!) পরে তিনি এসে অপমানিত হয়ে ফিরে যান। তাতে একটা ঘোরপ্যাঁচের সন্দেহ তাঁর মনে জাগে বইকি!

—তাহলে আমরা কী করব?

—বুঝতে পারছিনে। যদি মৃত্যু হয়েই থাকে তবে তো একটা শ্রাদ্ধ করতেই হবে। সেটা কি করা যাবে?

এসময়ে একটা বোমা ফাটিয়ে বসল শরিফ খান। সে বলে উঠল—কেমন করে আশু ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে কুমার বমি করেছিলেন। সে বমি তার কামিজেও পড়ে। যেখানে বমি পড়েছিল, কামিজের এই অংশ ফুটো হয়ে গিয়েছিল পরে। কতখানি তীব্র ছিল সেই ওষুধ! সন্দেহ তাতেই বাড়তে থাকে।

ঘ

দেখতে দেখতে দশটা দিন পার হয়ে গেল, সময় কারও জন্য থেমে থাকে না। ১৮মে, এগারো দিনের দিন, মেজকুমারের শ্রাদ্ধের আয়োজন হতে লাগল। একবার কথা উঠল, মৃতদেহ নিয়ে এত কথা যখন উঠছে, তখন শ্রাদ্ধ করার আগে একটা 'কুশপুত্তলিকা' দাহ করা হোক। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। পরে কেউ কেউ বলেছিলেন—এমন ধরনের কথা ওঠেইনি।

যা-ই হোক, রাজবাড়ির আড়ম্বর ছাড়াই শ্রাদ্ধকর্ম হয়ে গেল। শুধু যেটুকু না করলে নয়, ততটুকুই করা হল। এ মৃত্যু তো পরিণত বয়সের চলে যাওয়া

নয়, এ যে বড়ো বেদনার মরণ! তারাবাড়িতে একোদ্দিষ্ট করলেন থান-পরা বিধবা-বিধুরা মেজরানি আর মাধববাড়িতে বৃষোৎসর্গ করলেন ছোটোকুমার। ভিতরে ভিতরে সংশয়-সন্দেহের হাওয়া বইতে লাগল, কিন্তু পরিবার মেনে নিল মেজকুমারের তথাকথিত মৃত্যুকে।

৬

কিন্তু ওই অস্থির হাওয়াটা পরিবারের বন্ধনটাকে বড্ড এলোমেলো করে দিলে। জুন মাসের মাঝামাঝি, ১৯জুন সত্যবাবু উত্তরপাড়া থেকে মা ফুলকুমারীকে নিয়ে এলেন ঢাকাতে, সেখানের কলুটোলায় তিনি একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। স্ত্রীকেও নিয়ে এলেন সেখানেই। উত্তরপাড়া থেকে জয়দেবপুরের খবরদারি করা মুশকিল এবং সেটা তো করতেই হবে। বোনের ভালোমন্দ তো তাকেই দেখতে হবে। আর বোনের ভালো করার অর্থই তাঁর নিজের আখের ভালো করা। বোন বিভাকেও ডেকে পাঠালেন ঢাকার বাড়িতে, ইচ্ছে সেও এখানে থেকে যাক। বিভা এলেন, মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন—কিন্তু থাকলেন না। ওই দাদার কাছে থাকা এখন? এই অবস্থায়? সত্যবাবু মনে মনে অসন্তুষ্ট। ডায়েরিতে লিখলেন—'Sister still leaning over to the otherside'. বোন যে রাজবাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়েছে কিছুটা—সেটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। বোন কেন তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে? বাসা বদল করেছেন সত্যবাবু নীলগোলায়। বিভা সেখানেও যান না মায়ের কাছে আসেন, চলে যান। রাজবাড়ির কেতা মেনে বড়োকুমার মেজরানির সঙ্গে বাড়ির ঝিকে পাঠান। সত্য মন খুলে কথা বলতে পারেন না। এর মধ্যে সম্পত্তির ভাগ নিয়ে বড়ো-ছোটো কুমারের মনান্তর দেখা দিয়েছে। সত্য ডায়েরিতে লিখলেন—'শুভক্ষণ'। তিনি হাল ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর বোন যাকে তিনি...। তা সত্যিই শেষ পর্যন্ত তাঁর অধিকারের জয় হল। নিজের অংশের সম্পত্তি, পাওনা-গণ্ডা বোঝার জন্যে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে আমমোক্তারনামা লিখে দিলেন। এটার জন্যেই তো সত্যবাবুর এত আয়োজন। এই তো সবে কলির সন্ধে। এর পরে এর পরে...

নভেম্বর মাসে আমমোক্তারনামা পেলেন। এবার আদায় করে নিতে হবে জীবনবিমার তিরিশ হাজার টাকা। ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে কুমারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সিটি অফ গ্লাসগো লাইফ অ্যাসুয়েরেন্সের এজেন্টকে দিয়ে কুমারের নামে একটা তিরিশ হাজার টাকার বিমা করিয়ে নিয়েছিলেন। তখন তাঁকে পরীক্ষা করে ডাক্তার আর্নল্ড ক্যাডি একটা সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন। প্রথম চোটেই সত্যবাবু সেই টাকাটি তুলে নিলেন মধ্যমকুমারের মৃত্যুর সার্টিফিকেট জমা দিয়ে। ওই যে তিনি জ্যোর্তিময়ীদের বলেছিলেন ডেথ সার্টিফিকেট এবং দাহ সার্টিফিকেট এনে দেখাবেন। তা কথা রেখেছিলেন তিনি। দার্জিলিং গিয়ে এ দুটো তিনি জোগাড় করে এনেছিলেন। এ দুটো যে বড্ড জরুরি। এর একটা এখন উদ্ধার করি।

Certificate of death

I, John Telfer Clalvért, Lt. Col. I.M.S. Civil Surgeon, Darjeeling do hereby solemnly declare that I have known Kumar Ramendra Narayan Roy and have been his consulting Medical Attendant for 14 days; that I attended him in his last illness, that he died aged about twenty seven years at Darjeeling at 11.45 O'clock P.M. On the 8th day of May 1909, after an illness of 3 days; that the cause of his death was collapse following upon an acute attack of biliary colic (gallstone).

The above was inferred from symptons and appearence during life. That the symptons of the disease which caused death were first observed by me on May 6, 1909, and the sttack became acute on the morning of the 8th and he died the same evening.

J.L. Calvert

দার্জিলিং-এ প্রদত্ত এই Certificate-এর তারিখটি নজরে আনার মতো—
Declared before me this seventh day of July 1909.

আর দার্জিলিং-এর জেলাশাসক হরিমোহন দাস দাহকার্যের সার্টিফিকেট লেখেন—'Testified that the cremation of the Kumar on the morning of may 9 in the presence of the clerks of his office.'

এর তারিখ ছিল ১০ জুলাই, ১৯০৯।

প্রসঙ্গত ১০ মে, ১৯০৯ তারিখে I, Montxzgle Villa Darjeeling থেকে ডা. ক্যালভার্ট বড়োকুমারের কাছে একটা শোক প্রকাশক চিঠি পাঠান (এর মূল চিঠিটি কোথায় গেল?—সত্যবাবু প্রতিলিপিমাত্র হাজির করেছিলেন পরে)। তিনি কেন যে এই চিঠি লিখতে গেলেন, কে জানে? সত্যবাবু কী জানতেন? তা ছাড়া পরে ডা. ক্যালভার্ট বলেন কুমারের মৃত্যুর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন কিনা, তাঁর মনে নেই।

কেবল সত্যবাবুর ঠিকানা বদলে যায়নি, রাজপরিবারের ম্যানেজাররাও বদল হয়েছেন। যোগেনবাবুর বদলে এসেছেন সাহেব ম্যানেজার নিউহ্যাম। আগের ম্যানেজারদের সঙ্গে বৈঠকখানাবাসী বড়োকুমার ডিড অফ্ ম্যানেজমেন্ট (রিভোক) বাতিল করা নিয়ে পরামর্শ করেন—এখানে বিধবার অংশের কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে। সত্য যেই শুনলেন যে কুমারেরা একটা নতুন ডিড অফ ম্যানেজমেন্ট করে বিভাকে মাত্র এক হাজার টাকা মাসোহারা দিয়ে বাকি সম্পত্তি দু-জনে ভাগ করে নিতে চাইছেন—অমনি রেগে অগ্নিশর্মা।

কিন্তু শরীর আর মানসিক চাপে বড়োকুমারও বেশিদিন বাঁচলেন না, ১৯১০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তিনি মারা গেলেন অপুত্রক অবস্থায়। স্বামীর মৃত্যুর দু-মাস পরেই বড়োরানি সরযূবালা কলকাতায় এসে বাস করতে লাগলেন প্রিন্সেপ স্ট্রিটে। সরযূবালা বলেন, কোনো এক সাধুবাবার অভিশাপ আছে এ বংশে—ছারখার হয়ে যাবে। মাত্র ছাব্বিশ বয়সে সেই সেপ্টেম্বর মাসেই, ১৯১৩ সালে, ছোটোকুমার রবীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হল।

ছোটোরানি আনন্দকুমারী আর তাঁর দত্তকপুত্রকে (নিজের ভাইপোকে দত্তক নিয়েছিলেন) তাঁর ভাইরা কলকাতায় নিয়ে এলেন বসবাসের জন্যে। এমনকি কুমারের শ্রাদ্ধের সময় তিনি উপস্থিতও ছিলেন না। ভাওয়াল রাজপরিবারের তিন রাজকুমার অনুপস্থিত! তিন রানিও জয়দেবপুর ছেড়ে কলকাতার বাসিন্দা। এবং ঘটনাচক্রে তিন রানিই সন্তানহীনা।

আগের নিয়মে কুমারদের বোনেরা রাজবাড়িতেই বাস করতেন, তাঁরাও একে একে জয়দেবপুর ছেড়ে চলে গেলেন। সাধুবাবা আসার আগেই ইন্দুময়ী পৃথিবী ছেড়েছেন স্বামীকে রেখে। বড়োমেয়ে জ্যোতির্ময়ী থাকতে আরম্ভ

করলেন ৮৬, হরিশ মুখার্জি রোডে ভবানীপুরে। মেজরানি আছেন দাদার কাছে সব স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে। তাঁরই টাকায় কেনা ১৯, ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে। আগে কিছুদিন ছিলেন ৮৯, হ্যারিসন রোডে। ঠাকুর সত্যভামা কুমারদের পিসিমা কৃপাময়ীকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন। কৃপাময়ী সেখানেই দেহরক্ষা করলেন, বৃদ্ধা সত্যভামা ফিরে এলেন জয়দেবপুরে। একা অতবড়ো ভুতুড়ে রাজবাড়িতে তিনি থাকতে লাগলেন।

বড়োরানি আর ছোটোরানির সম্পত্তি দেখভাল করার দায়িত্ব নিয়েছে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস—তাঁরা সম্পত্তির দেখভাল করতে পারবেন না—এই অজুহাতে। মেজোরানির সম্পত্তিতে তাঁরা প্রথমে হাত দিলেন না, কোন্ রহস্যে—তা জানা গেল না! রহস্য ঘুরতে থাকল রাজবাড়ির আনাচে কানাচে। তারই মধ্যে মাঝেমাঝেই ফিসফিসানি শোনা যায়—মেজকুমার বেঁচে আছেন, দার্জিলিং-এ সেদিন তাঁর শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়নি। এক সাধুবাবার অলৌকিক আশীর্বাদে তিনি বেঁচে আছেন। বেঁচে আছে কুমারের বুড়ো খানসামা বিপিনও, বুকে তাঁর প্রবল আশা—তাঁর মেজকুমার একদিন আসবেনই। ঠাকুরের মূর্তির নীচে প্রদীপ জ্বালিয়ে সকাল-সন্ধ্যা প্রতিদিন সে এই প্রার্থনা করে। এখন তার চোখে আর জল আসে না—সব উবে শুকিয়ে গেছে যেন! ঢাকার এক্সপ্রেস কাগজে একটি ছোটো টীকাসহ মধ্যমকুমারের ছবি ছাপা হয় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২ নভেম্বর। ঠাকুরের মূর্তির পাশে সেই ছবিটা দেখতে দেখতে সেই শুষ্ক নয়ন কখনও কখনও সজল হয়ে ওঠে বইকি!

তিন

ক

যদি মেজকুমারের মৃত্যুই না হল, তবে তিনি বাঁচলেন কেমন করে। সেও এক মনোহর কহানিয়া।...

গাছের পাতার ফাঁকে বৃষ্টি এল অঝোরে—দার্জিলিং-এর সেই দীর্ঘ পাদপগুলির মাথা ভিজিয়ে, পাহাড়ি পথ খরস্রোত বইছে। শ্মশানে অঘোরবাবার শিষ্যরা গাঁজায় দম দিচ্ছেন টেনে। দূরে শব্দ উঠল পাহাড় চিরে—বল হরি হরি বোল, বলহরি হরিবোল! সঙ্গে একটা লণ্ঠন আসছে কাঁপা কাঁপা আলো দিয়ে রাতের ভয়ালতা বিধান করে। বৃষ্টি দেখে শিষ্যরা আশ্রয়ের ভিতরে। তাঁদের গুরু খাড়া হয়ে বসে। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই, আকাশ আলোকহীন। সব অস্বচ্ছ। শুধু গাছের পাতার দুলুনি আর মেঘের মাতন। তখন পাইন গাছের গা বেয়ে অঝোরে বৃষ্টি এল।

কাছেই শ্মশান। শবদাহের দল বৃষ্টিতে বেহাল। মৃতদেহটা নড়ে উঠল নাকি? দূরে চিতা প্রস্তুত, কিন্তু বৃষ্টিতে আগুন দেওয়া যাবে কি? দূরে একটা ছাউনি দেখে সবাই সেখানে সিঁটিয়ে বসে পড়েছেন। একটু যদি আগুনের তাপ পোহানো যেত! সাহস করে কেউ আর শবদেহের কাছেই গেলেন না।

বৃষ্টি একটু ধরেছে, বাতাসের উদ্দামতা কম। অঘোরবাবার এক শিষ্য বাইরে এসে শুনতে পেলেন একটা অদ্ভুত গোঙানির আওয়াজ। একে একে সবাই শুনলেন—গুরু ধরমদাস, রোগাপ্যাঁটরা শিষ্য প্রীতম দাস আর চেলা নিকু। কদিন আগেই এঁরা হরিহর ছত্র থেকে নানা তীর্থ ঘুরে এখানে এসে ডেরা নিয়েছেন। নিকুর মা চলে গেছেন কোন্ শৈশবে, বাপ-খুড়োয় গেছেন কোথায় যুদ্ধ করতে। ভাইবোন নেই। তাই আর ঘরে ফিরে যাননি—বাবা ধরমদাসের পায়ের তলায় পড়ে আছেন। বাইরে এসে নিকুই বলেছিলেন—একটা শব্দ

শোনা যাচ্ছে বাবা। আওয়াজ আসছে পুরনো শ্মশানের দিক থেকে। তাঁরা সবাই তখন একটা লণ্ঠন নিয়ে পোড়া কাঠ, টিন, ভাঙা হাঁড়ি ডিঙিয়ে গিয়ে দেখেন একটা খাটে একটা শবদেহ। উপরের কাপড়টা টেনে ফেলে, দড়ির বাঁধন খুলে দিলেন তাঁরা। তারপরে বুঝতে পারলেন—লোকটাই গোঙাচ্ছে অস্ফুটে। বাবা বলে উঠলেন—জিন্দা হ্যায়রে বেটা!

সবাই মিলে ধরাধরি করে দেহটাকে ডেরায় নিয়ে এলেন—বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে সপসপে। গায়ের ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে দেহটাকে তাঁরা কম্বলে মুড়ে দিলেন—তখনও দেহটা ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে। একটা নাপিত এনে যদি মাথাটা মুড়িয়ে দেওয়া যায়। ভিতর থেকে একটা গুঁড়ো এনে খাইয়ে দিয়ে বাবা ধরমদাস কী যেন সব মন্ত্র পড়তে লাগলেন।

সবাই দেখলেন—লোকটার চোখে কাঁপন, যেন পিটপিট করে দেখতে চেষ্টা করছে, ঠোঁট কাঁপছে আর মাঝে মাঝেই চেতনা হারিয়ে ফেলছে। বেদানা, কমলা ছিল—নিকু তার রস মুখে দিতে লাগলেন।

এদিকে শবযাত্রার লোকজন খাটের কাছে এসে দেখেন নেই। কী সর্বনাশ! তাঁদের গা শিউরে উঠল। তবে কি আধিভৌতিক কিছু...। অথচ দেহ দাহ না করে যাবার উপায় নেই। শ্মশানে কি অন্য একটা দেহ আসবে না? ওই এল বুঝি। দাও চিতায় আগুন!!

এমনি করে ক-দিন কাটল। লোকটা এখন অনেকটা সুস্থ। একটু একটু হাঁটতে পারছে। কিন্তু পরিচয় বলতে পারছে না, চোখে দৃষ্টি শূন্য। না, এখানে আর থাকা যাবে না। লোকটার বাংলা কথাও বোঝা যাচ্ছে না। বাবা তাঁকে যোগপট্ট পরালেন—যেন মুণ্ডিতমস্তক ব্রহ্মচারী। মাথায় একটা কাটা দাগ কেন? এঁরা সবাই কাশী রওনা হলেন, ট্রেন ছাড়ল। কাশী পৌঁছে কাশীর নানা ঘাটে। সেখান থেকে উশী মঠে। সেখানে বছরখানেক কাটিয়ে কাশ্মীরে—ঝিলম নদীর তীরে ভেরিনাগে। এখানে একদিন বিড়বিড় করে কী সব বলছিলেন লোকটা! নিকুর কানখাড়া, স্ত্রীর কথা বলছেন কি? শ্রীনগরে তখন মেলা চলছে, সেটা শেষ হতেই আরও নানা তীর্থে মন্দিরে। হঠাৎ করে ব্রহ্মচারীর মনে পড়ল ঢাকার কথা। ভাঙা হিন্দিতে এখন তিনি সড়গড়। মনে পড়ল ভাওয়ালের কথাও। ধুনি জ্বালিয়ে কৌপীন পরে বসে আছেন গুরু ধরমদাস। উঁকি করে

হাতে তাঁর নাম লিখে নিয়েছেন ব্রহ্মচারী। কাছে এসে বললেন—আমার বাড়ি ঢাকায়।

তুমি সেখানে যেতে চাও?

হ্যাঁ।

আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? যাবে যাও, তবে আবার ফিরে এসো।

আমি জানি না, আমি জানি না আমি কে? শুধু জানি আমার বাড়ি ঢাকা।

যাও, সেখানে মানুষ যদি চিনতে পেরে ভালোবেসে তোমাকে গ্রহণ করে, থেকে যেও। এবার আমি হরিদ্বারে যাব, এক বছর থাকব সেখানে—এর মধ্যে যদি ফিরে আসো, সেখানেই যেও। তোমার জন্যে অপেক্ষায় থাকব।

গুরুকে প্রণাম করেন ব্রহ্মচারী, মাথায় ততদিনে জটা হয়েছে। বিশাল দাড়ি মুখে। কম দিন তো হল না—প্রায় বারোটা বছর কেটে গেছে।

গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে ট্রেনে চড়লেন। ট্রেন এসে পৌঁছল শীতের এক রাতদুপুরে ঢাকায়। তারপরে বাকল্যান্ড বাঁধের কাছে আশ্রয়।

খ

বাকল্যান্ড বাঁধ থেকে কাশিমপুরের জমিদার বাড়ি ঘুরে ১২ এপ্রিল জয়দেবপুরের একটা হাতির পিঠে চড়ে সন্ধেবেলায় হাজির হলেন সাধুবাবা জয়দেবপুরের রাজবাড়ির দেউড়িতে। তাঁর আসার অনেকদিন আগে থেকেই চারদিকে গুজব উঠে চলেছিল যে দার্জিলিং-এর অসুখে মেজকুমারের মৃত্যু হয়নি। ঠাকুমা-রানি সত্যভামা সত্যে জানবার জন্যে বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ মহাতাবকে বাংলায় একটি চিঠি লিখলেন ইংরেজি ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ তারিখে বাকল্যান্ড বাঁধে সন্ন্যাসী এসে হাজির হবার সাড়ে তিন বছর আগেই :

জয়দেবপুর রাজবাটী
ভাওয়াল, ঢাকা
১৮ই ভাদ্র, ১৩২৪

কল্যাণভাজনেষু

আমার আশীর্বাদ জানিবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে বহুদিন যাবৎ জানাশুনা থাকা সত্ত্বেও, ইহার পূর্বে আর আমরা কোনওদিন চিঠিপত্র লিখি নাই। আমি স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায়ের পত্নী, কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় নামে আমার তিন পৌত্র ছিল। তাহারা আমার পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের তিনটি ছেলে। তিনটি পৌত্রই সাবালক হইয়া অকালে মারা যায়। তিনজনেরই বিবাহ হইয়াছিল। তাহাদের কাহারও কোনও পুত্র-কন্যা হয় নাই, কাজেই এই রায় পরিবারটি নির্বংশ হইল।

আমার সর্বজ্যেষ্ঠ পৌত্র জয়দেবপুরে তাহার নিজ বাড়িতে মারা যায়, এবং দ্বিতীয়টি দার্জিলিংয়ে ও কনিষ্ঠটি ঢাকায় মারা যায়। প্রায় আট বৎসর পূর্বে আমার দ্বিতীয় পৌত্র তাহার স্ত্রী ও স্ত্রীর ভাইকে লইয়া দার্জিলিং যায়। সে সেখানে রক্তাতিসারে মারা যায়।

গত দুই মাস যাবৎ একটি গুজব রটিয়াছে যে, ভাওয়ালের মধ্যম-কুমার জীবিত আছে; মৃত্যুর পর তাহাকে নাকি একটি গুহার নিকটে দাহ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সে সময় তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তাহার শবদাহ করা হয় নাই। মুখাগ্নি করিয়া তাহাকে সেখানে ফেলিয়া আসা হয়। ইহার পর সদলবলে একজন সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকে পুনর্জীবিত করে। বর্তমানে নাকি সে সেই সন্ন্যাসীর সহিত আছে; সংসারের প্রতি সে উদাসীন এবং সংসার ক্ষেত্রে পুনঃপ্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক। সে যে ঠিক কোথায় আছে, আমি জানি না; নানা লোকে নানা স্থানের কথাই বলিতেছে। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার সর্বত্র এই গুজব রটিয়াছে। এ সম্বন্ধে অসংখ্য লোক আমার নিকট সংবাদ জানিতে চাহিতেছে। আমি কী করিব বুঝিতে না পারিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতেছি।

যাহারা স্বর্গীয় কুমারের সহিত দার্জিলিং গিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে আমি জানিতে পারিলাম যে, আপনি তাহার মৃত্যুর সময় দার্জিলিংয়ে উপস্থিত

ছিলেন এবং আপনিই গঙ্গাজল ও তুলসীপাতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কথা সত্য কিনা তাহা জানিবার জন্যই আমি আপনার নিকট চিঠি লিখিতেছি; সত্যই কি দ্বিতীয় কুমারের শব দাহ করা হইয়াছিল? আপনি ইহা অবশ্যই জানেন। আপনি যতদূর সত্যঘটনা জানেন, আমাকে যদি তাহা জানান, তবে আমি কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি। আমি আশা করি, আপনার সুবিধামত আমাকে এ বিষয়ে জানাইতে আপনি ত্রুটি করিবেন না। আমার আর কিছু লিখিবার নাই। ইতি

(প্রসঙ্গত, এটিই ছিল মূল চিঠি, অন্য যাঁরা উদ্ধার করেছেন তাঁরা ইংরেজি থেকে অনুবাদমাত্র করেছেন) চিঠিটি পড়লেই বোঝা যায় ১৯০৯ সালে মেজকুমারের 'ঘোষিত' মৃত্যুর সংবাদকে সত্যভামা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন, 'গুজব' তাঁকে বিচলিত করে। বংশরক্ষা হচ্ছে না দেখে (তখনও ছোটোকুমার জীবিত) তিনি বিচলিত। মেজকুমারের সঙ্গে দার্জিলিং-এ যান রাজপরিবার থেকে কেবল মেজরানি তাঁর ভাইকে নিয়ে। বর্ধমানরাজ বিজয়চাঁদের সঙ্গে ভাওয়ালরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণের যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল—সেই অধিকারেই সত্যভামা এই চিঠি লিখেছেন মাতৃসুলভ স্নেহ প্রকাশ করে।

প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন মহারাজ রোজব্যাঙ্ক, দার্জিলিং থেকে ১৬ মে, ১৯২১ তারিখে একজন বিশেষ দূতের হাত দিয়ে। কিন্তু ঠিক ঠিক জবাব কি দিয়েছিলেন? যদি দিতেন, তবে এত জটিলতা কখনওই হত না। মহারাজ জবাবে লিখলেন যে, তিনি শ্মশানে কিছু লোককে সমবেত হতে দেখেছিলেন এবং শুনেছিলেন (দেখেননি) যে মধ্যমকুমারের মৃতদেহ নিয়ম মেনেই সৎকার করা হয়। তবে সেটা সন্ধেরাতে না সকালে সেটা এখন ঠিক মনে করতে পারছেন না আর দেহটি অন্য লোকেরও হতে পারে। (The dead body of some one was cremated as that of the Kumar)!

অর্থাৎ সংশয় রয়েই গেল। আর সেই সংশয় গায়ে মেখেই সন্ন্যাসী জয়দেবপুরের রাজবাড়ির দেউড়িতে হাতি থেকে নামলেন। নেমে সোজা মাধববাড়ির ভিতরে যে কামিনী ফুলের গাছটা ছিল, তার নীচে এসে বসলেন। ওদিকে অক্ষয় রায়কে সঙ্গে নিয়ে সত্যভামাদেবীও কাশী থেকে ফিরে এসেছেন। সন্ন্যাসী আসার পর থেকেই মেজকুমারের বেঁচে থাকা নিয়ে আলোচনা চারপাশে বড্ড বেড়ে গেছে। অক্ষয়বাবু ফেরার পর থেকে নিয়মিত সাধুর

কাছে আসতেন। সত্যভামা তাঁকে বললেন—ব্যাপারটা বুঝে আয় তো! অক্ষয় একটা চিরকুট লিখে সেটা একদিন সাধুর হাতে দিলেন—তাতে লেখা ছিল—'ভাওয়ালের ঠাকুরানি আপনাকে দেখতে চান, শোনা যাচ্ছে আপনিই তাঁর নাতি যিনি ১২ বছর আগে হারিয়ে যান।' সাধু কি পড়তে পারলেন?

এদিকে জ্যোতির্ময়ীও সাধুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য ছেলে জলদ ওরফে বুদ্ধুকে পাঠান চৈত্রসংক্রান্তির দিনে। সন্ন্যাসী বলে পাঠালেন—তিনি সন্ধের সময় যাবেন। এলেনও তা-ই। বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় একটা মাদুরের ওপরে বসেছেন তিনি—কাছেই বসেছেন ঠাকুমা সত্যভামাদেবী—সাধু আসবেন জেনে তিনি এসেছেন। জ্যোতির্ময়ী-ইন্দুময়ীর ছেলেমেয়েরা আর প্রয়াত ইন্দুর স্বামী গোবিন্দ মুখুজ্যেও উপস্থিত সেখানে। হাবভাব খুঁটিয়ে দেখে জ্যোতির্ময়ীর দৃঢ় বিশ্বাস—এ তাঁর ভাই না হয়ে যায় না—সেই তেমনি করে ঘাড় বেঁকানো, আড় চোখে দেখা, সেই খসখসে পা, পায়ে দাগ, সেই অদ্ভুত উলটানো কানের লতি। হিন্দিতে কথা চলছিল। সাধু জানালেন এবার তিনি যাবেন ব্রহ্মপুত্রে স্নান করার জন্য লাঙ্গলবন্দ।

যাবার আগে, আগের মতোই সাধুবাবা ধুনি জ্বালিয়ে বসেন বাকল্যান্ড বাঁধে। উকিল/সাব-জজ দেবব্রত মুখোপাধ্যায় আদালত থেকে বাড়ি ফেরার পথে সবিস্ময়ে এই সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীকে একভাবে বসে থাকতে দেখেন। কৌতূহলীদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলেন। দেবব্রতবাবুও শুনতে পেলেন—লোকে বলাবলি করছে এ মেজকুমার না হয়ে যায় না। ২৪ এপ্রিল তিনি শৈবলিনীদেবীর বাড়িতে গেলেন আর ফিরে এসে জ্যোতির্ময়ীর বাড়িতে থাকলেন ৩০ এপ্রিল (১৯২১)। অবিশ্যি চৈত্রসংক্রান্তির পরের দিনই পয়লা বৈশাখের দুপুরে তিনি জ্যোতির্ময়ীর বাড়িতে আসেন এস্টেটেরই পাঠানো একটা গাড়িতে। সেদিনেও সত্যভামা, জ্যোতির্ময়ী, গোবিন্দবাবুরা উপস্থিত ছিলেন। সত্যভামাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে সাধু হিন্দিতে বললেন—বুড়িকা বহুত দুখ...। পরিচয় নিলেন উপস্থিত সব ছেলেমেয়ের, তারপর কাঁদতে শুরু করলেন। ইন্দুময়ীর ছোটোছেলে টেবু এসে সন্ন্যাসীর হাতে মেজকুমারের একটি ছবি দিতেই অঝোর ঝরে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। ছোটোকুমারের ছবি দেখেও একই অবস্থা।

সন্ন্যাসী এখন চুপ। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী যেই দার্জিলিং-এর কথা তুলে

মেজকুমারের মৃত্যুর কথা বললেন, অমনি তিনি তীব্রস্বরে বলে উঠলেন—না, না, সে মিথ্যে কথা, ঝুট বাত তাকে পোড়ানো হয়নি, সে বেঁচে আছে....জিন্দা হ্যায়!

—তুমিই কি আমার সেই হারানো ভাই?

এবার সন্ন্যাসী যেন সংবিৎ ফিরে পান—'না, না, আমি তোমার কেউ নই।' হিন্দিতে বলে ওঠেন তিনি। কিন্তু জ্যোতির্ময়ীর বাংলা প্রশ্ন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সন্ন্যাসী তবে বাংলা জানেন, বাঙালি কি? সব খুঁটিয়ে দেখে জ্যোতির্ময়ীর তো তা-ই বিশ্বাস হল।

৩০ এপ্রিল ঢাকা থেকে তাঁকে জ্যোতির্ময়ী আনিয়ে নিজের বাড়িতে তুলেছেন। পরের দিন ভোরে চিলাই নদীতে স্নান সেরে ছাই মেখে ফিরে এলে জ্যোতির্ময়ী বললেন—তোমাকে তো বারণ করেছিলাম, তবে আবার ছাই মেখে এলে কেন? পরের দিন তাই স্নান সেরে ছাই না মেখে ফিরে এলে জ্যোতির্ময়ী এবং উপস্থিত সবাই সব খুঁটিয়ে দেখে রায় দিলেন—এই সন্ন্যাসীই নিরুদ্দিষ্ট মেজকুমার। সেই রায় তাঁরা আরও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ৪ মে—সন্ন্যাসীর স্বভাবের ও শরীরের আরও সব লক্ষণ মিলিয়ে দেখে। কিন্তু এতে সন্ন্যাসী বিরক্ত। এদিকে সন্ন্যাসীর খবর চারদিকে রটে যাওয়ায় জ্যোতির্ময়ীর বাড়ির সামনে লোকেরা ভিড় বাড়িয়েই চলেছেন। পীড়াপীড়ি চলছেই ভিতরে আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্যে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে—জ্যোতির্ময়ী জেদ ধরে বললেন—তুমি তোমার সত্য পরিচয় যতক্ষণ না দিচ্ছ—আমি অন্নজল গ্রহণ করব না। সন্ন্যাসী ততক্ষণে একটা আরামকেদারা নিয়ে বাইরে অপেক্ষমান জনতার কাছে গিয়ে বসেছেন। সুয্যি পাটে ঢলে পড়ছেন প্রায়—তাঁকে সাক্ষী রেখেই কুন্তীর সামনে কর্ণের মতো সন্ন্যাসী অস্ফুট জড়িমাজড়িত কণ্ঠে স্পষ্ট বাংলায় উচ্চারণ করলেন—আমার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি!

জনতা উল্লসিত।

একজন ভিড় ঠেলে এসে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর পিতার নাম কী? সন্ন্যাসীর উত্তর যথাযথ। এবার কঠিনতর প্রশ্ন—আপনাকে যিনি মানুষ করেছিলেন সেই দাইয়ের নাম কী? সহজতম উত্তর সন্ন্যাসীর—অলকা।

'জয়, মেজকুমারের জয়'—জয়ধ্বনিতে সেই আসন্নসন্ধ্যা সহসা হাজারবাতি

রোশনাইয়ে জ্বলে উঠল। মেয়েরা শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনি করতে লাগলেন। প্রবল আবেগে সন্ন্যাসীর মূর্ছা হল। সন্ন্যাসীকে সুস্থ করে জ্যোতির্ময়ী একটি মোটরে করে ছোটোবোন তড়িন্ময়ীর স্বামী ব্রজলাল মুখার্জির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। ধাবমান জনতাকে কোনওক্রমে অনুসরণ করা থেকে নিবৃত্ত করলেন।

দেখেশুনে ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজার নিডহ্যাম ঢাকার কালেক্টর মি. লিন্ডসের কাছে একটা চিঠি লিখলেন পরের দিন ৫ মে, ১৯২১ তারিখে। আসলে এদিনের (৫ মে) বিকেলে ভাওয়াল এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মোহিনীমোহন চক্রবর্তী নিডহ্যামের মৌখিক নির্দেশ মেনে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে কয়েকজন পদস্থ লোককে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁকে তাঁর পরিচয় জানাবার জন্যে কিছু প্রশ্ন করেন কিন্তু সে সবের উত্তর তিনি দেননি। কিন্তু তিনি নিজের, বাবার এবং দাদার নাম ঠিক, ঠিক বলেছেন—এটা সত্যি। তাঁর পরিচয় মিথ্যা কিনা জানি না, কিন্তু প্রজাদের সহানুভূতি তিনি বেশ আদায় করতে পেরেছেন এবং প্রজারা তাঁদের মেজকুমারের পরিচয় সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয়। হ্যাঁ, তিনি বলেছেন প্রয়োজন হলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর পরিচয়ের উপযুক্ত প্রমাণ দেবেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে নিডহ্যাম লিন্ডসেকে উপরে বর্ণিত সব ঘটনা বিবৃত করে D.O. No. 100 সংখ্যক চিঠিটি পাঠিয়ে সব শেষে লেখেন—এমত অবস্থায় সন্ন্যাসীর বিষয়ে জানবার তদন্ত করা উচিত। ভোর থেকেই বিপুল জনতা সন্ন্যাসীকে দেখতে আসছে। অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হলে পরিণাম গুরুতর হতে পারে।

জে এইচ লিন্ডসে এম.এ.. আই.সি.এসকে ৫.৫.২১ তারিখে মেমো নং ১২-র এই চিঠির একটি প্রতিলিপি নিডহ্যাম বিভাবতী দেবীকেও পাঠিয়েছিলেন। জয়দেবপুরের থানাতেও ৪ এবং ৫মে এইসব ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছিল। এই ৫ মে তারিখেই আশুতোষ দাশগুপ্তের লেখা (জয়দেবপুর থেকে) একটি পোস্টকার্ড পেলেন বড়োরানির ভাই শৈলেন্দ্র মতিলাল বউবাজারের ৮, মধুসূদন গুপ্ত লেনের ঠিকানায়; 'ভাওয়ালে এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা কোন্ নভেলেও পড়ি নাই। এখানে বুদ্ধুবাবুর বাড়িতে এক সাধু আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি মেজকুমার এবং তাঁহার নাম রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিনি

অলকা দাইয়ের নামও বলিয়াছেন। প্রজারা দুই লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিবে ও তাঁহার সম্পত্তি উদ্ধার করিবে। প্রত্যহ পাঁচ-ছয় হাজার লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছে এবং কেহ কেহ নজর দিতেছে। প্রত্যেক নরনারীর দৃঢ় বিশ্বাস, তিনিই মেজকুমার—এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। এই ব্যাপারে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম, সাধুর কথা মিথ্যা, তাই ভাওয়ালের লক্ষ লক্ষ লোক আমার নিন্দা করিতেছে। আমি অত্যন্ত উদ্‌বেগে দিন কাটাইতেছি।'

আসলে আশুবাবু একটা ব্যাপার ঘটিয়ে এসেছিলেন এ দিনেই। মোহিনীমোহন চক্রবর্তী মশায়ের যে রিপোর্ট উল্লেখ করেছি, তাতে জেনেছি ও দিনে তাঁর সঙ্গে আশু ডাক্তারও গিয়েছিলেন। তিনি বলেন—তিনি একটি প্রশ্ন করবেন আর সন্ন্যাসী যদি তার সঠিক উত্তর দিতে পারেন, তবে তিনি তাঁকে মেজকুমার বলে মেনে নেবেন। এই বলে তিনি হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে জিগ্যেস করেন—দার্জিলিং-এ বাড়ির কার্নিশে একটি পাখি ছিল, কে সেই পাখিটাকে গুলি করে মেরেছিল এবং তাকে তুমি কেনই বা বকেছিলে? আশুবাবু প্রশ্ন করা মাত্রই একজন বলে উঠেন যে উত্তর পাবার আগে আশুবাবু যেন জয়দেবপুরের সাব-রেজিস্ট্রার গৌরাঙ্গ কাব্যতীর্থকে উত্তরটা বলে রাখেন। আশুবাবু বলে রাখলেন বীরেন্দ্র ব্যানার্জির নাম।

এবার সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—হরি সিং।

আশু ডাক্তার বললেন—হল না, হরি সিং দার্জিলিংয়ে যায়নি। (আমরা যে তালিকা দিয়েছি দার্জিলিং পার্টির তাতে হরি সিং-এর নাম আছে)। সবাই চুপ। তখন বীরেন ব্যানার্জিকে ডাকা হল। তিনি এসে জানালেন—পাখি হরি সিং-ই মেরেছিল কারণ বীরেনবাবু বন্দুক ছুঁড়তেই জানেন না। এসব কথা কিন্তু মোহিনীবাবু নিডহ্যামকে দেওয়া রিপোর্টে কিছু লেখেননি।

গ

এর মধ্যে কাগজে লেখালেখি শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলা কাগজের মধ্যে বিশেষ করে বসুমতী সরেজমিন খোঁজখবর নিয়ে সংবাদ ছাপাতে লাগায়

জনসাধারণের মধ্যে সন্ন্যাসীর খবর বেশি প্রচারিত হতে থাকে। অন্যদিকে সত্যবাবুর স্ট্যাটাস বেড়েছে, টাকা-পয়সা হয়েছে, লোকে বলাবলি করছেন তিনি শিগগিরই রায়বাহাদুর হবেন। বিভাবতী তো সেখানেই—তেলাপোকা যেমন কাঁচপোকাকে টেনে নিয়ে যায়—আশুতোষপদ তাকে সেইভাবেই টেনে নিয়ে গেছেন। সত্যবাবু ভালো ইংরেজি বলতে পারেন, আইন বোঝেন—ইংরেজরা তাঁকে পছন্দও তো কম করেন না। কিন্তু বিভাকে পাঠানো নিডহ্যামের চিঠির প্রতিলিপি পড়ে সেই সত্যবাবুর অবস্থাও চিত্তির। তিনি বলে উঠলেন—এটা কখনই সত্য নয়। আমরা যাব, এর-শেষ পর্যন্ত দেখব। তাঁর বুকটা কি ভিতরে ভিতরে কাঁপেনি? দাদাকে জড়িয়ে ধরে বিভাবতীও কি বলে ওঠেননি—তাহলে কী হবে আশুতোষপদ? 'The Englishman' পত্রিকাও 'Dacca Sensation' নাম দিয়ে কি সব খবর-টবর করেছে। ৯ মে, ১৯২১ তারিখে সত্যবাবু তাই 'দি ইংলিশম্যান' কাগজের সম্পাদককে একটা চিঠি দিলেন :

To
The Editor of The Englishman,
Sir,

You published on Saturday morning a report sent by the Associated Press from Dacca under the heading "Dacca Sensation", to the effect that a person has suddenly appeared who claims to be the Second Kumar of Bhowal, who died twelve years ago.

The late Kumar was attended in his last illness by Lieutenant Colonel Calvert, the then Civil Surgeon of Darjeeling and the death certificate was given by Mr. Crawford, Deputy Commissioner of Darjeeling.

I was personally persent at the time of the death of the late lamented Kumar an attended the funeral service along with numerous friends and relatives of the deceased who were then present in Darjeeling. The Rani of Bhowal, the widow of the second Kumar, who is my sister, is still alive.

Yours etc.

S.N. Benerjee

9th May 1921

চিঠি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হল না, ছাপা হল ১৯ মে। ১৫ মে, জয়দেবপুরের সেই বিশাল জনসভার চার দিন পরে। সেই সভা, যেখানে একটা হাতির পিঠে চড়ে সন্ন্যাসী জনসাধারণের কাছে তাঁর পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেন, যেখানে সবাই তাঁকে মেনে নেন মধ্যমকুমার বলে এবং বৃষ্টি এসে সভা পণ্ড করে না দেওয়া পর্যন্ত সন্ন্যাসী হাতির পিঠে চড়ে সবাইকে দর্শন দেন। চিঠিটি ছাপা হয়েছিল "THE DACCA SENSATION"/A DENIAL—শিরোনামে। সত্যবাবু অবশ্য শুধু চিঠি লিখে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকলেন না—দেখা করলেন, মি. লিন্ডসে এবং অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে, তাঁরা তো তাঁকে খুব পছন্দ করতেন। তাঁরা তাই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন—সন্ন্যাসী সবার চোখে ধুলো দিচ্ছেন।

ঘ

এলোকেশীও শুনেছিল দার্জিলিং-এ কুমারের মৃত্যুর খবর। আবার ১২ বছর পরে আবির্ভূত সন্ন্যাসীই যে মেজকুমার—সেই জনশ্রুতির কথাও তার কানে গিয়েছিল। একদিন তাই আর্মানিটোলায় জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়িতে সে গেল সন্ন্যাসী সত্যিই কিনা তা একবার নিজের চোখে যাচাই করে নিতে। সে তো মেজকুমারকে ভেতরে-বাইরে চেনে। অনেক লোকের মাঝে মেজকুমারকে চিনে নিতে সেদিন তার কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু সেদিন কোনও কথা হয়নি। পরে একদিন সে শিখমন্দির নানকশাহ-তে একটা ধর্মীয় সভায় মেজকুমারকে দেখতে পেল। একদৃষ্টে সে কুমারকে দেখতে দেখতে হঠাৎ চারচোখের মিলন হল। সন্ন্যাসী উঠে এসে জিগ্যেস করলেন—'এলোকেশী, তুমি কেমন আছ?' এর পরেও দুজনের একাধিকবার দেখা হয়েছে। এলোকেশীর কোনও সন্দেহই রইল না যে সে-ই তার মেজকুমার।

ব্যাপারটা জানতে পেরে অনেক পরে কোতোয়ালি থানার অফিসার ইন-চার্জ সুরেন্দ্র পট্টনায়ক এলোকেশীকে তলব করেন এবং তাকে মামলায় সাক্ষী দিতে মানা করেন। মামলা লড়ছে সরকার, সরকারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে তোকে কিন্তু খুব ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে। আদালতে সে যাতে না যায় তার

জন্য বড়োবাবু তাকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন। কেন এই উৎকোচ?

৬

১৫ মে তারিখে সন্ন্যাসীর পক্ষের লোকজনেরা জয়দেবপুরে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করেন। হাজার হাজার লোক এলেন দূরদূরান্ত থেকে ট্রেনে, গাড়িতে, নৌকায়, পায়ে হেঁটে। পুলিশের রেকর্ডে দশ হাজার, কাগজে খবর বের হয় চল্লিশ হাজার। রেল কোম্পানি বাধ্য হয়ে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেন—লোকেরা এলেন গাড়ির ছাদে চড়ে, পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে। এক আনা সের চিঁড়ের দর উঠেছিল এক টাকা। এ দিনের সভায় সভাপতিত্ব করলেন বরিষাবরের বিখ্যাত তালুকদার আদিনাথ চক্রবর্তী। এই সভাতে তিনি, কুমারের তথাকথিত মৃত্যু, গুজব, উত্তেজনা এবং সাধুর আবির্ভাব নিয়ে সবিস্তারে বক্তব্য রাখেন। প্রসঙ্গক্রমে সন্ন্যাসীর পরিচয় উদ্ঘাটনে আত্মীয়স্বজনের প্রশ্নাদি, সন্ন্যাসীর জবাব, তাঁর শরীরের বিবিধ চিহ্ন এবং তিনিই যে মেজকুমার—তার ঘোষণা ব্যাপারেও বুঝিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী যে ভাওয়ালের মেজকুমার তিনি নিজেও তা জোর দিয়ে বলেন। কয়েকজন কুচক্রী এবং মতলববাজ আত্মীয় ও পরিজন কীভাবে এর বিরুদ্ধাচরণ করছেন—তাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খুলে বলেন। তিনি উপস্থিত জনগণকে বলেন—যাঁরা সন্ন্যাসীকেই মধ্যমকুমার বলে মনে করেন—তাঁরা হাত তুলে জানান। হাজার হাজার হাতের কাঁপনে বিশ্বাসের হিল্লোল বয়ে গেল। আর যাঁদের মনে সন্দেহ আছে—এবার তারা হাত তুলুন। একটি হাতও শূন্যে দোলায়িত হল না। তখন পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব রাখলে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল। ঠিক হল প্রস্তাবের অনুলিপি লাটসাহেব, বোর্ড অফ রেভিনিউ, ডিভিশনাল কমিশনার এবং জেলাশাসক কে পাঠানো হবে। ঠিক সেই সময়ে যে মানুষটিকে দেখবার জন্য এই অর্ধলক্ষ লোকের জমায়েত—সেই মানুষটি ধীরে ধীরে একটি হাতির পিঠে চড়ে সভাটি পরিক্রমা শুরু করলেন। আর তখনই আকাশ কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠল—'জয়, মধ্যমকুমারকি জয়।' হঠাৎ মেঘ কালো করে একটা দমকা ঝড়

এল, এ সময়ে যেমন কালবোশেখি আসে, তেমনি ঝড়ের পরই তুমুল বৃষ্টি এল। সভা ভেঙে গেল, কিন্তু সবার পাওনার ভারা পূর্ণ হয়ে গেল।

আর ঠিক এই দিনেই ৩০ বৈশাখ, ১৩২৮ তারিখে দুর্গানাথ চক্রবর্তী ৪ নং কোর্ট হাউজ রোড, ঢাকার ভিক্টোরিয়া প্রেস থেকে ছাপা একটি ছয় পৃষ্ঠার পুস্তিকা ছেপে প্রকাশ করলেন, দাম করলেন এক আনা মাত্র, নাম দিলেন 'ভাওয়ালে মৃত্যুবাসী-দর্শন।' এটিই সম্ভবত পুস্তিকা সিরিজের দ্বিতীয় প্রচারপত্র। এটি 'চিরানুগত' লেখক উৎসর্গ করেছিলেন 'শ্রীল শ্রীযুক্ত নবীন সন্ন্যাসী/ রমেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বাহাদুর/মহোদয়ের করকমলেষু' লিখে স্বয়ং মধ্যমকুমারকে। অতি দুষ্প্রাপ্য এই পুস্তিকার অংশবিশেষ উদ্ধার করি, প্রথম প্রচারপত্রটি লেখেন সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'জয়দেবপুরের নবীন সন্ন্যাসী' নামে। এটিতেই সন্ন্যাসী যে কুমার, তা প্রথম প্রমাণের চেষ্টা হয়। ১৯২০ সালে এটি ছাপার পর ১৯২১ সালে আরও দু-বার ছাপা হয়।

স্বশরীরে স্বজীবনে
মৃত্যুবাস হ'ল কেনে
প্রকাশ করিতে তাহা কেন হে কৃপণ।
বল হে সংযমী সাধু ইহার কারণ ।।...

অনুমান করি এটি সাধু নিজের পরিচয় ঘোষণা করার আগেই লেখা এবং ছাপা। মুহূর্তের মধ্যে এর প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে যায়। এত লোক এদিন জড়ো হয়েছিল, তাই এই ১৫ তারিখেই এটি দ্বিতীয়বার ছাপা হয় একই দাম রেখে। বোঝা যাচ্ছে—এই পুস্তিকা, সন্ন্যাসীর পক্ষে। কিন্তু বিপক্ষ তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাঁরাও পুস্তিকা প্রচার করতে লাগলেন। ঢাকা থেকে বের হয়েছিল, এখন প্রতিবাদ উঠল (এবং এটিই প্রধানতম এবং বলতে গেলে একতমও গুরুত্বের দিক থেকে) কলকাতা থেকে। ছাপা হয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস থেকে, ঠিকানা ৭১/১ নং মির্জাপুর স্ট্রিট, কলকাতা; প্রিন্টার ছিলেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার (প্রেসের ঠিকানা লক্ষণীয়)। ভাওয়ালী কাণ্ড নামে এই সন্ন্যাসী বিরোধী পুস্তিকার লেখক ছিলেন কেদারনাথ চক্রবর্তী—ঠিকানা ছিল ২২নং গোকুল মিত্র লেন। কেদারনাথ ছিলেন *রায়ত* পত্রিকার সম্পাদক এবং সন্ন্যাসী আসার সময় থেকেই 'রায়ত'-এ নানান প্রাসঙ্গিক লেখা লিখছিলেন, বিশেষ করে সহযোগী পত্রিকা 'বসুমতী'র সন্ন্যাসী সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলির

প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। এগুলিই জড়ো করে তিনি সন ১৩২৮-এর ২৮ ভাদ্র এই পুস্তিকাটি প্রচার করেন—সন্ন্যাসী যে জাল এটা প্রমাণ করার জন্যে। তিনি লেখেন :

> কুমারদিগের ভগ্নিগণ সুন্দরদাস নামে এক উর্দুভাষী সন্ন্যাসী বেশধারী ব্যক্তিকে কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া জাহির করিয়াছেন।...ভাওয়ালের প্রজাদেরও এখন আর প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে বাকি নাই। তারা প্রকাশ্য সভা সমিতিতে সন্ন্যাসীর স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপ একটি সভার বিবরণ এই পুস্তকে ছাপান হইল।

প্রথমেই তিনি জ্যোতির্ময়ীদেবীকে আক্রমণ করেছেন, কারণ, তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন—'জ্যোতির্ময়ী রাজবাড়ির সীমানার বাইরে দূরে টীনের ঘর তুলিয়া কায়ক্লেশে বাস করিতেছেন। কন্যাদের ক্ষীণ আশা ছিল ভাইরা অপুত্রক হওয়ায় এবং কেউ দত্তক না নিলে সম্পত্তি তাঁদের পুত্ররাই পাবেন।' অবশ্য লেখক এ কথাও বলেছেন—'সন্ন্যাসী কিন্তু সম্পত্তি দাবী করিতেছেন না।' সন্ন্যাসীর হাতি-চড়া কাহিনি তাঁর মতে 'গুজব মাত্র এবং মৃত্যুর রাতে 'এক ফোঁটা বৃষ্টিপাত হয় নাই' বলে আবহ প্রতিবেদনের উল্লেখ করেছেন। নারায়ণগঞ্জের সুশিক্ষিত নিবারণচন্দ্র মুখার্জি ১০ মে, ১৯২১ তারিখে জয়দেবপুরের জমিদার ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে চিঠি লেখেন—তার অংশবিশেষও তিনি উদ্ধার করেন।—'I was one of the Shasanbandhus of the 2nd Kumar and I can swear that his dead body was perfectly and properly burnt into ashes'... 'know everything about his cremation, condolence meeting etc perfectly well.' অন্যদিকে ৫ জ্যৈষ্ঠ বসুমতীতে আনন্দচন্দ্র রায় যে বলেন, 'তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কোনো কথা বলিতে প্রস্তুত না হইলেও সন্ন্যাসী যে ভাওয়ালের কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ সে বিষয়ে তাহার মনে কোনো সংশয় নাই'—এই প্রতিবাদে 'ভাওয়ালের স্বর্গীয় রানি বিলাসমণিদেবীর কনিষ্ঠ সহোদর' জয়দেবপুরের বসন্তকুমার ভট্টাচার্যের 'হিন্দুস্থান' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা একটি চিঠির উল্লেখ করেছেন চিঠিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্য কেউ এটিকে ব্যবহার করেননি বলে আমি সমগ্রত এটি উদ্ধার করছি :

শ্রীযুক্ত 'হিন্দুস্থান' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়।

আপনার সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানা প্রকাশ করিলে নিতান্ত বাধিত হইব। ৪/৫ মাস যাবত ভাওয়াল সন্ন্যাসী মধ্যমকুমার কিনা সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট আন্দোলন চলিতেছে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, সন্ন্যাসী প্রকৃত মধ্যমকুমার, অপরদিকে কেহ কেহ বলিতেছে যে, সন্ন্যাসী প্রতারক।

স্বর্গীয় মধ্যমকুমার আমার সহোদরা ভগ্নিপুত্র। আমি বহুদিন যাবত সেই সূত্রে ভাওয়াল রাজ পরিবারের আশ্রয়ে থাকিয়া কালাতিপাত করিতেছি এবং স্বর্গীয় মধ্যমকুমারকে আশৈশব দেখিয়াছি; কাজেই বর্তমান সন্ন্যাসী ও স্বর্গীয় মধ্যমকুমারের মধ্যে কি পরিমাণে আকৃতিতে সাদৃশ্য আছে, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। উভয়ের মধ্যে এমন কোনো সাদৃশ্য আমি দেখিতে পাই নাই, যাহাতে সন্ন্যসীকে দেখিলে মধ্যমকুমার বলিয়া সন্দেহ হয়। এমতাবস্থায় বহু লোকের এই সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র মধ্যমকুমার বলিয়া ঘোষণা করা বাতুলতা মাত্র।

আমি এই সন্ন্যাসীকে আমার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবীর বাড়িতে দেখিয়াছি এবং তাঁহার চালচলন, কথাবার্তা, গলার স্বর, হাঁচি প্রভৃতি বিশেষভাবে লক্ষ করিয়াছি। বহু লোক তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছে, কিন্তু কোনো প্রকারেই এই সন্ন্যাসীকে আমার স্নেহাস্পদ ভাগিনেয় স্বর্গীয় রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া বিশ্বাস করা দুরে থাক এমন কোনোরূপ সন্দেহ করিতে পারি নাই। অত্রাবস্থায় লোক যে বিষমভ্রমে পতিত হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইতি ৫ভাদ্র, ১৩২৮ সাল।

কেদারবাবু পুস্তিকায় বলেছেন সন্ন্যাসী যে কুমার নন, এই মতের পক্ষে সভাসমিতিও হয়েছিল। এমন একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৩ আগস্ট, ১৯২১ তারিখে বিকেল ৫টায় জয়দেবপুরে। মাত্র ৫০০ জন তালুকদার ও রায়দের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন উমাপতি ধর। সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—১. ভাওয়াল তালুকদার ও প্রজাসমিতি নামে যে সভা স্থাপিত হয়েছে তা সর্বসম্মত নয়, এবং এদের সঙ্গে এই সভার কোনোও সম্পর্ক নেই, ২.১জৈ্যষ্ঠ রবিবার জয়দেবপুরের সভায় (১৫ মে, ১৯২১) সন্ন্যাসীকে যে

মেজকুমার বলে ঘোষণা করা হয়েছে 'এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করে।' ৩. এই সাধু একজন প্রতারক। এই প্রস্তাব তিনটির মধ্যে প্রথম দুটি পেশ করেন গিরিজাকিশোর চৌধুরী এবং সমর্থন করেন—১. আবু সরকার ২. মুকুন্দলাল গুণ। তৃতীয় প্রস্তাবটির উত্থাপক ছিলেন ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠক, এই তালিকায় একটি নাম খুব চেনা লাগছে না?—মুকুন্দলাল গুণ। গুণধরটি কে তা আপনারা জেনেই এসেছেন—সত্যবাবুর পেয়ারের লোক, যদিও মেজকুমারের কেরানি ছিলেন। বেচারিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল এই মিটিং-এর মাত্র কদিন পরেই ঢাকার প্রকাশ্য রাজপথে—অবশ্যি আততায়ীর পরিচয় কোনোদিনই জানা যায়নি।

বসন্তবাবু, কুমারদের দাদুর কথা আপনারা পড়ে এলেন। আরও একটি দুষ্পাপ্য নথি আপনাদের সমনে পেশ করার অনুমতি চাইছি। এটিও আজ পর্যন্ত কেউ ব্যবহার করেননি। বসন্তবাবুর চোখে সম্ভবত ছানি পড়েছিল, না পড়েনি, ছানি ফেলা হয়েছিল।. কিন্তু আর একজন 'জান-পহচান আদমি' রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ কী বলছেন শুনে নিন।

> ভাওয়ালের মধ্যমকুমারকে আমি চিনিতাম। তিনিও অবশ্য আমাকে চিনিতেন। তবে বড়ো লোকের কথা স্বতন্ত্র; এই যা কিছু তফাৎ। 'সন্ন্যাসীকুমার এখন তাঁহার ভগ্নির বাসা বাড়িতে ঢাকা, আর্মানিটোলা বাস করিতেছেন।...একদিন সে দুর্দমনীয় কুতুহল নিবারণার্থে একেবারে যাইয়া আর্মানিটোলা হাজির হইলাম...' (প্রথমবারে চেষ্টায় দেখা হয়নি, হয়েছিল ২২ বৈশাখ রাতে) 'বোধহয় তিনি আমাকে চিনিয়াছিলেন, তাই আপ্যায়নে ত্রুটী রাখিলেন না।
>
> 'আমার মাথায় পাগড়ি ছিল। যাইয়া দেখি, সেখানে বহু লোক;...সন্ন্যাসী নিজেই আমাকে তাঁহার পার্শ্বের আসন দেখাইয়া বসিতে বলিলেন।'...(প্রথমে ঠিক বুঝতে না পারলেও, পাগড়ি খুলতেই) 'সন্ন্যাসী এবার আমার দিকে চাহিয়াই বলিলেন, আপনি পূর্ণ ঠাকুরের মাতুলভ্রাতা।'
>
> শুনে রাজেন্দ্রবাবু অবাক হয়ে পড়েন। পূর্ণচন্দ্র ছিলেন ভাওয়াল রাজপরিবারের গুরু, লেখকের 'পিসতাত ভ্রাতা'। তারপর দুজনে অনেক কথাবার্তা হয়; তিনি অনেকবার জয়দেবপুরে গিয়েছিলেন মধ্যমকুমার থাকতে। শেষ করে দুজনের দেখা হয়েছিল জিগ্যেস করতেই সন্ন্যাসী বলেন—

আপনি আপনার ভ্রাতার বিবাহে একবার হাতি চাহিয়াছিলেন। তারপর জন্মাষ্টমীর পূর্বে একবার দেখা, বোধহয় সেই শেষ দেখা।' তাঁর স্মৃতিশক্তি দেখে তো রাজেন্দ্রবাবু অবাক, হাতি চাওয়া ঘটনার সত্যিই ছিল। 'সে কি আজকার কথা! বিশ বৎসরের প্রাচীন কথা।' সন্ন্যাসী বললেন, 'পঁচিশ বৎসর হইয়াছে।' বাড়ি ফিরে গিয়ে খোঁজ নিয়ে রাজেন্দ্রবাবু জানেন—ভাইয়ের বিয়ে ২৪ বছর আগেই হয়েছে। তবে সন্ন্যাসী তার নাম মনে করতে পারেননি। তবুও, লেখক লিখেছেন, 'আমি কিন্তু সন্ন্যাসী কুমার সম্বন্ধে সন্দেহহীন বিশ্বাস লইয়াই বিদায় লইলাম। সাকার ভূতেও আমার বিশ্বাস আছে; ভেল্কিতেও অবিশ্বাসী নয়। এখন দেখা যাউক কোথাকার মড়া কোথায় যাইয়া ভাসে!

—'ভাওয়ালের সন্ন্যাসীকুমার', *সৌরভ*, আষাঢ় ১৩৩০, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

চ

সেই জল গড়াতে গড়াতে আপাতত সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করল নতুনভাবে। ছোটোরানি আনন্দকুমারী বোর্ড অফ রেভিনিউকে টেলিগ্রাম করেছেন—মোহিনীবাবুকে সরিয়ে দ্বারিকাবাবুকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার করা রদ করুন। মেজরানির টেলিগ্রামেও সেই অনুরোধ, বাড়তি কথা—একজন জালি লোককে তাঁর স্বামী বানানো হচ্ছে। তিনি দাদাকে বললেন—আশুপদ, এবারে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হও।

এদিকে জ্যোতির্ময়ী তো ধরেই নিয়েছেন তাঁর হারানো ভাই ফিরে এসেছে। রানি সত্যভামারও তাই ধারণা—নাতিকে পেয়ে তিনি খুশিতে ডগমগ। একদিন তড়িন্ময়ীও স্বামী ব্রজলালকে ও সন্তানদের নিয়ে জ্যোতির্ময়ীর কাছে এলেন। মোটো (তড়িন্ময়ীর ডাক নাম) ঘরে ঢুকেই 'তিনি কোথায়' বলে সন্ন্যাসী দেখেই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। ব্রজলাল তো স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবাক। মোটো বলেন—দাদা, এতদিন কেমন করে ছেড়ে ছিলে? সন্ন্যাসী নিশ্চুপে তাঁর চোখ মুছিয়ে দেন। সন্ন্যাসী তাঁকে তুলে ধরতেই তড়িন্ময়ী তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আগে তাঁর সন্দেহ ছিল, এখন ব্রজলালবাবুও বুঝতে পারলেন—ইনিই কুমার। তখন সন্ন্যাসী তাঁকে তাঁর গুরু ধরমদাস নাগার কথা, মন্ত্র দিয়ে উল্কিতে হাতে তাঁর নাম লেখা—সব কথা বললেন। সব শুনে জ্যোতির্ময়ীর

মেয়ে প্রমোদবালার স্বামী সাগরবাবু (সতীনাথ ব্যানার্জি) বলে উঠলেন—আমরা গিয়ে গুরু ধরমদাসকে নিয়ে আসব। পরিচয় স্পষ্ট করে জানার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা বিশেষ দরকার।

এদিকে সত্যভামাদেবী তাঁর 'হারানো নাতি' যে ফিরে এসেছে তাঁর মনে যে কোনও সন্দেহ নেই তা জানিয়ে ১৯, ল্যান্সডাউন রোডে সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ঠিকানায় মেজরানিকে একটি নাতিদীর্ঘ চিঠি পাঠালেন। তাতে তিনি লিখলেন—'আমার ঐকান্তিক অনুরোধ, তুমি আসিয়া স্বচক্ষে একবার দেখো, অতঃপর ন্যায় ও ধর্ম অনুসারে যাহা তোমার কর্তব্য হয়, তাহাই করিয়া আমার স্বামীর বিখ্যাত পরিবারের মানসম্ভ্রম রক্ষা কর।'

তিনি চিঠি লিখলে কী হবে, সে চিঠি ফেরত এল। জানি না, মেজরানি জানলেন কিনা যে তাঁর নামে চিঠি এসেছিল। খামের উপর প্রেরক হিসেবে সত্যভামার নাম দেখেও তিনি কি ফেরত দিতে পারেন? না স্বয়ং সত্যবাবুই পত্রদর্শনমাত্র ফেরত পাঠিয়ে দিলেন! জনৈক পল্লি কবি লিখলেন :

কোথা গো মধ্যম রাণী সব থাকতে কাঙালিনী
এ মুখখানি একবার দেখে যাও।
যদি হয় হারারত্ন, পরে লও শঙ্খরত্ন,
যত্ন করি রত্নের মান বাড়াও ।।
শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রের মিলন, শ্মশানে কাশীধামে
তাহাতে আশ্চর্য মিলন, এ মিলন বক্ষভূমে।
বেহুলার মূর্তি ধরি সপ্ত প্রদক্ষিণ করি,
দক্ষিণের বন দক্ষিণে বসাও।

পরে সব শুনে সত্যবাবুর ধর্মপত্নী ভীষণ খেপে যান এমনকি তিনি ভাইবোনের খারাপ সম্পর্কের ইঙ্গিত পর্যন্ত দিয়ে বসেন।

সত্যভামা আবেদন করলে আর কবি গাইলে কী হবে—সরকার গাইতে লাগলেন অন্য গান। ভাওয়াল তালুকদার ও প্রজাসমিতি লক্ষ টাকা চাঁদা তুলছেন, প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে সন্ন্যাসীকেই টাকাপয়সা দিচ্ছেন দেখে ৩ জুন ১৯২১ তারিখে একটা নোটিশ জারি করলেন বাংলায়—সন্ন্যাসী যে একজন জাল তা ঘোষণা করে—

নোটিশ

এতদ্দ্বারা নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে, বারো বৎসর পূর্বে দার্জিলিঙে ভাওয়ালের মেজকুমারের শব দাহ করা হইয়াছিল, কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ পাইয়াছেন। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, সে সাধু নিজেকে মেজকুমার বলিতেছেন, তিনি একজন প্রতারক। যাঁহারা তাঁহাকে খাজনা দিবে, তাহারা নিজ দায়িত্বেই দিবে।

রেভেনিউ বোর্ডের অনুমত্যনুসারে
জে এইচ লিন্ডসে
ঢাকার কালেক্টর
৩/৬/২১

এই ফতোয়া জারির সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডগোল বেড়ে গেল। আদেশ অমান্য করে প্রজারা সন্ন্যাসীকেই খাজনা দিতে লাগলেন। ৭ জুন জয়দেবপুর ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন সন্ন্যাসী। ১০ জুন মির্জাপুরে ওই নোটিশ জারি করার সময় দাঙ্গা দেখা দেয় নোটিশ জারির প্রতিবাদে, পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হন এবং ঝুমল আলি নামে এক ব্যক্তি গুলিতে প্রাণ হারান। এই বাদ-প্রতিবাদ আরও পঁচিশ বছর ধরে চলতে থাকবে—কে জানত।

ঢাকাতে থাকতে থাকতেই সন্ন্যাসী তাঁর দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলেন। জটা অবশ্য থাকল। সাদা থান পরে থাকলেন। এদিকে বুধুবাবু অনেক খোঁজাখুঁজি করে ধরমদাসকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তিনি চারদিন ধরে জ্যোতির্ময়ীর বাড়িতে প্রায় লুকিয়েই রইলেন—ভয় পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। তিনি সব কথা খুলে বললেন না—ফলে রহস্যের ফাঁস খুলল না। চার দিন পরে তিনি ঢাকা থেকে চলে গেলেন। সাধু সন্ন্যাসীরাও তাহলে পুলিশকে ভয় পান? কিন্তু কেন? অন্যদিকে সত্যবাবুর প্ররোচনায় লিন্ডসেও মন্তাজউদ্দিনকে পাঞ্জাবে পাঠিয়ে সরেজমিনে তদন্তের আয়োজন করতে লাগলেন। লিন্ডসে বললেন—Montajuddin is my best Police Inspector. আর দার্জিলিং থেকে খবর আনার ব্যবস্থা করলেন যে ৯ তারিখে শবদাহের দিন আবহাওয়া কেমন ছিল—বৃষ্টি হয়েছিল কিনা—তার রিপোর্ট আনতে।

সন্ন্যাসী লিন্ডসের সঙ্গে দেখা করে দাবি করেন—একটা অনুসন্ধান কমিটি

বসান, তাতেই সব জানা যাবে। আমি প্রমাণ করে দেব যে, আমিই ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়। বুদ্ধুবাবু তাঁকে জানালেন, ওয়েদার রিপোর্ট এসেছে—জানানো হয়েছে সে রাত্রে দার্জিলিং-এর আকাশ পরিষ্কার ছিল—বৃষ্টি হয়নি (পরে অবশ্য দেখা যায় আবহাওয়ার রিপোর্টে মোছামুছি করা হয়েছে।) এর প্রতিক্রিয়ায় সন্ন্যাসী ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় একঠাই প্রায় চার ঘণ্টা ধরে বসে লোকেদের নানান জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ হঠাৎ করে তিনি চেনা লোকদের নাম ধরে ডাকতেও শুরু করলেন। এমনি করে, আগেই দেখেছি এলোকেশীকেও চিনতে ভোলেননি। অবিশ্যি এলোকেশীও পরে পুলিশের ধমকের ভয়ে বলে বসেছিল—'লোকটা যোগী ছাড়া কেউ নয়।'

ছ

এর মধ্যে সত্যভামা সরকারের কাছে একটি চিঠি লিখে বসলেন। আশি বছর বয়সে একজন মহিলার এই সচেতনতা, বংশগৌরব রক্ষার প্রতি আর্তি, সত্য উদ্‌ঘাটনের আকাঙ্ক্ষা, অবশ্যই স্নেহমমতা—বাস্তবিকই তাঁকে একটা দুর্লভ মহিমা এনে দিয়েছিল। বিভাবতীকে তিনি এ কারণেই চিঠি দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে চিঠিটি ডাক পিওন 'S Nuruddin'-এর স্বাক্ষরে refused হয়ে ফিরে আসে। সব নাতবউকেই তিনি সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর বৃদ্ধাবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি সন্ন্যাসীকে, তাঁর নাতিকে ঢাকা থেকে জয়দেবপুরে এনে দেবার জন্যে ঢাকার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট (মি. লিন্ডসের পরিবর্তে) মি. জে জে ভ্রামন্ডকে অনুরোধ করেছিলেন। সাহেব অবশ্য বিনীতভাবে বৃদ্ধা রানিকে ঢাকাতে আসার অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধ মেনেই তিনি ঢাকাতে এসে জ্যোতির্ময়ীদেবীর বাড়ি ৪, আর্মেনিয়ান স্ট্রিটে ওঠেন। তিনি সে সন্ন্যাসীকে মধ্যমকুমার বলে চিনতে ভুল করেননি, সেটা প্রমাণ করার জন্যে ডাক্তারকে চোখ দেখান—তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা তাতে প্রমাণিত হয়।

বর্ধমানের মহারাজা তাঁর আগের চিঠির যে উত্তর দেন, তার আর জবাব দেওয়া হয়নি। সে কথা মনে পড়তেই তিনি মে ১৯২১ সালে পাঠানো সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করে মার্জনা চেয়ে আবার চিঠি দেন যাতে মধ্যমকুমারের পরিচয় নিয়ে তিনি তাঁর ভূমিকা পালন করেন। বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর

সরকারকে, কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ সদস্য ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কিছু করা সম্ভব নয় বলে সবিনয়ে উত্তর দেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য মি. এফ সি ফ্রেঞ্চকে পাঠিয়ে দেন। এরপর চিঠি দেন জেলাশাসককে যেসব প্রমাণের ভিত্তিতে সন্ন্যাসীকে 'জাল' বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলি তাঁকে দিতে যাতে সেগুলি তিনি ভারতের সেরা হাইকোর্টের নামজাদা নিরপেক্ষ উকিলদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে মতামত নিতে পারেন। দরকার হলে গোয়েন্দা দপ্তরের সাহায্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু জেলাশাসক তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়ে সব উদ্যোগে জল ঢেলে দেন।

তখন তিনি বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার আশুতোষ চৌধুরিকে ইংল্যান্ডে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাঁর উকিল হিসেবে নিযুক্ত করতে চান। ঘটনাচক্রে তাঁর ফিরতে ফিরতে ১৯২২ সালের নভেম্বর মাস হয়। ফেরার পর কাগজপত্র খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সময় চলে যেতে থাকে এবং সহসা আশি বছর বয়সে ১৫ ডিসেম্বর ১৯২২ সালে রানি সত্যভামাদেবী মৃত্যু হল সন্ন্যাসীর কাছেই। রাত তখন এগারোটা। সমস্যা দেখা দিল সত্যভামাদেবীর দেহ কোথায় দাহ করা হবে, ঢাকা না জয়দেবপুরে। রেল স্টেশনমাস্টার বললেন ঘণ্টা চারেকের আগে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা যাবে না। তাহলে তো রাত কাবার হয়ে মড়া 'বাসি' হয়ে যাবে। তখন জনৈক আত্মীয় ঢাকার নবাবের শাহবাগ প্রাসাদের মাইলখানেক উত্তর-পূর্বে খিলগাঁও-এর কাছে একখণ্ড জমির ব্যবস্থা করে দিলে সেখানেই মহামান্যা রানি সত্যভামার দাহকর্ম হল—শব বহন করে নিয়ে গেলেন আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সন্ন্যাসীও। তিনিই মুখাগ্নি করলেন—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের দুই কন্যা জোতির্ময়ী ও তড়িন্ময়ী তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে হাজির থাকলেন। আত্মীয়স্বজন ধানকোড়ার জমিদার হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি (ইনি সন্ন্যাসীকে মেজকুমার বলেই ঘোষণা করেছিলেন)। সমেত অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও উপস্থিত থাকলেন। ঢাকা নবাবপুরে বাণী স্টুডিওর ফটোগ্রাফার কে এ ভট্টাচার্য ১৬ ডিসেম্বর সকাল ৮টা নাগাদ এসে ছবি তুললেন। নানা গোলযোগে সে ছবি কোথায় যে হারিয়ে গেল। ২৫ ডিসেম্বর ১৯২২, এগারো দিন পর শ্রাদ্ধকর্ম অনুষ্ঠিত হল—প্রজারা, ব্রাহ্মণসভার প্রতিনিধি ও বহুলোক উপস্থিত থাকলেন। সন্ন্যাসী মেজকুমারের অধিকারে 'শ্রাদ্ধকর্ম করছেন—এমন ছবিও তোলা হয়। কিন্তু মজার কথা, আনন্দকুমারী না এসেছিলেন দিদিশাশুড়িকে একদিন দেখতে, না এলেন তাঁর

শ্রাদ্ধের কাজে। অবিশ্যি সত্যভামার মৃত্যুর তিন দিন পর আনন্দকুমারীর দত্তকপুত্র রামনারায়ণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে বেশ কিছু লোকজনকে খাইয়েছিলেন। সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এই শ্রাদ্ধ নিয়ে পুস্তিকা লিখলেন—'রানী সত্যভামা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ ও ভাওয়ালের মধ্যমকুমার।'

জ

গুরু ধরমদাস চলে গেছেন, সত্যভামাদেবীও মারা গেছেন। এবারে সাধু ঠিক করলেন তিনি কলকাতা যাবেন। জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে তিনি কলকাতা চলে এসে তাঁর ৮৬ হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি রোডের বোস পার্কের বাড়িতে চলে এলেন। সেটা ১৯২৪ সালের আগস্ট মাস। এই কালের মধ্যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে না দেখা হয়েছে বিভাবতীর, না হয়েছে সরযূবালার। তাই যেদিন পৌঁছলেন সেদিনই আগে খবর দিয়ে পরে সরযূবালার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বুদ্ধু আর দু-একজনকে নিয়ে। ভিতরের ঘরে যেতেই একটু নজর করে দেখে বড় রানি বলে উঠলেন— 'তাহলে তুমি এলে। সত্যিই তুমি এসেছ? তুমি তো আমাদের হারানো মানিক।'

সন্ন্যাসী—তুমি খুব বেশি বদলে যাওনি।

সরযূ—তুমি অনেক বদলেছ, মোটা হয়েছ, স্বাস্থ্যও ভালো হয়েছে। বিভা তোমার সঙ্গে দেখা করেনি?

না, আমি তো সবে ঢাকা থেকে এখানে এসেছি।

আমি সব খবর রাখি ঠাকুরপো, ঘরে থেকেই রাখি।

মেয়রের সঙ্গে দেখা করেছ? (সে তো চাকর), আনন্দকুমারীর সঙ্গে? না?

ঠিক করেছ, দত্তক নেওয়াটা আমার ভালো লাগেনি। বিভা করেছিল অবশ্য।

এদিকে জ্যোতির্ময়ীদেবী ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ তারিখে বোর্ড অফ রেভেনিউয়ের সেক্রেটারিকে একটি লম্বা চিঠি দিয়ে প্রয়াত রানি সত্যভামাদেবীর জেলাশাসককে লেখা চিঠি, তার উত্তর, বর্ধমানের মহারাজার সঙ্গে সত্যভামার চিঠিপত্রের আদানপ্রদান, সন্ন্যাসীকে জাল ঘোষণা করা ইত্যাদি পূর্ব প্রসঙ্গের

উল্লেখ করে ভাইবোনেদের মধ্যে জীবিত জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে কি প্রমাণের ভিত্তিতে সন্ন্যাসীকে জাল ঘোষণা করা হয়, তার প্রমাণিত কপি পেতে চান। ১৫ মার্চ তার উত্তর এল—'অনুরোধ রক্ষা করা গেল না।' অনেক পরে ১৯২৬ সালের ৮ ডিসেম্বর সন্ন্যাসী নিজে বোর্ড অফ রেভেনিউ-এর কাছে দাবি করলেন তাঁর পরিচয় জানার জন্য তদন্ত করা হোক। বোর্ড সেই দাবি যথারীতি অগ্রাহ্য করলেন। সত্যিই তো একজন 'জাল প্রতারক' এমন দাবি করতে পারেন কোন্ মুখে? বোর্ডের মেম্বার কে. সি. দে-ই একদিন জ্যোতির্ময়ীদেবীর পুত্র চন্দ্রশেখর ব্যানার্জিকে ডেকে বলেছিলেন—সন্ন্যাসী নিজে আবেদন না করলে কিছু হবে না। এখন তিনিই বলে বেড়াতে লাগলেন—সন্ন্যাসী লোকটা একটা ধোঁকাবাজ ছাড়া কিছুই নয়।

এই সবের মাঝে একদিন বিভাবতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সন্ন্যাসীর। ১৯ ল্যান্স ডাউন রোডের (এখনকার শরৎ বোস রোড) গাড়িবারান্দার পাশে কৃষ্ণচূড়ার গাছ, তার গা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন বিভাবতী—সাদা থান পরা সেই স্পর্ধিত বিধুরা। আর ওই গাড়িবারান্দার সামনে দিয়ে একটা ফিটনে চড়ে বুদ্ধুকে পাশে নিয়ে যাচ্ছিলেন সন্ন্যাসীপ্রবর। ফিটনটা ১৯ নং-এর সামনে যেতেই বুদ্ধু আঙুল তুলে সন্ন্যাসীকে বললেন—ওই তো মেজমামিমা। বিভাবতীও ততক্ষণে চোখ রেখেছেন ফিটনের সওয়ারিদের উপর। সন্ন্যাসী দেখলেন—বিভাবতীর চোখে অপার বিস্ময়।

পরে আদালতে বিভাবতীও সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে এ কথা স্বীকার করে বলেন—'বুঝলাম লম্বা চুলওয়ালা ওই লোকটাই।' পরে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে উভয়ের—ল্যান্সডাউন রোড তো বটেই, দেখেছেন ইডেন গার্ডেনের সামনে, স্ট্র্যান্ড রোডে গঙ্গার পাশে, একবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে। কিন্তু প্রতিবারেই বিভাবতী বিমুখ। সিঁটিয়ে যান তাঁকে দেখে। অথচ সন্ন্যাসী তাকিয়ে থাকেন গভীর আগ্রহে। মাত্র ৪ ফুট দূর থেকেও বিভা সাড়া দিলে না। চিনতে যে পেরেছেন, তা দেখে বোঝাটি পর্যন্ত গেল না। ভেবেছিলেন দেখা সাক্ষাতে হয়তো বিভার ভাবান্তর হতে পারে, হায় সন্ন্যাসী, তুমি যে মূর্খের স্বর্গে বাস করছ। তাই সরকারের কাছে আবেদন করে সন্ন্যাসী যাতে ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে যাতায়াত করতে না পারে তার ফতোয়া জরি করে বসেন। থানার বড়োবাবু তাঁকে কড়া ধমক দেন।

দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল সন্ন্যাসীর নিজেকে মেজকুমার বলে ঘোষণা করার পর। না পেলেন বিভার সমর্থন, না পেলেন আইন সমর্থন। শুধু কিছু মানুষ তাঁর পাশে। কেউ কেউ পুস্তিকা ছাপিয়ে তাঁকে নৈতিক সমর্থন দিচ্ছেন।

মৌলভি মোহম্মদ ফজলুল হক ও শ্রী সুলতান কবিরাজ—দুজনে মিলে প্রকাশ করেছেন ২৮ পৃষ্ঠার ছ-পয়সা দামের পুস্তিকা 'ভাওয়াল কুমার রহস্য'। তাতে ভাওয়ালের ইতিহাস সংক্ষেপে জানিয়ে সন্ন্যাসীর হাতি চড়ে সভায় আগমন, ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল সারদাবাবুর সন্ন্যাসীকে জয়দেবপুরে গিয়ে দেখে 'মেজকুমার' বলে চেনা, জগৎকিশোর আচার্যচৌধুরি, শশিকান্ত আচার্যচৌধুরির ওই একই মত প্রকাশ, এমনকি মুকুন্দ গুণ যে বলেন, তিনি শবদাহ হতে দেখেননি 'বীরেন্দ্র বারুয্যেকে মুখ আগুন করিতে দেখিয়া শ্মশান হইতে চলিয়া আসেন' এমন তথ্যও দিয়েছেন। এ ছাড়া ১৩২৮-এর ৭ মাঘ কালীগঞ্জ সোমক হাটে যে বিরাট সভা হয়, যাতে সভাপতিত্ব করেন এড়ুইন ফ্রেজার, সেখানে 'সন্ন্যাসীই ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার' এই ঘোষণা বলবৎ করা হয়। সভা 'Imposter' কথাটির জন্য 'মর্মান্তিক দুঃখ অনুভব করিতেছে'—তাও প্রস্তাবে লেখা হয়।

'ভাওয়ালী কাণ্ড' পুস্তিকা ছাপিয়ে কেদারনাথ চক্রবর্তী ১৩২৮ সালে তা বিনামূল্যে প্রচার করেন। এমনকী ডাকযোগে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেন—এই সব অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। কুমারের মৃত্যুর পর তাঁর বড়ো ও ছোটো সহোদরেরা 'দশাই' করে শ্রাদ্ধ করেন—অথচ কিছু লোক সন্ন্যাসীকে কুমার বলে চালাতে চাইছে—কেদারবাবু তার প্রতিবাদ করেন। এই একটি ভদ্রলোকেরই তাতে যত গায়ের জ্বালা ধরেছিল।

সবচেয়ে বেশি পুস্তিকা লিখেছিলেন সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আর নগেন্দ্রকুমার চন্দ্র। এর মধ্যে একটা দুটো ব্যাপার ঘটেছিল। ১৮ এপ্রিল ১৯২১ তারিখে কোর্ট অফ ওয়ার্ডস ঢাকার প্রথম সাবঅর্ডিনেট জজের আদালতে একটি মামলা করেন। এর বাদীরা ছিলেন সরযূবালা, বিভাবতী, রামনারায়ণ রায় এবং আনন্দকুমারী এবং প্রতিবাদী ছিলেন সন্ন্যাসী, শ্রীপুর থানার জনৈক মাসুম আলির সঙ্গে। এই মামলায় প্রতিবাদী রমেন্দ্রনারায়ণ রায় যে মৃত তা স্বীকার

করতে অস্বীকার করেন। (মামলার নং ৭১/১৯২১)-এবং বলেন যে তিনি তো বহাল তবিয়তে ঢাকাতেই রয়েছেন। এমনি আরও ৯টি অনুরূপ মামলা দায়ের করা হয়েছিল, কিন্তু সবাইকে চাপ দিয়ে মামলা প্রত্যাহার করানো হয়েছিল।

আর একটি মামলা করেছিলেন আমাদের পরিচিত ডাক্তারবাবু, ডা. আশুতোষ দাশগুপ্ত। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২১ তারিখে তিনি একটি মানহানির মামলা করেন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র রায় এবং রামলাল শীলের বিরুদ্ধে। পূর্ণবাবুর অপরাধ হয়েছিল তিনি সন্ন্যাসীর দাবির পক্ষে 'ফকির বেশে প্রাণের রাজা' নামে কবিতায় লেখা একটি পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন ১৯২১ সালেই। এর ৫ পৃষ্ঠায় ছিল এই কবিতাংশটি :

কুমার অজ্ঞান দেখে সবার আনন্দ অপার।
তাড়াতাড়ি নিয়ে গেল করিতে সৎকার।।

কাজে কাজেই আশুবাবু পূর্ণবাবুর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালতে এক মানহানির মামলা দায়ের করেন। এমনিতেই লোকে তাঁকে দুষছিল, সেজন্যে, তিনি বড়ো রানির ভাই শৈলেন্দ্র মতিলালকে ৫ মে ১৯২১ তারিখে চিঠি লিখে, তিনি যে অতিকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন, তা জানিয়েছিলেন। তার উপরে এখানে প্রত্যক্ষ অভিযোগ—তিনিই ওষুধ দিয়ে কুমারকে অজ্ঞান করে দেন। তাই এই মামলা। ভাওয়ালের একদা ম্যানেজার ও বিতাড়িত কালীপ্রসন্ন ঘোষের ছেলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সারদাপ্রসাদ ঘোষ বিচারে পূর্ণচন্দ্রকে তিন মাসের কারাবাসের আদেশ দেন। পূর্ণচন্দ্র এর বিরুদ্ধে আপিল করলেন। প্রেসক্রিপসন, ডেথ সার্টিফিকেট, সাক্ষ্য ইত্যাদি চলল। বিচারক বীরেন্দ্রমোহন ঘোষ রায় দিলেন—পূর্ণচন্দ্র সরল বিশ্বাসে পুস্তিকাটি লিখেছেন, অতএব মানহানির অভিযোগ থেকে তাকে মুক্তি দেন।

লেকিন কমলি নেহি ছোড়েগি...সরকার উচ্চ আদালতে এই নিম্ন আদালতের বিরুদ্ধে আপিল করলেন। তাদের যে আঁতে লেগেছে। সরকারপক্ষ লড়ছেন অ্যাডভোকেট জেনারেল বি. এল. মিত্র এবং পূর্ণবাবুর পক্ষে হাইকোর্টের নামকরা ব্যারিস্টার জন ল্যাংফোর্ড জেমস। এবারের রায়ে পূর্ণবাবুর এক মাসের বিনা শ্রম কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা হল।

এই ব্যাপারটা নিয়েই সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৯২২ সালে ঢাকা থেকে

ছেপে বের করলেন 'ডাক্তার আশুতোষ দাশগুপ্তর জেরা ও ভাওয়াল রাজকাহিনী'। এর পরে পরেই ছেপে বের করলেন 'দ্বিতীয়কুমারের মৃত্যু রহস্য ও ভাওয়াল রাজকাহিনী' ১৯২২ সালেই ভাওয়াল রাজ পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উল্লেখ করে মেজকুমারের রহস্যজনক মৃত্যুর কথা বিবৃত করে। আশুতোষ দাশগুপ্তকে নিয়ে তিনি আবার একটি পুস্তিকা প্রচার করেন পরের বছর ১৯২৩ সালে 'ভাওয়াল মানহানির রায়' নামে। আগেরটিতে মামলার শেষ রায়ের খবর ছিল না, এটিতে তা দিয়েছেন। কিন্তু 'ভাওয়াল রাজরহস্য' নামে পাঁচ পয়সা (পরে চার পয়সা) দামের ১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকাতে তিনি দার্জিলিং-এ স্টেপ এসাইড বাড়ির মালিকের প্রতিনিধি সুব্বা রামসিং-এর এজাহারের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং তাঁকে কুমারকে দেখতে না দেওয়া, চাকর দিকে তাঁকে ২০ মন 'লাক্‌ড়ী' কিনতে বলেও লকড়িওয়ালার কাছে তাঁর আগেই কে ২০ মণ লক্‌ড়ি কিনে নিয়ে গেছে—সেই সত্য প্রকাশ করা; কে আগেই কেরোসিন নিয়ে গিয়েছিল সেই সত্য উদ্‌ঘাটন করা; মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় কাপড় সরে যাওয়ায় শবদেহে 'আঘাতজনিত কতকগুলি কালো দাগ' দেখতে পাওয়ার কথা' বলে রহস্য যে কত ঘনীভূত তা জানিয়েছেন। লেখক নিজে ঢাকাতে গিয়ে বাকল্যান্ড বাঁধে সন্ন্যাসী দেখতে গিয়ে বুঝতে পারেন যে, এই 'সন্ন্যাসী' ঢাকার ভাওয়াল পরগনার কুমার হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন এবং ইনিই ভাওয়ালের দ্বিতীয়কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি' বলে পুস্তিকায় ঘোষণা করেছেন। তিনি পূর্ণচন্দ্র ঘোষের পুস্তিকার আরও কয়েকটি লাইন তুলে দিয়ে জানিয়েছেন যে এই পূর্ণবাবু সম্ভবত আশু ডাক্তারের সহপাঠী ছিলেন।

অন্য একটি পুস্তিকা আমি দেখেছি 'ভাওয়ালের কথা ও নবীন সন্ন্যাসী' নামে। এটি জনৈক দীনেশচন্দ্র দে কর্তৃক সংকলিত। ইনি বেশ মজার কয়েকটি তথ্য দিয়েছেন। যেমন (১) মৃতদেহ নেই দেখেও চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়—যেন মৃতদেহ দাহ করা হয়েছে, (২) সন্ন্যাসী নাকি বাকল্যান্ড ব্রিজে থাকার তিন-চার বছর আগেও ঢাকাতে আসেন, কেউ তাকে তখন চিনতে পারেননি। ঢাকাতে তাঁর ছবিও তোলা হয়, সেই ছবি থেকেই প্রমাণ হয়। তিনি এসেছিলেন ইত্যাদি। নগেন্দ্রকুমার চন্দ্র সংকলিত ও প্রকাশিত (৪২ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা) চার পয়সা দামের পুস্তিকা 'ভাওয়ালের সন্ন্যাসী/টাটকা খবর'-এ লেখা হয়েছে—'শুনা যায়, মধ্যমকুমার Bengal Landholders Association-এর অন্যতম সভ্য মনোনীত হয়েছেন।'

আরও কত কত কবি যে এ সময়ে ভাওয়াল-কাণ্ড নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। সেই সব সস্তা প্রচার পুস্তিকাব কিছু কিছু কবিতা আমরা তুলে দিচ্ছি—সে সময়ের ইতিহাস, বিতর্ক এবং মনোভাবটুকু ঠিক ঠিক বুঝে ওঠার জন্যে :

মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারতভূমে কালক্রমে
কত লীলা হয়।
মা তোর পূর্ববঙ্গ রঙ্গস্থল, অমঙ্গল সুমঙ্গল
হতেছে কত লীলার অভিনয়।
(মাগো) শুনলেম অতি প্রিয় পুত্র তোমার
জয়দেবপুরের মধ্যমকুমার
মরেছিল দার্জিলিং পাহাড়ে,
সৎলোকে শ্মশানঘাটে এল সৎকার করে
শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেল,
আবার মরা মানুষ ফিরে এল
বার বৎসর পরে।

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অপূর্ব অনুকরণে:

হায়, বিভাবতি!
কি কুক্ষণে দেখেছিলি,
তুইলো অভাগী,
সে কাল জয়দেবপুরে, কালকূট দিতে
তার মুখে,—নিয়ে কোন্ সুদূর পাহাড়ে
কিম্বা,—সমুদ্রের পারে?
কানে কানে পরামর্শ দিয়েছিলে মোরে
(আশু তার হইল সহায়।)
মজালে ভাওয়াল রাজ্য মজিলি আপনি।

চার

১৯২৯ সালের অক্টোবরে মাসে সন্ন্যাসী কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরলেন। ঢাকা থেকেই তিনি খাজনাপত্তর আদায় করতে লাগলেন এবং অধিকাংশ প্রজাই তাঁকে সানন্দে খাজনা দিলেন। এর আগেই সে বছরের এপ্রিল মাসে তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয় ১৪৪ ধারা মোতাবেক যে-সন্ন্যাসী যেন কোনওভাবেই জয়দেবপুর পুলিশ চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ না করেন। পরে অবশ্য জেলাশাসকের ৩০মে তারিখের আদেশে এই আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। আর তো 'সন্ন্যাসী কুমার' অপেক্ষা করতে পারেন না। তিনি ঠিক করলেন তার পরিচয়ের স্বীকৃতি এবং সম্পত্তির অধিকার আদায়ের জন্যে তিনি মামলা করবেন। এবং করলেনই তাই। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ঢাকার এডিশনাল জজের আদালতে রুজু করলেন এক ঐতিহাসিক স্মরণযোগ্য মামলা।

যাঁরা পুরনো মামলার খোঁজখবর রাখেন, তাঁদের হয়তো দেশ-বিদেশের অন্তত গুটি চারেক এহেন মামলার কথা মনে পড়ে যেতে পারে। বর্ধমানের রাজপরিবারে এমন একটা কাণ্ড ঘটেছিল—সেখানেও এক খোদ রাজকুমারকে 'জাল' বানানো হয়েছিল এবং এটি 'জাল প্রতাপচাঁদের' মামলা নামেই খ্যাত। বঙ্কিমচন্দ্র-সহোদর সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তো 'জাল প্রতাপচাঁদ' নামে একটা উপন্যাসই লিখে বসেছিলেন। মেদিনীপুরের রাজপরিবারের রুদ্রনারায়ণ রায়ের মামলার কথা কেউ কেউ জানেন হয়তো। তবে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর-মিরাট অঞ্চলের লনধৌরার রঘুবীর সিংহকে বিষ খাওয়ানোর মামলার সঙ্গেও ভাওয়াল মামলার চরিত্রগত মিল আছে বইকি? খুব মিল আছে হ্যাম্পশায়ারের রজার টিকবোর্নের মামলার সঙ্গেও। আমার পাঠকবর্গ এই ফাঁকে আরও একটা উপন্যাসের কথা ভাববেন কী? কথাকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ' উপন্যাসটি? জাল প্রতাপচাঁদ না ভাওয়াল সন্ন্যাসী—কার সঙ্গে যে এর মিল!

সে যাকগে... মামলা দায়ের হল বটে, কিন্তু শুনানির দিন আর পড়ে না।

দুই পক্ষে বাঘা বাঘা সব উকিল ব্যারিস্টার। সন্ন্যাসীর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন ব্যারিস্টার বি সি চ্যাটার্জি—গোটা নাম বিজয়চাঁদ চ্যাটার্জি—বাঘা রাজনীতিক সুরেন বাঁড়ুজ্যের জামাই। ব্যারিস্টার হয়ে লন্ডন থেকে ফিরে এলেন ১৯০৫ সালে—এসেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু নেতাদের পেজেমি দেখে ঘেন্নায় সরে এসে নিজের বৃত্তিতে ফিরে এসেছিলেন—যদিও আরও পরে আবার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বিবাদীর পক্ষের উকিলও নামকরা ব্যারিস্টার এ এন চৌধুরি—অমিয়নাথ চৌধুরি। তিনিও আর এক নেতা স্যার ডব্লু সি ব্যানার্জির মেয়ে মিল্লিকে বিয়ে করছিলেন। সরকারি পক্ষের উকিল শশাঙ্ককুমার ঘোষ—বিবাদীর পক্ষে কাগজপত্র তৈরি করে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু আদালতে মামলা আর ওঠে না। জজসাহেব পান্নালালবাবুর আদালতে মামলা। তিনি এক সময় কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ আর দিল্লির স্টিফেন কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮১ সালে তাঁর জন্ম। ১৯১০ সালে মুনসেফের পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ঢাকায় থাকেন ১৯২৪ থেকে ১৯২৬-এর শেষ অবধি। ১৯৩২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সাবজজের পদে উন্নীত হন। ১৯৩৩-এর ১১ মার্চ পুনর্বার ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন। ১৯৩২-এ অতিরিক্ত জিলা ও দায়রা জজের পদে উন্নীত হন। শেষে অস্থায়ী জজ হন। কলকাতার আমহার্স্ট রোডে তাঁর বাড়ি ছিল। একটা বাড়তি খবর এ কালের পাঠকদের দিয়ে রাখি! তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি ইংরেজি অনুবাদ করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন স্বয়ং কবির।

পাঠক-পাঠিকাবর্গ, আমাকে মাপ করবেন আপনারা—যদিও আমার কাগজপত্রে দুই পক্ষের উকিল, সরকারি কর্মচারীদের নামের তালিকা রয়েছে, তবু সবার নাম আমি দিতে পারছি না আপনাদের ললাটকুঞ্চনের ভয়ে। এমনকী বাদী-বিবাদী পক্ষে যে ১৫৪৮ জন নারী পুরুষ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন—তার তালিকাও দিতে পারতাম। শুধু বাদীর পক্ষের সাক্ষীর সংখ্যা ছিল ১০৬৯ জন। কিন্তু সেই একই ভয়ে বিরত থাকলাম। প্রকাশ্য আদালতে শুনানি শুরু হয়েছিল ২৭ নভেম্বর ১৯৩৩ থেকে চলেছিল ২১ মে ১৯৩৬ সাল অবধি। আড়াই বছর ধরে চলা মামলার বিবরণ দেওয়াও কষ্টকর। এই কষ্টটাই অবশ্য করতে হয়েছিল পান্নালালবাবুকে। তিনি যে রায় দেন তার পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল টাইপ করা ফুলস্ক্যাপ কাগজের ৫৩২ পৃষ্ঠা—খুব গায়ে গায়ে করা টাইপ। সব সাক্ষীই

যে আদালতে এসেছিলেন, তা নয়। যেমন ডাক্তার ক্যালভার্ট চাকরি থেকে অবসরের পর লন্ডনে ছিলেন—কমিশন সেখানে গিয়েই তাঁর সাক্ষ্য নেয়। সরযূবালাদেবী বলেছিলেন—ঢাকাতে আসতে পারবেন না। তাই তার সাক্ষ্য নেওয়া হয় কলকাতাতেই। আর নার্স দিয়ে ডেকে পাঠিয়েও কুমারের মৃত্যু হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে যিনি স্টেপ অ্যাসাইড বাড়িতে ৯ তারিখে ভোর ৬টায় এসে হাজির হলেও 'ব্রাহ্ম' অপবাদ দিয়ে যাঁকে মৃতদেহ ছুঁতে দেওয়া হয়নি, সেই ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয় কলকাতাতেই। কতগুলো এক্সিবিট (প্রমাণসমূহ) প্রদর্শিত হয়েছিল জানেন?—তা কমসে-কম দু-হাজার হবে। আর কার না সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল—মনোবিদ থেকে হস্তশিল্প বিশারদ, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলির মতো শিল্পী থেকে গণিকা—হিসেব রাখাই দায়। কিন্তু কাহিনি পড়বার একটা টান টান উত্তেজনা তো থাকেই। যেমন উত্তেজিত হয়েছিলেন সেকালের লোকজনেরা সন্ন্যাসী বাঁধে আশ্রয় নেবার পর থেকেই। স্বভাব কবিরা তো নিত্যনতুন ছড়া কেটে ব্যাপারটাকে বেশ জিইয়ে রেখেছিলেন নিত্য :

ভাওয়ালেতে ছুটল হাসি সাত সাগরের বান,
হাজার হাজার প্রজার মুখে হাসির কত গান।
চাপা হাসি মুচকি হাসি বিকট অট্টহাসি,
গোমড়া মুখে পোড়ার হাসি দেখতে ভালবাসি।
আজ ভাওয়ালের ঘরে ঘরে হাসির তুফান বয়,
রানীর সঙ্গে সাধুবাবার বিবাদ মন্দ নয়!

—নগেন্দ্রনাথ দাস

মামলা শুরু হতে দেরি হল, কারণ জজসাহেব যেসব কাগজপত্র সরকারের কাছে চাইছিলেন (যেমন চেয়েছিলেন সত্যভামাদেবী, জ্যোতির্ময়ীদেবী বা সন্ন্যাসী স্বয়ং) তা দিতে সরকারের প্রবল আপত্তি। এমনকি তাঁরা দিতে পারবেন না, এমন কথাও বলেন। কিন্তু পান্নাবাবু দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। আবার, এই মামলায় বলা হয়েছিল এমন বহু কথাই বলে এসেছি। সব কথা অবিশ্যি এখানে বলে ওঠা যাবে না। এরই মধ্যে বাদী যে আত্মকথা দেন—তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল (পরিশিষ্ট দেখুন)—সেটা খুব দাগ কেটেছিল জজসাহেবের মনে। সন্ন্যাসীর আত্মকথা শেষ করে যেই চেয়ারে

বসেছিলেন, তখনই একটা শোরগোল উঠে পড়েছিল আদালত কক্ষে। জজসাহেব পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে কোনওক্রমে অবস্থা সামলে ছিলেন। ঢাকা ও আশপাশের বহু লোক কাজকর্ম লাটে উঠিয়ে এই সব এজাহার শুনতে আসতেন। বিভাবতীর সাক্ষ্য দেবার দিন তো ভিড়ে ভিড়ে একাকার।

এইবার আমরা সন্ন্যাসী যে মামলা রুজু করেছিলেন তার ঠিক ঠিক বয়ানটি আপনাদের তুলে দিই। একটু ক্লান্তিকর মনে হবে। কিন্তু কেউ কেউ এটা জানতে কৌতূহলী থাকতে পারেন।

জিলা ঢাকার প্রথম সাবজজ আদালত

দেঃ নং ৭০/১৯৩০

কুমার শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ রায় পিতা। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় সাং জয়দেবপুর থানা জয়দেবপুর জিলা ঢাকা হাং সাং ৪নং আরমানি টোলা থানা সুত্রাপুর ঢাকা ঃ বাদী

বনামে

১। রাজানুপালিতা শ্রীমতী বিভাবতী দেবী পক্ষে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের ম্যানেজার মি. E. Bignold, সাং জয়দেবপুর থানা জয়দেবপুর জিলা ঢাকা ঃ মূল প্রতিবাদিনী—

রাজানুপালিতা ২। শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবী। ৩। নাবালক রাম নারায়ণ রায় পক্ষে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের ম্যানেজার মিঃ E. Bignold. ৪। শ্রীমতী আনন্দকুমারী দেবী পতি স্বর্গীয় রবীন্দ্রনারায়ণ রায় সাং জয়দেবপুর থানা জয়দেবপুর জিলা ঢাকা.

মোকাবিলা বিবাদীগণ—

Declaratory ডিক্রি ও দখল স্থিরতরের বা দখল পাইবার এবং মূল প্রতিবাদীর ওপর চিরস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা পাইবার প্রার্থনায় ডিক্লেটারি ডিগ্রী চিরস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা পাইবার তায়দাদ ১০৫০০০৲ টাকা ও দখল স্থিরতরের বা দখলের বিষয়ীভূত সম্পত্তির মূল্য মঃ ১৪২০০০৲ টাকা একুনে তায়দাদ মোট ২৫২৫০০৲ টাকা। উপরিউক্ত বাদী নিম্নলিখিত বর্ণনা করিতেছে।

১। জিলা ঢাকা এবং ময়মনসিংহ প্রভৃতির অন্তর্গত পরগানে ভাওয়াল ও

অন্যান্য পরগনা মধ্যে যে সমস্ত মৌজা আছে এবং যাহা সাধারণে ভাওয়াল রাজ্য বলিয়া অভিহিত করে উক্ত সম্পত্তি বাদী এবং তাহার পূর্বপুরুষগণের জমিদারী পত্তনি ইত্যাদি স্বত্ব দখলীয় হইতেছে। বাদীর পিতা স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় উক্ত সম্পত্তির মালিক দখলীকার থাকাকালে তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার দেহান্তে বন্দোবস্তর জন্য তাঁহার পত্নী রানি বিলাসমণি দেবীকে ট্রাস্টি নিযুক্ত করিয়া যান। রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়, বাদী কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায় উক্ত ভাওয়াল রাজ্যে সম-অংশে স্বত্ববান ও দখলীকার হয়েন। দাবীকৃত সম্পত্তির পরিচয় নিম্ন তপশিলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

২। গত ১৯০৯ সনের এপ্রিল মাসে বাদী তাঁহার পত্নী ১নং বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী এবং কতিপয় আত্মীয় ও কর্মচারী সহযোগে দার্জিলিং শৈলাবাসে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গমন করেন। দার্জিলিং-এ অবস্থানকালে বাদীর শরীর অসুস্থ হইলে বাদীর চিকিৎসাকালে বিষ প্রয়োগ নিবন্ধন বাদী অচেতন হইলে বাদীকে মৃত জ্ঞানে ১৯০৯ সালের ৮ মে তারিখে রাত্রিকালে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। শ্মশানে লইয়া যাওয়ার পর অতিরিক্ত ঝড় বৃষ্টি হইলে বাদীর দেহ-বাহকগণ শ্মশানে বাদীর দেহ রাখিয়া স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে ফিরিয়া আসিয়া বাদীর মৃতদেহ শ্মশানে না পাইয়া ফিরিয়া চলিয়া যান। ওই ঘটনার কয়েক দিবস পরে বাদী চৈতন্যলাভ করিয়া তিনি আপনাকে নাগা সন্ন্যাসীগণের মধ্যে দেখিতে পান। এবং সন্ন্যাসীগণের সেবা ও শুশ্রূষাতে বাদী কতক পরিমাণে সুস্থ হইলে উক্ত সন্ন্যাসিগণের সহিত বাস করিতে থাকেন। তৎকালে বিষ প্রয়োগের ফলে বাদীর পূর্ব-স্মৃতি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসীদের সহিত তাহাদের দলভুক্তের ন্যায় দেশবিদেশ ভ্রমণ করিতে থাকেন। বাদী সন্ন্যাসী-জীবনে অভ্যস্ত হইয়া সংসারে বিতৃষ্ণ হন।

৩। বাদীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বাদী মৃত উল্লেখে বাদীর পত্নী ১নং বিবাদিনী শ্রীমতী বিভাবতী দেবী হিন্দু আইনের বিধান অনুসারে বাদীর অংশের জমিদারী প্রভৃতি ভোগ করিতে থাকেন। বাদী বর্ণনা করেন যে ১নং বিবাদিনীর উক্তরূপ ভোগ বাদীর দখল বলিয়া পরিগণিত হইবে। পরে ১৯১১ সালের ২৮শে এপ্রিল তারিখে ১নং বিবাদিনীকে disqualified proprietress declare করিয়া বাদীর অংশ court of wards charge লয়েন।

৪। গত ১৯২১ সালের প্রথম ভাগে বাদী উপরোক্তরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে ঢাকা শহরে আসিয়া সন্ন্যাসী বেশে Buckland বাঁধে অবস্থান করিতে থাকেন। তথায় অবস্থানকালে বাদীকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিয়া অনেকে চিনিতে পারেন ও অনেকে অনুমান করেন, এবং পরে বাদীর আত্মীয়স্বজন এবং স্থানীয় জমিদারগণ বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া নিশ্চিত জানিয়া বাদীকে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিতে বলেন। তদনুসারে বাদী নিজ পরিচয় প্রকাশ করেন এবং আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার প্রবৃত্তি লওয়ান এবং উক্ত ভাওয়াল রাজ্যের প্রজাগণ বাদীকে মধ্যমকুমার স্বীকার করিয়া খাজনা ও নজর দিতে থাকেন। তৎপরে ১৯২১ সালের ১৬ মে জয়দেবপুরে এক বিরাট সভা হয় এবং বাদীর আত্মীয় ও প্রজাগণ বাদীকে মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রজাগণ তাঁহাকে নজর ও খাজনা পূর্বানুরূপ সাধারণ ও প্রকাশ্যভাবে প্রদান করিতে থাকেন। এইরূপে বাদী আপন অংশের খাজনা ও নজর আদায় করিতে থাকিলে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের খাজনা আদায় সম্বন্ধে বাধা ও বিঘ্ন হওয়ায় ১নং বিবাদিনীর এবং তাহার ভ্রাতার ষড়যন্ত্রে ও প্ররোচনায় ঢাকার তৎকালীন কালেক্টার Mr. Lindsay গত ১৯২১ সালের ৩ জুন তারিখে এক declaration নিম্নলিখিত মর্মে প্রচার করেন।

নোটিশ

এতদ্দ্বারা ভাওয়াল স্টেটের সমস্ত প্রজাবর্গকে জানানো যাইতেছে যে, রেভিনিউ বোর্ড সিদ্ধান্ত প্রমাণ (conclusive proof) পাইয়াছেন যে ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমারে মৃতদেহ ১২ বৎসর পূর্বে দার্জিলিং শহরে ভস্মসাৎ হইয়াছিল। সুতরাং যে সাধু দ্বিতীয় কুমার বলিয়া পরিচয় দিতেছে সে প্রতারক, যে কেহ তাহাকে খাজনা এবং চাঁদা দিবেন তিনি তাঁহার নিজের ঝুঁকিতে দিবেন।

বোর্ড অব রেভিনিউর অনুমত্যনুসারে
জে এইচ লিন্ডসে কালেক্টর
ঢাকা ৩/৬/২১

বাদী বর্ণনা করেন যে (বোর্ডের নিম্নলিখিত resolution-এর স্বীকৃত মতেই) বাদীর identity সম্বন্ধে পূর্বে কোনো তদন্ত না হওয়ায় ও তদ্রূপ তদন্ত বা সাক্ষী প্রমাণ লওয়া বোর্ডের কোনোরূপ ক্ষমতা না থাকায় উক্ত declaration অমূলক এবং ভিত্তিশূন্য ultravires বটে।

৫। উপরিউক্ত declaration বাদীর অসাক্ষাতে হওয়ায় বাদী মহামান্য বোর্ডে গত ১৯২৬ সালে ৮ ডিসেম্বর তারিখে এক memorial দাখিল করেন। উক্ত memorial ১৯২৭ সালে ৫৪ নম্বরে রেজিস্টারীভুক্ত হইয়া বাদীর পক্ষে এবং বিবাদিগণের পক্ষের বক্তৃতার পর গত ১৯২৭ সালের ৩০ মার্চ তারিখের মহামান্য বোর্ডের resolution নম্বর ৩৭১৫w অনুসারে বাদীর memorial অগ্রাহ্য হয়। উক্ত resolution-এ প্রজা সাধারণের নিকট বাদীর খাজনা এবং নজর আদায় স্বীকার আছে এবং মহামান্য বোর্ড আরও স্বীকার করিয়াছেন যে বাদীর ... সম্বন্ধে তাঁহারা কোনো তদন্ত করেন নাই। কিংবা তদরূপ বা কোনোরূপ তদন্ত করিবার কি সাক্ষী-সাবুদ লইবার কোনো ক্ষমতা নেই।

৬। বাদী আপন অংশের সম্পত্তি হইতে প্রজাগণের নিকট খাজনা ও নজর আদায় করিতে থাকিলে গত ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকার কালেক্টর Mr. O.M.Martin বাদীর নাম সুন্দরদাস ওরফে ভাওয়াল সন্ন্যাসী উল্লেখে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারার বিধানমতে নিম্নলিখিত মর্মে এক নোটিস জারি করেন :

সুন্দরদাস ওরফে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর প্রতি—ঢাকা—

যেহেতু ইহা আমার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে যে তুমি জয়দেবপুরে যাইতে ইচ্ছা কর এবং সেখানে তোমার উপস্থিতি ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস স্টেটের নিয়মিতরূপে নিযুক্ত কর্মচারীদিগের বিরক্তি এবং প্রতিবন্ধক উৎপাদন করাইবে এবং সম্ভবত সাধারণ শান্তির বিঘ্ন ঘটাইবে, আমি এতদ্দ্বারা জয়দেবপুর থানার এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করি। তুমি ১৯২৯ সালের ১১ই মে তারিখে অথবা তাহার পূর্বে এই আদেশের বিরুদ্ধে হাজির হইয়া কারণ দর্শাইতে পার।

আমার স্বাক্ষর ও আদালতের সীলমোহর দেওয়া গেল।

২৪ এপ্রিল, ১৯২৯

স্বাঃ ও.এম.মার্টিন

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা

৭। বাদী উক্ত নোটিশ তাঁহার প্রতি জারি হইয়াছে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নাম সুন্দর দাস নহে এবং তিনি ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় উল্লেখ করিয়া এবং জয়দেবপুরে তাঁহার নিজ বাটীতে যাওয়ার অধিকার থাকা উল্লেখ

করিয়া আপত্তি দাখিল করেন। উক্ত মোকদ্দমার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাদীর এজাহার গ্রহণকালে বাদী অন্যান্য বর্ণনার সহিত নিম্নলিখিত বর্ণনা করেন :

> আমি ভাওয়াল সম্পত্তি দাবি করি, ইহা আমার পৈত্রিক। বাঙ্গলা ১৩১৬ সালে আমি জয়দেবপুর পবিত্যাগ করি এবং ১২ বৎসর পরে জয়দেবপুরে ফিরিয়া আসি। কাশিমপুর জমিদার মহাশয় আমাকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। সেখান হইতে যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক জয়দেবপুরে আনীত হই, তিনি আমার জন্য হস্তী পাঠাইয়াছিলেন। আমি প্রজাদিগের নিকট হইতে নজর পাইয়াছিলাম, তাহারা স্বেচ্ছায় এখনকার মতো আমাকে তাহা দিয়াছিল। এমন কি এখনও আমি নজর পাই। তাহারা নিজে আসিয়া নজর দেয়, ঢাকায় আসিয়া আমাকে ইহা দেয়। সকল প্রজাই আমাকে কুমার বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহারা স্বেচ্ছায় আমাকে খাজনা দিতেছে, আমি খাজনা দিবার জন্য তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করি না।
>
> আমি পৈত্রিক সম্পত্তির দাবি ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি। খাজনা গ্রহণ বন্ধ করিতেও ইচ্ছুক নহি। আমি এখন অদূর ভবিষ্যতে জয়দেবপুর যাইতে ইচ্ছা করি না।

৮। পরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উক্ত ১৪৪ ধারার হুকুম ৩০/৫/২৯ তারিখে রহিত করেন। উক্ত হুকুম হওয়ার পরে বিবাদীপক্ষের লোকের উক্তি ও ব্যবহারে বাদী আশঙ্কা করে যে সে জয়দেবপুর গেলে তাঁহার উক্ত স্থানে যাওয়ার পক্ষে বিঘ্ন ও বাধা জন্মাইবে। এবং উক্ত কারণে বাদী ইচ্ছাসত্ত্বেও জয়দেবপুর যাইতে আশঙ্কা করে।

৯। পরে বাদী আপন অংশের সম্পত্তি খাজনা প্রজাগণ বাদীর পত্নী বিভাবতী দেবীকে বা তাহার পক্ষে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে না দেয় এই মর্মে ভাওয়াল প্রজাসাধারণের মধ্যে গত ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নোটিশ প্রচার করেন।

উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর প্রজাসাধারণ বাদীর অংশের দেয় খাজনা বাদীকে পূর্বানুরূপ দিতেছেন এবং কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে ওই অংশের খাজনা দিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের ম্যানেজারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। এ মতে বাদী আপন অংশের জমিদারী প্রভৃতিতে সম্পূর্ণরূপে দখলীকার আছেন। কিন্তু ১নং বিবাদিনীর তরফ মহালের স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করিয়া বাদীকে খাজনা না দেওয়ার জন্য নানারূপ বাধা

ও বিঘ্ন জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছে। বাদীর খাজনা আদায়ের বিঘ্ন প্রদান করিবার জন্য এবং প্রজাদের নির্যাতন ভীতি প্রদর্শন করার জন্য ১নং বিবাদিনী এবং তাহার পক্ষে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের ম্যানেজার অবৈধভাবে প্রতিবাদীগণের তরফ বেআইনি এবং illegal certificate জারি করিতেছেন আনন্দকুমারী দেবীর তরফে যে সার্টিফিকেট জারি হইতেছে তাহা আগের without jurisdiction ultravires এবং invalid উক্ত সার্টিফিকেট জারি হওয়া সত্ত্বেও বাদীর দখল অক্ষুণ্ণ আছে।

১০। বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে ১নং বিবাদিনী এক্ষণে অন্যায় লোভের বশবর্তী হইয়া এবং অসৎ লোকের পরামর্শে বাদীকে না দেখা সত্ত্বেও বাদীর identity অস্বীকার করিতেছেন। এবং কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের সাহায্যে বাদীর দখল এবং বাদীর বসতবাটী জয়দেবপুরে যাওয়ার সম্বন্ধে বিঘ্ন ও বাধা ঘটাইবার উদ্দেশ্যে নানারূপ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ২নং বিবাদিনী স্বয়ং বাদীর identity স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্তে থাকায় তাঁহার ম্যানেজার Mr. E. Bignold বাদীর identity অস্বীকার করিয়া বাদীর খাজনা আদায়ের বাধা প্রদানের চেষ্টা করায় তাঁহাকে পক্ষভুক্ত করা গেল। ৩নং প্রতিবাদী বাদীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের পোষ্যপুত্র উল্লেখে কতক সম্পত্তি দখল করিতেছে। ৪নং বিবাদিনী শ্রীমতী আনন্দকুমারী দেবী উক্ত কুমার রবীন্দ্রনারায়ণের বিধবা, পত্নী হইতেছেন। বাদী উক্ত পোষ্যপুত্র বৈধ কি অবৈধ জানেন না। কিন্তু বাদী অবগত হইয়াছেন যে উক্ত পোষ্যপুত্র রদ সম্বন্ধে ঢাকার দ্বিতীয় সাবজজ আদালতে ১৯২৫ সালের ২১৬নং মোকদ্দমা দায়ের আছে। উক্ত পোষ্যপুত্র বৈধ কি অবৈধ বর্তমান মোকদ্দমায় তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ৩/৪ নং বিবাদী বাদীর identity প্রকাশ্যভাবে deny না করিলেও তাহাদের কার্যকলাপে এবং তাহাদের পক্ষীয় লোক ও কর্মচারীগণের উক্তি ও ব্যবহারে তাহারাও বাদীর identity ভাবতঃ অস্বীকার করে অনুমিত হইতেছে বলিয়া তাহাদের সাক্ষাতে বর্তমান মোকদ্দমা বিচার হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় তাহাদিকে পক্ষ করা গেল। তাহারা বাদীর দাবির বিরুদ্ধে উত্তরদায়ক হইলে তাহাদিগকেও মূল বিবাদীগণ্যে বাদী তাহাদের বিরুদ্ধেও আরজির প্রার্থিত প্রতিকার দাবি করিতেছেন।

১১। বাদী বর্ণনা করিতেছেন যে উপরিউক্ত অবস্থাধীনে বাদীর status সম্বন্ধে ১নং বিবাদিনীর কার্যের এবং উক্তির দ্বারা cloud thrown হওয়ায়

তাহার status declared হওয়া আবশ্যক। এবং মূল বিবাদিনী যাহাতে বাদীর দখল সম্বন্ধে এবং বাদীর বসবাটীতে যাওয়া সম্বন্ধে বিঘ্ন ঘটাইতে না পারে তাহার জন্য চিরস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হওয়া আবশ্যক।

১২। বাদীর বর্তমান মোকদ্দমার cause of action বোর্ডের resolution-এর তারিখ ৩০/৩/১৯২৭ হইতেও তৎপর ক্রমান্বয়ে উদ্ভব হইয়াছে। ডিক্লারেটরি ডিক্রি with consequential relief নিষেধ আজ্ঞার মূল্য ১০৫০০ টাকা ধরিয়া তাহার উপর ৭৭১টাকা ১২আনা কোর্ট ফি দিয়া বাদী বর্তমান নালিশ দায়ের করিতেছেন। দখল স্থিরতরের বা দখল পাওয়ার প্রতিকারের বিষয়ীভূত সম্পত্তির মূল্য ১৪২০০০ টাকা। উক্ত সম্পত্তির সদর রাজস্ব ষোলো আনিতে ৪২৪২৬ টাকা ৬ আনা ৩ পাই, বাদী এক তৃতীয়াংশ ১৪১৪২ টাকা ২ আনা ১ পাই তাহার দশগুণ ১৪১৪২১টাকা ৪ আনা ১০ পাই বটে আদালতের ন্যায় বিচারে উক্ত এক-তৃতীয়াংশ রাজস্বের দশ গুণের উপর কোর্ট ফি দেওয়া সংগত বিবেচিত হইল, উক্ত কোর্ট ফি বাদী হইতে গ্রহণে বাদী তদ্রূপ প্রতিকার পাওয়ার প্রার্থনা করিতেছে।

আদালতের এলাকায় বাদীর নালিশের কারণ পুনঃপুনঃ উদ্ভব হইয়াছে।

এ মতে প্রার্থনা—

১। বাদী ভাওয়ালের রাজা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মধ্যম পুত্র কুমার রামেন্দ্রনারায়ণ রায় বলিয়া প্রচার করিবার আজ্ঞা হয়।

(ক) নিম্ন তপশিলের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বাদীর দখল স্থিরতর রাখিতে বা প্রমাণ ও অবস্থানুসারে বাদীর দখল না থাকা সাব্যস্ত হইলে উক্ত সম্পত্তির উক্ত অংশে বাদীকে দখল দেওয়াইতে এবং তদবস্থায় বাদী হইতে অতিরিক্ত কোর্ট ফিস গ্রহণ তদ্রূপ ডিক্রি দেওয়াইতে—

(খ) উক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের ত্যক্ত ও পরবর্তী সময়ে অর্জিত সমুদয় ভাওয়াল রাজ্যের অর্থাৎ নিম্ন তপশিলের যাহার পরিচয় বিশেষরূপে দেওয়া হইল, তাহাতে এক-তৃতীয়াংশে বাদীর দখলের কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে তন্মর্মে ১নং বিবাদিনীর উপর চিরস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা জারি করিবার আজ্ঞা হয়।

(গ) মোকদ্দমা মুলতুবী থাকাকালে বিবাদীগণ যাহাতে বাদীর দখল সম্বন্ধে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মাইতে না পারেন, তন্মর্মে বিবাদীগণের উপর অস্থায়ী নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিবার আজ্ঞা হয়।

(ঘ) মোকদ্দমার অবস্থা ও বিবরণ মতে বাদী অন্যান্য যে-কোনো প্রতিকার পাইবার হক্‌দার তাহা ডিক্রি দিতে আজ্ঞা হয়।

(ঙ) মোকদ্দমার সমস্ত খরচ বাদীর অনুকুলে ডিক্রি দিবার আজ্ঞা হয়।

২। ২৭ নভেম্বর ১৯৩৩-এ শুরু হয় মামলা। এরপর বাদীর এজাহার শুরু হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫ সালে তা শেষ হয় বিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য দানের পালা শুরু এ দিনেই। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ পর্যন্ত তা চলে। পরের দিন ১৩ ফেব্রুয়ারি বিতর্ক শুরু হল এবং ৩১ মার্চ অবধি তা চলতে থাকে। এদিনই বাদী পক্ষের শুনানি শুরু হয়। আবার আর শেষ হয় ১৯৩৬ সালের ২৭ মে। এর পর সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্তটুকু—রায় দানের ক্ষণ, ১৯৩৬ সালের ২৪ আগস্টের বেলা ১১টা।

এই মামলায় যেগুলি বিচারের বিষয় ছিল তার একটা খসড়া করা যেতে পারে—১. মামলা করার উপযুক্ত কারণ আছে কিনা। ২. বাদী সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত কিনা। ৩. বাদী ও মেজকুমারের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য আছে কিনা ৪. বাদী যে স্থায়ী ইনজাংশন চেয়েছেন, তা তিনি পেতে পারেন কিনা ৫. মেজকুমারের শব সৎকার সত্যিই হয়েছিল কিনা এবং ৬. বাদী কোনও সুবিধা পেতে পারেন কিনা এবং যদি পান, তবে তা কী ধরনের হবে।

এবার সাক্ষীদের কথা বলি। বাদীর পক্ষে যাঁরাই সাক্ষী ছিলেন, তাঁরা সবাই বলেছিলেন—যিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই মেজকুমার। এমনকী মেজরানির কয়েকজন আত্মীয়, যেমন তাঁর মামাতো বোন পূর্ণসুন্দরী দেবী, মেজকুমারের বয়সি বলেছিলেন তিনি সন্ন্যাসীকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন এবং সন্ন্যাসীও তাঁকে 'দিদি' বলে চিনতে পেরেছিলেন। এই পূর্ণসুন্দরীর বিমাতা সরোজনীদেবীও তাঁকে চিনতে পারেন এবং বলেছিলেন দরকার হলে সন্ন্যাসীর পক্ষে সাক্ষী দেবেন। বিভাবতীর পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন মোট ৪৭৯ জন, এদের মধ্যে ৩৭৪ জন বলেছিলেন যে তাঁরা মেজকুমারকে চিনতেন এবং সন্ন্যাসী আর মেজকুমার এক ব্যক্তি নন। এঁদের অনেকে ভাওয়াল এস্টেটে চাকরি করতেন।

এঁদের অনেককে বিবাদী পক্ষে সাক্ষ্য না দিলে চাকরি যাবে—এমন ভয় দেখানো হয়েছিল।

সন্ন্যাসীকে মেজকুমার প্রমাণের জন্যে কী না করা হয়েছিল—জামা-জুতোর মাপ, ফটো, লেখাপড়া সবই করতে পারেন কি না, খেলাধুলা, গোঁফ, কান, গায়ের চুলের রং, শরীরের বিশেষ চিহ্ন (যেমন মেজকুমারের লিঙ্গে একটি ছোটো তিল ছিল) চোখ, জিভের নীচে মাংসপিণ্ড, কাটা দাগ, উপদংশক্ষতজনিত দাগ—সব কিছুই জানার জন্যে যাকে বলে উলঙ্গ করে যাচাই করা—তা-ই হয়েছিল।

বিপক্ষের ব্যারিস্টার, তো তাঁকে ভোঁদা পালোয়ান ও অবাঙালি বলে তাঁর বক্তব্যই শুরু করেছিলেন। বাদী ও মেজকুমারের এক বয়স (৫২), প্রায় এক উচ্চতা (১ ইঞ্চির তফাত সাড়ে পাঁচ ফুট), ৬নং সাইজের জুতো 'দুজনেরই' আলোকচিত্রী এবং শিল্পীদের মতে এক-অভিন্ন ব্যক্তি প্রমাণ হবার পর ব্যারিস্টার চৌধুরির যুক্তি ধোপেই টেকেনি। মেজবাহাউদ্দিন নামে এক বড়ো তালুকদার সাক্ষী দিয়েছিলেন। তিনি একবার ডাক্তার সামসুদ্দিনকে নিয়ে মেজরানির সঙ্গে দেখাও করতে গিয়ে তাঁকে বলেছিলেন—'আমরা সন্ন্যাসী যে কুমার তা চিনতে পেরেছি। আপনি একবার গিয়ে দেখলেই তাঁকে চিনতে পারবেন। এস্টেটের টাকাকড়ি এভাবে নষ্ট করে লাভটা কী?'

মেজরানির চোখ দিয়ে সেদিন, জানি না এই একটা দিনই কিনা অথবা একা একা ভিতরে ভিতরে অন্যদিনেও—জল গড়িয়ে পড়েছিল। অস্ফুটে বলেছিলেন—'এখন আর তা কি সম্ভব'?

এসব সাক্ষ্যর চেয়েও গুরুতর সাক্ষ্য ছিল স্বয়ং সন্ন্যাসীর। সে এক আশ্চর্য কাহিনি। মনোহর কাহিনি অবশ্যই নয়। যেন স্বপ্নের সুরে তিনি আদালতকে শুনিয়ে চলেছেন তাঁর স্বভাব, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, বন্ধুত্বের বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা, তাঁর পরিকল্পিত মরণ, তাঁর বেঁচে ওঠা নাগা সন্ন্যাসীদের কল্যাণে, তার প্রব্রজ্যার জীবন, স্মৃতি বিস্মরণ, আবার ফিরে পাওয়া, আবার জন্মভূমিকে ফিরে দেখা এবং আবার জীবনের আস্বাদে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা-গল্প-উপন্যাসের চেয়েও আকর্ষক—ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকসন। তাঁর বংশ, পরিচয়, স্বজনদের বিবরণ, তাঁর মুখের ভাষার টানে পরিবর্তন, তেরো বছরের বউকে ঘরে আনা, বাবা-মা'র মৃত্যু, পড়াশোনা, জীবজন্তু নিয়ে খেলাধুলো,

নিজের চিড়িয়াখানা গড়ার শখ—চারটে বাঘ, দুটো বনমানুষ, একজোড়া শম্বর হরিণ, উট, গাধা, পুকুরে কুমির, ১৫/১৬টি ময়ূর, রাজহাঁস, উটপাখি, তিতির-ধনেশ-ক্যানারি পাখির কূজন এমনকী একটা শেয়াল। তাঁর দিলোয়ার মাহুত, নিজের চার চারটে হাতি, টমটম, ব্রুহাম, রুপোর গাড়ির শখ, চালানো, শিকার করা, পোলোগ্রাউন্ডে খেলা—সে এক স্বপ্নের দিন।

শরীরের মাপে তাঁর পা ছোটো, জিভের নীচে মাংসপিণ্ডের কারণে কথার অসুবিধে, হাতের কবজির রেখাগুলো মোটা হয়ে গেছে বলে আর দেখা যায় না। এই রেখা তাঁর পরিবারের অনেকেরই ছিল! পায়ের পাতার চামড়াটা বড্ড খসখসে। বাবা, ছোটোভাই, ঠাইনপিসি, মেজদি—সবার পায়ে এমনি পুরু চামড়া। বাঘের খাবলে ডানহাতে একটা চিরকালের জন্যে দাগ, টমটম থেকে পড়ে দাঁতভাঙা, ফিটন গাড়ির চাকা পায়ের উপরে দিয়ে যাওয়ায় কাটা দাগ—সবই তো তাঁর পরিচয়চিহ্ন। কালীপ্রসন্ন ঘোষকে টাকা তছরুপ করায় মা বিদায় দিলে এর বাবার চাকরি, তাঁরও বিদায়—সবই তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল। লাভচাঁদ মতিচাঁদদের বাড়িতে কলকাতায় থাকা, উপদংশ হওয়া, দার্জিলিং-এ যাওয়া সত্যেনের প্রস্তাবে—ঠাকুমা আর মেজদি যেতে চাইলে সত্যেনের তাঁদের না-নিয়ে যাওয়া। শরীর তো ভালোই ছিল—হঠাৎ পেট ফেঁপে বড্ড কষ্ট পাওয়া। সাহেব ডাক্তারের চিকিৎসা। তারপরে আশু ডাক্তারের ওষুধে বুকজ্বালা, বমি হওয়া—তবুও সে রাতে অন্য ডাক্তার না-আসা, পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে অজ্ঞান হওয়া পর্যন্ত—সবই তাঁর স্মৃতিতে ছবির মতো মুদ্রিত।

তারপরে কী হয়েছিল, তা তো তাঁর জানার কথা নয়। জ্ঞান হলে তিনি দেখেন নাগাসাধুদের আশ্রয়ে। তাঁদের কল্যাণে বাঁচা হিন্দি শেখা ভালো করে, ভারতের নানা তীর্থ পরিক্রমা, মন্ত্র নেওয়া, ধীরে স্মৃতি ফিরে আসা, বরাহচত্বরে মনে পড়ে তাঁর বাড়ি ঢাকায়। শেষে একদিন রাত বারোটায় ঢাকায়। তারপরে বাঁধে থাকা, কাসিমপুরে যাওয়া, লোকের আমাকে চিনতে পারা, জ্যোতির্ময়ীর বাড়িতে যাওয়া—দশনম্বর সাক্ষী যখন আট দিন ধরে সাক্ষ্যের মধ্যে পাঁচ দিন ধরে জেরায় আত্মপরিচয় নিবেদন করলেন মরণের ওপার থেকে বেঁচে এসে আমি বেঁচে আছি এই প্রত্যয় ঘোষণা করে।

৫ মার্চ বিভাবতীদেবীকে জেরা করা হয়, শেষ হয় ২৭ মার্চ। খুব কঠিন পক্ষ, তাঁকে টলানো শিবের অসাধ্যি তো ব্যারিস্টার বি সি চ্যাটার্জি তো কোন্

ছার। তাঁকে যখন জিগ্যেস করা হয় কুমারকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার পরই কি কুমারের মৃত্যু ঘটে? তাঁর কাঠ কাঠ উত্তর—'এ কথা আমি কী করে বলব, আমি কি ডাক্তার!' অথবা আপনার স্বামী আপনার সঙ্গে শুতেন না বলে আপনার ভীষণ দুঃখ হয়েছিল কি'—এই প্রশ্নের উত্তরেও তাঁর সাফ জবাব—'না, দুঃখ হয়নি।' এমনকী 'কেউ যদি একথা বলে যে দার্জিলিং-এ যাওয়ার আগে পর্যন্ত কুমারের চরিত্র খারাপ ছিল, একথা কি সত্য হবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে চিরকালীন সাধ্বী-স্ত্রীর মতো তিনি জবাব দেন—'তিনি আমার স্বামী, কিছু বলতে চাই না।' বড়োকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে একই প্রশ্ন করা হলে অনুগতা ভ্রাতৃবধূর সসম্ভ্রম উত্তর—'তিনি আমার গুরুজন, তাঁর সম্বন্ধেও আমি কিছু বলতে চাই না।'

অবিশ্যি একবার তিনি, অন্তত একবার তিনি সংবিৎ হারিয়ে ফেলে হুড়হুড় করে অনেক উলটোপালটা কথা বলতে শুরু করেন। সত্যনিষ্ঠ সত্যবাবু তো চেয়ারে বসে বসেই ঘামতে শুরু করেন। একটু পরেই তিনি সংবিৎ ফিরে পান কিন্তু কেমন যেন ফুরিয়ে যেতে থাকেন। আবার এমনি করেই দেখা হয়ে গেল দু-জনে।

এমনি করেই আরও একটা বছর কেটে গেল। এসে গেল ২৪ আগস্ট ১৯৩৬-এর সকাল।

৩। সকাল এগারোটা, ২৪.০৮.১৯৩৬। আদালতের ভিতরে বাইরে, ঘরের ভিতর বারান্দা ছাপিয়ে অসংখ্য মানুষের ঢল রাস্তা পর্যন্ত নেমে গেছে। ভিড় সামলাবার জন্য মোড়ে মোড়ে বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা। উত্তেজনা রয়েছে—কী হয় কী হয়! কিন্তু সব কিছু যেন নিয়ন্ত্রণে। ভিড় ঠেলে আদালতের কর্মীদের নাভিশ্বাস অবস্থা।

ঠিক এগারোটায় পান্নালাল বসু, অতিরিক্ত জেলা জজ তাঁর এজলাসে তাঁর সম্মানিত কেদারায় আসীন। পিন-পতন নীরবতা, শুধু বিশাল টাইপকরা কাগজের পাতাগুলো টানাপাখার হওয়ায় উড়ছে। জজসাহেব বেছে নিলেন কয়েকটি পৃষ্ঠা। মৃদুগম্ভীর গলায় বললেন—এই রায় দীর্ঘ। আমি সবটা পড়ছি না, শুধু আমার রায়ের সিদ্ধান্তের অংশটুকু আমি পড়ছি। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল :

সমস্ত প্রমাণপত্র, উভয়পক্ষের সম্মানিত উকিলবাবুদের বক্তব্য—একটা

মানুষের পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব আমি যতদূর সম্ভব সযত্নে বিবেচনা করেছি। ঘটনার গুরুত্ব এবং কোনও কোনও প্রশ্নের মধ্যে থাকা বিতর্ক সম্পর্কে সবাই সচেতন। কোনও একটা তথ্য বাদ দিয়ে পরিচয় উদ্‌ঘাটন অসম্পূর্ণ থেকে রায়, সেজন্য ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করেছি। পরিচয় উদ্‌ঘাটনে বেশ কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। নানান ধরনের সৎ ভদ্রলোক ও মহিলারা এসব সাক্ষ্য দিয়েছেন। একজন পাঞ্জাবিকে কুমারের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার চক্রান্তটিও আমি বিচার করে তাকে এই রায়ের বাইরে রাখাই ভালো মনে করেছি।

আর একটা কথা—একটা মানুষের শরীরের নানান চিহ্ন কখনওই অন্য আর একটা লোকের শরীরে থাকতে পারে না—এটাও মনে রেখেছি।

বাদীর হাতের লেখা দেখেছি। মানুষটা ফিরে আসার পর থেকে এই বিচারের দিন পর্যন্ত একদিনও লুকিয়ে থাকেননি। তাঁর কাছে সবার দ্বার ছিল অবারিত। আত্মপরিচয় ঘোষণার পর তিনি জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে তাঁর পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য অনুসন্ধান করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন। যে-কোনো মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি সদাপ্রস্তুত ছিলেন। ঢাকার কেউ তাঁর পরিচয় নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেননি। কেবল রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি—যিনি তাঁর সম্পত্তি ভোগ করছেন এবং কুমার ফিরে আসা মানেই তাঁর কাছে একটা বিপর্যয় ছিল। এজন্যে কুমারের মৃত্যুর উপরেই তিনি এত জোর দিয়েছেন। সেজন্যেই চরম দ্রুততার সঙ্গে মিঃ লেথব্রিজের সঙ্গে দেখা করে যাতে মৃত্যুর প্রমাণাদি সংরক্ষিত হয়, তার অনুরোধ করে এসেছিলেন। বলেছিলেন জেলাশাসক মিঃ লিন্ডসেকে যেন তার প্রতিলিপি পাঠানো হয়। মিঃ লিন্ডসে তো সমঝে গিয়ে বাদীকে 'জাল' বলে ঘোষণা করে বসেন। আর অবিশ্বাস্য দ্রুততায় দার্জিলিং গিয়ে সাক্ষী তৈরির ছকও ঠিক ঠিক করে নেন। এই বিরাট জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন বাদী। তবুও তিনি অনুসন্ধানের জন্যে অনুরোধ করেছিলেন।

সত্যবাবু তো সন্ন্যাসীর ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে ভিতু হয়ে পড়েছিলেন। আবার ইন্সিওরেন্সের কাগজপত্রে কুমারের দেহের বিশেষ চিহ্নের যে কথা লেখা আছে, তা তিনি জানতেন বলে সে ব্যাপারেও একটা ভয় ছিল। বাদী নিজের

চেষ্টায় সেগুলো গ্লাসগো থেকে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন, যে বাদী একজন 'জাল' বলে অভিযুক্ত।

এই জটিল মামলার সব জায়গাতেই একটা ভয় জড়িয়ে ছিল—আসলে সে ভয় 'সত্যে'র ভয়। কিন্তু সবশেষে প্রকৃত ঘটনা তো উদ্‌ঘাটিত হবেই। চেষ্টা হয়েছিল একটা মন্ত্রসিদ্ধ আলাদা মানুষ বোনেদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সম্পত্তি বাগাতে চাইছে। কিন্তু মেজরানির উত্তরপাড়ার আত্মীয়স্বজনেরাই তাঁকে সমর্থন করেননি। মেজরানির কথাও আমি আপাদমস্তক বিবেচনা করেছি। তাঁর তো নিজের ইচ্ছে বলে কোনও ব্যাপারই ছিল না, যা করতেন সব তাঁর দাদা। তাঁর সব পাওনাগণ্ডা তো দাদাই নিয়ে দিতেন। তাঁর একটা ব্যাংক আকাউন্ট পর্যন্ত ছিল না অথচ তাঁর বার্ষিক আয় ছিল লাখ টাকার কাছাকাছি! তাঁর নিজে যে একটা পয়সাও ছিল, তার প্রমাণস্বরূপ একটা কাগজও দেখাতে পারেননি তিনি। জয়দেবপুরের এই নিঃসঙ্গ সন্তানহীনা নারীর জীবনে কিছুই তো ছিল না, এমন সুখের স্মৃতিও কিছু ছিল না—যা দিয়ে তিনি বাঁচতে পারেন। তাঁর বর্তমান জীবন এবং অতীত জীবন—একদিকে সম্পদ ও অন্যদিকে নোংরা ক্ষতচিহ্নবাহী স্বামীর স্মৃতি....দুঃসহ। (এটাই আসল কারণ বলে আমরা মনে করি, এই রিক্তা নারী ফুলশয্যার দিন থেকেই বধূর সম্মান, নারীর মর্যাদা, প্রেমের মাধুর্য—সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন বলেই একটা প্রতিহিংসা তাঁকে নিত্য কুরে খেয়ে এতখানি স্বামীবিমুখ করে তুলেছিল। এদিক থেকে কুমার কি সত্যিই ক্ষমা পাবার যোগ্য? কিন্তু টাকাকড়ি, বৈভব আর মর্যাদা তো এক তুলাদণ্ডে মাপ করা যায় না)!

শেষ পঙ্‌ক্তি জজসাহেব উচ্চারণ করলেন—'I find the Plaintiff is Romendra Narayan Roy, the second son of the late Raja Rajendra Narayan Roy of Bhowal'—আমি বলছি বাদীই ভাওয়ালের প্রয়াত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের মধ্যম পুত্র রমেন্দ্রনারায়ণ রায়।

৪। শুনে আনন্দে উদ্‌বেল জোতির্ময়ী চেতনা হারালেন এবং উদ্‌বেগে-উদ্‌বেল আশু ডাক্তারের মূর্ছা হল। আদালতের বাইরে তখন হাজারো জনতার উল্লাস—'জয় মধ্যমকুমার কি জয়!' শ্যামল গোস্বামী আর পরমেশ্বর দ্বিবেদী নামের দুই গণক, যাঁরা, ১৯২১ সালেই সন্ন্যাসীর হাত দেখে বলেছিলেন তিনি সদ্‌বংশজাত এবং তাঁর হারানো সম্পত্তি ফিরে পাবেন—উল্লাসে ফেটে পড়লেন।

তাঁদের ব্যবসার পসার বেড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। আর একজন জ্যোতিষী তো বলেই বসেছিলেন সন্ন্যাসী একদিন তাঁর গদিতে এসে বসবেনই।

রায় ঘোষণার পাঁচ দিন পরে ২৯ আগস্ট, ১৯৩৬ তারিখে দার্জিলিং-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশের প্রযত্নে একটি চিঠি গেল জনৈকা বিদেশিনির কাছে 'Dear frl. Schenkl' সম্বোধনে এই মামলার সময়কালীন বিভিন্ন কাগজের কাটিংসহ, যাতে তাঁকে এগুলির ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন জার্মানির কোনও কাগজে দিলে তাঁর লুফে নেবেন 'পূর্বদেশের আজব' কাহিনি তাঁদের পাঠকেরা গিলবে ভেবে।

চিঠিটা অস্ট্রিয়ার এই মহিলাকে লেখা। যাঁর সঙ্গে পত্র লেখকের এ সময়ে প্রেমপর্ব চলছিল এবং যাঁকে গোপনে তিনি ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বরে বিয়ে করেছিলেন। এ সময়ে পত্রলেখক কার্শিয়াং-এ অন্তরীন ছিলেন। পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন পত্রলেখকের পরিচয়—তিনি (নেতাজি) সুভাষচন্দ্র বসু, পত্রপ্রাপিকা কুমারী এমিলি শেঙ্কল। ঘটনাটি থেকে বোঝা যাচ্ছে ভাওয়াল সন্ন্যাসী নিয়ে সব স্তরের মানুষেরই কী প্রবল আগ্রহ ছিল! সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যস্ত মানুষও জেলে বসে কাগজ পড়ে তার কাটিং রাখতেন এবং প্রেমলিপির পরিবর্তে এহেন উত্তেজক একটি কাহিনি নিবেদন করেছিলেন।

এমন একটি রায়ে প্রতিপক্ষের মতোই মর্মাহত সরকারি পক্ষের কর্তাব্যক্তি কর্মীগণও। ঢাকা বিভাগের কমিশনার ডব্লু এইচ উইলসন জেলাশাসককে লিখলেন—জজের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে হবে। আর যদি বাদী সম্পত্তি দাবি করে কোনও দরখাস্ত করেন, তবে হাইকোর্টের অর্ডার না আসা পর্যন্ত সেটাকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। তিনি একটা নোটিশও প্রজাদের উদ্দেশ্যে জারি করে দিলেন যে—'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসই আগের মতোই খাজনাপাতি আদায় করতে থাকবে এবং সেই রসিদই আইনমাফিক বলে গণ্য করা হবে।'

পাঠক-পাঠিকার ইচ্ছে হতে পারে বিচারক পান্নালাল বসুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানতে। এমন একটা উত্তেজক এবং বিভ্রান্তিকর মামলার নিষ্পত্তি করে রায় দানের পর গাড়ি করে তিনি আদালত থেকে তাঁর টিকাটুলির ভাড়া করা বাড়িতে ফিরে গেলেন—পা দুটো কি শান্তিতে টানতে পারছেন না তিনি? সন্ধেবেলায় স্ত্রীকে পাশে ডেকে বললেন—দেখো বাপু, আর আমি যেন পারছি

না। আমি এই বিচারবিভাগের চাকরি ছেড়ে দেব। তাঁব বয়স তখন মাত্র ৫৩, আরও ৭ বছরের চাকরি আছে। তা থাকগে। ভাওয়ালই হোক তাঁর শেষ মামলার বিচার। তিনি হয়তো ভাবছিলেন—তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হবেই হাইকোর্টে। এই মামলার বিচার করতে গিয়ে সরকারি আমলাদের তিনি যেভাবে সমালোচনা করেছেন, তা তো তাঁরা ভালোভাবে মেনে নেবেন না। তাতে তাঁর চাকরিজীবন কন্টকিত হবে। যথেষ্ট হয়েছে—আর না—এনাফ ইজ এনাফ। তিনি পদত্যাগ করলেন। ১৯২১ সালে বিতাড়নের পর সন্ন্যাসী, থুড়ি, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় মাথা উঁচু করে জয়দেবপুরে ফিরে এলেন ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে।

পাঁচ

ক

সুতরাং বলা যায় আপিল করলেন হাইকোর্টে। হাইকোর্টের সরকারি নাম ছিল তখন —দি হাইকোর্ট অফ জুডিকেচার অ্যাট ফোর্ট উইলিয়াম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। ১৯৩৬ সালের ৫ অক্টোবর বিভাবতীদেবী, আনন্দকুমারীদেবী ও তাঁর দত্তকপুত্র রামনারায়ণের নামে হাইকোর্টে আপিল পেশ করা হল। এঁদের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর দেখভালে, তাই এঁদের প্রতিনিধিত্ব করতে লাগলেন ভাওয়ালের ম্যানেজারবাবু বন্ধু হিসেবেই বলুন বা অভিভাবক হিসেবেই বলুন।

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হ্যারল্ড ডারবিশায়ার বললেন, জেলা কোর্টের সব কাগজপত্র ছাপিয়ে তবে আপিলের শুনানি হবে। মাত্র ৮০,০০০ টাকা খরচ করে (আপিলকারীদের পয়সায়।) মোট ১১৩২৭ পৃষ্ঠায় ২৬ খণ্ডে ছাপা হল। আর তিনটি খণ্ড লাগল ছবিপত্র ছেপে। সত্যভামাদেবীর 'আদ্যশ্রাদ্ধ' বোধ করি সম্পূর্ণ হল।

একটি স্পেশাল বেঞ্চ গঠিত হল তিন বিচারপতি এল ডব্লু জে কসটেল্লো, সি সি বিশ্বাস এবং আর এফ লজকে নিয়ে। দুই পক্ষের ব্যারিস্টার রইলেন আগের মামলারই দু-জন—বি.সি.চ্যাটার্জি এবং এ. এন. চৌধুরি। শুনানি শুরু হল ১৪ নভেম্বর ১৯৩৮ এবং চলে একটানা ১৪ আগস্ট, ১৯৩৯ পর্যন্ত মোট ১৬৪ কার্যদিবস জুড়ে। চৌধুরি বললেন, আগের মামলার বিচার নানা ভুলে ভরা ছিল, বিচার সঠিক হয়নি। বি সি চ্যাটার্জি উঠে পান্নাবাবুকেই সমর্থন করলেন। তাঁর মান্যবর বন্ধুর বক্তব্যের সঙ্গে তিনি আদৌ একমত নন—অতএব আপিল ডিসমিস করা হোক।

বিচারপতি কসটেল্লো মহা ফাঁপরে পড়লেন। তাঁকে বিলেত যেতেই হবে ছুটিতে, ফিরে এসে তিনি রায় দেবেন বলে গেলেন। কিন্তু যুদ্ধটুদ্ধ শুরু হওয়ায় (জার্মানির সঙ্গে ডেনমার্ক আর নরওয়ের) তিনি ফিরতে পারলেন না। এদিকে খুব দেরি হচ্ছে দেখে বাকি দুই বিচারপতি আর দেরি না করে (এক বছর তো পার হয়েই গেছে) রায় দেবার উদ্যোগ নিলেন। তার আগে বিচারপতি বিশ্বাস নাটকীয়ভাবে জানালেন যে, বিচারপতি কসটেল্লো তাঁর রায় লিখিতভাবে পাঠিয়েছেন। বর্তমান আইনানুসারে সেটি পড়ে শোনানো দরকার। কিন্তু আমাদের দুজনের কেউ সেটি দেখিনি। কাজেই তিনি কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জানি না। এই বলে তাঁরা মামলার আদ্যোপান্ত আবার করে বিচার-বিশ্লেষণ করেন।

আবার তাঁর মতই সমস্ত বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করে বিচারপতি লজ আপিল খারিজ করার বিপক্ষে মত দিলে ফল দাঁড়ায় ১-১। এখন বিচারপতি কসটেল্লো তাঁর যে রায় লিখে পঠিয়েছিলেন—তাতে যা বলেছিলেন, তার উপরেই এই আপিল ভাগ্য নির্ধারিত হবে। কিন্তু তাই কি হওয়া উচিত? তিনি তো শুনানি শোনেননি। তাই আগে বিচারপতি লজ এবং দেরিতে হলেও পরে বিচারপতি বিশ্বাস তাঁদের রায় লিখিতভাবে এয়ারমেলে বিচারপতি কসটেল্লোর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেগুলি পেয়ে তাঁর মতামত পাঠিয়ে দিলেন। ২০ আগস্ট, ১৯৪০—বিচারপতি বিশ্বাস উদ্‌বেগ নিয়েই কসটেল্লোর রায় পড়ে শোনাতে লাগলেন। তাঁর রায়ও তিনি সমস্ত দিক কীভাবে লক্ষ করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে সবশেষে লিখেছেন—'As Mr. Justice Biswas and myself are in agreement, the order of the Court must be that the appeal is dismissed with costs'.-বিচারপতি বিশ্বাস এবং আমি যেহেতু দুজনেই একমত, অতএব আদালতের আদেশ হবে খরচাপাতিসহ আপিল খারিজ।'

খারিজ হল ২-১ ভোটে।

খ

সরকার একেবারে ভেঙে পড়ল—তাদের সব আশার মুখে পড়ল ছাই। এমনটি

তো হবার কথা ছিল না। সত্যবাবু একেবারে আপিল খারিজ হবার ক-মাসের মধ্যেই, ১৯৪১-এর শুরুতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। সত্যের মৃত্যু হল!

ঠিক এই সময়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচ কলকাতাতেও গিয়ে হাজির হল। দু'দুবার মামলা-জেতা কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ কলকাতার সরযূবালাদেবীর (এই ধর্মপ্রাণ নারী কালীঘাট মন্দির ও জগন্নাথ মন্দিরে বহু টাকা দান করেছিলেন) আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে মনস্থির করলেন। সরযূবালা তখন তাঁর ভাইয়ের পরিবারবর্গ আর দেবর মেজকুমারকে নিয়ে কাশী চলে এলেন। হাইকোর্টে বিভাবতীদের আপিলের কারণে এখনও পর্যন্ত ঢাকা আদালতের রায় কার্যকর করে মেজকুমারের হাতে সম্পত্তি তুলে দেয়নি কোর্ট অফ ওয়ার্ডস। ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারিতে আপিল খারিজ হবার পরেই দু'লাখ টাকার জামিন রেখে তাঁর অংশের টাকা তোলার অধিকার পেয়েছিলেন। জিতেও তিনি তাঁর সব অধিকার যেন পেলেন না।

এদিকে কমলি নেহি ছোড়েগি। বিভাবতী হার মেনে নিতে রাজি নন। দাদা নেই বলে তিনি কমজোরি হয়ে গেছেন—লোকে যেন এ কথা মনে ঠাঁই না দেয়। তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করবেন স্থির করলেন। শেষ কামড়টা দিয়েই দেখা যাক।

রানি চাইলে কী হবে, কোর্ট অফ ওয়ার্ডস পিছিয়ে আসতে চাইছে। ব্যারিস্টার অমিয়নাথ তো হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে সোজা স্ট্র্যান্ডে এসে তারপর ব্রিফটি বিপুল আক্ষেপে ভাগীরথীতে বিসর্জন দিলেন। অবিশ্যি তার সহকারী ফণীভূষণ চক্রবর্তী হাল ছেড়ে দিতে চাইলেন না। এদিকে মেজকুমার তাঁর ভাগের সম্পত্তি পেলেও যে মেজরানির সঙ্গে তাঁর ঘরবাঁধা কোনও দিনই হবে না—এটা সবাই বুঝতে পেরে গেছেন। বড়োরানি তাই ভেবেচিন্তে দেওরের আবার বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। কলকাতা থেকে বেনারসে পালিয়ে এসেছিলেন আরও একটি পরিবার যুদ্ধের ভয়ে। সেই পরিবারের একটি মেয়ে, ধারা মুখার্জি, তিরিশের ঘরে তাঁর বয়স, তাঁকে পছন্দ করে তাঁর সঙ্গে মেজকুমারের বিয়ে দিলেন বেনারসেই বেশ ধুমধাম করেই। একজন হিন্দুর দ্বিতীয় বিয়ে করা সে সময়ের আইনে চল ছিল।

গ

বিভাবতী চাইলে কী হবে—ফণীবাবুকে নিয়ে মামলা লড়া তাঁর হল না। ১৯৪৫-এর শুরুতেই ফণীবাবু কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়ে গেলেন। বিভাবতী ভাবলেন—কেউ কী ষড়যন্ত্র করে এমন করে দিলেন। শশাঙ্ককুমার ঘোষের কথা আমাদের মনে আছে, কালীপ্রসন্ন ঘোষের পুত্র। সেই শশাঙ্কবাবুর ছেলে পঙ্কজকুমার ঘোষ এবারে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন—তিনি বিভাবতীর পক্ষে আগে থেকেই ছিলেন। এবারে তিনি প্রিভি কাউন্সিলে লড়ার জন্যে ইংল্যান্ড রওনা দিলেন। নিয়ম অনুযায়ী রাজার খাস উপদেষ্টা (Kings Counsel) নিযুক্ত হলেন ডব্লু. ডব্লু. কে পেজ—কলকাতার হাইকোর্টের এই ব্যারিস্টার সবে লন্ডনে ফিরে এসেছেন।

বিবাদী রমেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগ করেছিলেন আগুনে ব্যারিস্টার ডি. এন. প্রিটকে (D.N.Pritt)। তিনি এই মামলা কাউন্সিলে ওঠার ব্যাপারেই বিরোধিতা করলেন। যা-ই হোক, কাউন্সিল বিভাবতীকে বিশেষ সুযোগ দিলেন, আপিলের শুনানি শুরু হল স্পেশাল বেঞ্চে। এখানে তো আর সাক্ষী-টাক্ষির ব্যাপার নেই। স্পেশাল বেঞ্চের পাঁচজন বিচারক আর বাদী-প্রতিবাদীর দলে যুক্তির লড়াই চলল। পাঁচজনের মধ্যে বাহাত্তর বছরের কালো চুলওয়ালা তরুণ ব্যারন থ্যাঙ্কারটনও ছিলেন। আলোচনা চলল। নিয়মানুসারে বিশেষ কোনও ব্যাপার না থাকলে প্রিভি কাউন্সিল দু-দুটো আদালতের রায়ের তৃতীয়বার বিবেচনার কথা খারিজ করে দিয়ে থাকে। স্পেশাল বেঞ্চ আলোচনা করে স্থির করলেন যে আপিলকারিণী এমন কিছু নতুন তথ্য দেননি, যা দিয়ে এই নিয়মটাকে ভেঙে নতুন রায় দেওয়া যায়। তা ছাড়া স্বামী মৃত—এই বিশ্বাসে মাত্র তাঁর সম্পত্তি ভোগ করা ১৯০৮ সালের লিমিটেশন আইন ৯-এর ১৪৪ ধারা মোতাবেক যথার্থ নয়। আর ১৮৭২ সালের ১নং এভিডেন্স আইনের ৩, ৫৯, ৬০ নং ১১৪ ধারা মোতাবেক সাক্ষ্য মেনে নেওয়া যেতে পারে। এসব বিচার করে তাঁরা রায় দিলেন—আপিল খারিজ।

ঘ

'আপিল খারিজ'—শব্দ দুটো সরযূবালা-রমেন্দ্রের কাছে যে বার্তা বয়ে নিয়ে গেল, বিভাবতীর কাছে তা নিশ্চয়ই নয়। দেবর রমেন্দ্রের সব খরচপাতিই বিধবা সরযূই বহন করে এসেছেন এতাবৎকাল। বিভাবতীর মতো তাঁকেও ক্ষমা করেনি হিন্দুসমাজের একাংশ। দেওর-ভাজের সম্পর্ক নিয়ে মুখরোচক গল্প তো চিরকালই গড়ে ওঠে। বিভাবতীর নামে কুৎসার অবধি ছিল না। কিন্তু এমন জেদি আর এক বগ্‌গা মহিলাও তো বাঙালি সংসারে দুর্লভ। কোর্টে যাবার আগে একদিনের জন্যেও তো কেউ তাঁকে সন্ন্যাসীকে দেখার জন্যে নিয়ে যেতে পারেনি। এত নিন্দে সত্ত্বেও দাদাকে ছেড়ে অন্যত্র যাননি। দাদার মৃত্যুর পরেও পুরনো জেদে এতটুকু মরচে পড়েনি। ছোটোরানি আনন্দকুমারীর কথা অবশ্য আলাদা। দত্তকপুত্র হলেও তাঁর একটা ছেলে, একটা আশ্রয় তো ছিলই। তবে তার দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে মেজরানির আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার একটা জাগতিক কারণ তো ছিলই। তিন রানির কারও তো গর্ভজ পুত্র ছিল না। বড়োকুমার, ছোটোকুমার দুজনেই গত হয়েছেন। এখন যদি মেজকুমারের অস্তিত্ব একবারেই আইনিভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় তবে তো তাঁর রাম, রামরাজত্বি পেয়ে যাবে। সেই লোভটা যে বড্ড লোভ—সব কিছুকেই ছাপিয়ে যায়। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলের এই রায় যে তাঁর সকল আশায় ছাই ঢেলে দেই। এর মধ্যে ১৯৫০ সালে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের আইনে রামনারায়ণের রাজত্বিটা খুব ছোটো হয়ে গেল। জয়দেবপুর ছেড়ে তিনিও মাকে নিয়ে কলকাতা চলে এলেন। মাঝে মাঝে আদায়পত্রের জন্যে অবশ্য দেশে আসতেন। ১৯৬০ সালের কাছাকাছি তাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

প্রিভি কাউন্সিলের বিচারের অপেক্ষা থেকে রমেন্দ্রনারায়ণ হাইকোর্টের আদেশ নিয়েই ম্যানেজার পি কে ঘোষের নামে একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে রেখেছিলেন। মাসোহারা হিসেবে তিনি পেতেন হাতে ১১০০ টাকা, তাঁর বাকি পাওনা অন্য একটা অ্যাকাউন্টে জমা হত। ১৯৪৪ থেকে সেই জমা টাকা এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

ঙ

ধবধবে থান ধুতিটার আঁচল মাথার উপর ঘোমটা দিয়ে টানা। ঠাকুরঘরে তিনি। ঠাকুরই তো এখন তাঁর সব আশ্রয়। বউদি আর তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিন কাটে, তবে পরমশরণ তো ওই মূর্তিটি। ধুপধুনো দিয়ে সন্ধে প্রদীপটি ঠাকুরের সামনে রেখে প্রণাম করে উঠতে না উঠতেই একজন চেনা লোক ছুটতে ছুটতে এসে বললে—

হয়ে গেল, সব হয়ে গেল।

কী হয়ে গেল রে?

সেই লোকটা শেষ হয়ে গেল।

কোন্ লোকটা রে?

ঠনঠনে কালীবাড়িতে লোকটা পুজো দিতে গিয়েছিল। পুজো দিয়ে লোকটা ফিরে দাঁড়াল, তারপরে বুক চেপে হঠাৎ করে পড়ে গেল, আর তারপরেই অজ্ঞান। ছুটোছুটি লোকজনের। একটা ডাক্তার এল, নাড়ি ধরে বলে দিলে—শেষ।

কিন্তু, লোকটা কে বল?

সেই মোটা লোকটা, সন্ন্যেসী ছিল—এখন মেজকুমার হয়েছে, সেই লোকটা।

ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল বিভাবতীর। তারপরে ঠাকুরের সামনে লুটিয়ে বললেন, ঠাকুর তুমি আছ তাহলে।

প্রিভি কাউন্সিলের মামলা জেতার খবর নিয়ে টেলিগ্রাম ৩১ জুলাই কলকাতায় পৌঁছনোর পরের দিনই মেজকুমারের একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে পুজো দিতে গিয়ে মন্দির চত্বরেই, তারপর ৩ আগস্ট সব শেষ। ভেবেছিলেন এ মাসের মাঝামাঝি একবার জয়দেবপুরে গিয়ে বন্ধু-স্বজন আর প্রজাদের সঙ্গে দেখা করে আসবেন।

যাওয়া আর হল না। জাল, আসল—সব সমস্যার সমাধান।

১০ আগস্ট ভাওয়াল এস্টেটের ম্যানেজারকে কলকাতা থেকে একটা

টেলিগ্রাম পাঠালেন ধারাদেবী—'স্বামী শনিবার ৩ আগস্ট মারা গেছেন। ১৩ আগস্ট মঙ্গলবার শ্রাদ্ধ, দয়া করে মাধবভোগ সহ ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা করবেন। সকলের সহযোগিতা নিয়ে গরিবদের প্রত্যেকদের চার আনা করে চিড়াগুড় দেবেন।' ম্যানেজারবাবু সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রামে উত্তর দেন যে, প্রয়াত কুমারের তহবিল থেকে টাকা তুলতে পারছি না সেজন্য ১৩ আগস্ট ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রভোজনের ব্যবস্থা করতে অপরাগ।'

শ্রাদ্ধ হল কলকাতাতেই ১৩ তারিখে। এর ঠিক তিন দিন পরেই চার দিন ধরে কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল—দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এ হাজার চারেক লোকের মৃত্যু হল। মেজকুমারের ধর্মতলায় কেনা বাড়িটার চারপাশেই দাঙ্গা বেশি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ধারাদেবী তখন ছিলেন মানিকতলায়, সেখানেও দাঙ্গা প্রবল আকার নেয়। তবুও মাসখানেক পরে কুমারের মৃত্যুর একমাস পূর্ণ হলে জয়দেবপুরে লোকজন খাইয়ে কুমারের আত্মার শান্তি প্রার্থনার জন্যে টাকাকড়ি নিয়ে প্রফুল্ল মুখোটি নামে একজন উকিলকে পাঠিয়ে দিলেন। সাধারণের কাছে কুমার জীবিত রইলেন।

বিভাবতী বেঁচে ছিলেন এরপরে আরও প্রায় বিশ বছর। সব কোর্টে হেরে গিয়ে শেষে ভগবানের আদালতে জিতে গিয়েছিলেন বলে মনে মনে একটা স্বস্তি পেতেন। কাশীর গণকেরা তো তাকে বলেই দিয়েছিলেন প্রিভি কাউন্সিলের মামলাতেও তিনি হেরে যাবেন। কিন্তু তাঁরা এও বলে দিয়েছিলেন—অন্য লোকটাও সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে না—সেই কথা তো ঠিক হল! আর সেই জেদি মহিলা তাঁর জেদ বজায় রাখলেন যখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডস রমেন্দ্রনারায়ণের সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করে তাঁর বিধবা হিসেবে ৮ লক্ষ টাকা তাঁর হাতে তুলে দিতে গেলেন। শুনে বিভাবতী কী বলেছিলেন জানেন?—বলেছিলেন—'সেই লোকটার বিধবা ভেবেই আপনারা ওই টাকা আমাকে দিতে চাইছেন? আমি যদি টাকা নিই, তাহলে আমি যাকে মিথ্যে বলে মনে করে এসেছি সেই মিথ্যাকেই কি মেনে নেওয়া হবে না?' তিনি সেই টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কী বলবেন—জেদ, মহত্ত্ব, নির্লোভ! স্বতন্ত্র নারী তো বটেই।

চ

জয়দেবপুরে ভাওয়াল রাজবংশের রাজবাড়ি। চত্বরে বড়োদালান ছাড়া মাধববাড়ি, তারাবাড়ি, খাজাঞ্চিখানা, নাটমন্দির, রাজবিলাস বাড়ি—নাটমন্দিরের দু-পাশে ফাঁকা জমি। দূরে মাধববাড়ি-তারাবাড়ি লাগাও বড়ো পুকুর। এখানেই রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের জন্ম। এখানেই তাঁর ছেলেরা বড়ো হয়েছেন। এখানেই যত আশ্রয় দানধ্যান, এখানেই আবার কত নারীর অসম্মান, মদ্যপানের আসর, নানান ষড়যন্ত্র!

এখন এখানে গাজিপুর জেলার নানান সরকারি অফিসের দপ্তর। বড়ো দালানে একদা সাহেবদের অতিথিশালায় কত বিদেশি এসেছেন, থেকেছেন, শিকারে গেছেন, পোলো খেলতে গেছেন—সেখানে গাজিপুরের ডেপুটি কমিশনারের অফিস। কুমারদের বাসকক্ষগুলিতে পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের নানান করণ। মার্বেলের মেঝের গৌরব উধাও। দামি সেগুনকাঠের বেনাগাল দরজাগুলো ঝুলে পড়েও পুরনো গরিমা ঘোষণা করছে যেন—তবে বড়ো অসহায় ওরা। নাটমন্দিরের পিছনে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের দপ্তর। রাজবিলাস এখন দলিল লেখকদের দপ্তরখানা। তার পিছনেই গাজিপুরের থানা। বিশাল লোহার গেটগুলোতে রাজমহত্ত্বের ছোঁয়া বুঝি এখনও। যে পোলো গ্রাউন্ডে হাতির পিঠে চড়ে সন্ন্যাসীবর বিপুল জনসমাবেশে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন, সেটি এখন একটি ফুটবল স্টেডিয়াম—বুঝি খেলার ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্যেই।

আহিশান মঞ্জিলের অনতিদূরে বুড়িগঙ্গার তীরের লালগোলা হাউস একটি জাদুঘর। ১৯নং ল্যান্সডাউন রোড এখন একটা লাক্সারি অ্যাপার্টমেন্ট—সেই বারান্দা আর কৃষ্ণচূড়া গাছকে মাথা কুটলেও দেখতে পাবেন না। সত্যেনবাবুর অধস্তন পুরুষ এখন পাশের রাস্তার একটি বাড়িতে বসবাসরত—তাঁরা হয়তো বিভাবতীর পরম স্নেহ, অভ্রভেদী সম্মানবোধ আর বুকজোড়া স্নেহের কথা সগৌরবে স্মরণ করেন।

দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়ে 'স্টেপ অ্যাসাইড' বাড়িটা যদি দেখতে চান (এখানেই তো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শেষ নিঃশ্বাস পতিত হয়েছিল) তবে দেখবেন এই

সরকারি বাড়িতে একটা প্রসূতিসদন হয়েছে। এখানে কেউ ভাওয়াল রাজ পরিবারের কথা কান পেতেও শুনতে পাবেন না, দেশবন্ধুর মৃত্যুফলক দেখে দেশের গৌরবে গৌরবান্বিত হবেন। আর যদি সত্যিই ভাওয়াল পরিবার আর মেজকুমার-মেজরানির কথা জেনে গিয়ে থাকেন—তবে আপনার হয়তো নিঃশ্বাস পড়বে আক্ষেপে—এখানের প্রসূতিসদনের মায়েদের মতো যদি ওঁদেরও একটা সন্তান থাকত—তাহলে হয়তো জাল রাজাব কাহিনি এমন করে গড়ই উঠত না। গড়ে উঠত না তাকে নিয়ে সিনেমা আর যাত্রার পালা।

ভাওয়াল রাজবংশ

গোলোকনারায়ণ
স্বর্ণময়ী (কন্যা)
কালীনারায়ণ+স্ত্রী-১. ব্রহ্মময়ী ২. জয়মণি ৩. সত্যভামা
কমলকামিনী (স্বামী-যদুনাথ)
মোক্ষদা
রাজেন্দ্রনারায়ণ+বিলাসমণি কৃপাময়ী+বিলাস মুখার্জি
লালু (কন্যা) ওরফে সরোজবাসিনী
গণেশ (ইন্দু) সুরেন্দ্রবালা শৈবলিনী
মতি
+
ভোতা ফণী ব্যানার্জি
সুরমা ক্ষিতীন্দ্র জিতেন্দ্র টেবু
(কেনি) (জবু) (বিল্লু)
+
বীরেন্দ্র ব্যানার্জি
ইন্দুময়ী জ্যোতির্ময়ী রণেন্দ্র রমেন্দ্র রবীন্দ্র তড়িন্ময়ী (মটর)
+ + + + + +
গোবিন্দ মুখার্জি
জগদীশ মুখার্জি
সরযূ
বিভাবতী
আনন্দকুমারী
ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়
রামনারায়ণ (দত্তক)
পুত্র (নাম অজ্ঞাত)
প্রমোদবালা
+
সতীনাথ ব্যানার্জি (সাগর)
জলদ (বুদ্ধ)
বিভুবালা (হেনি)
+
বিভূতি
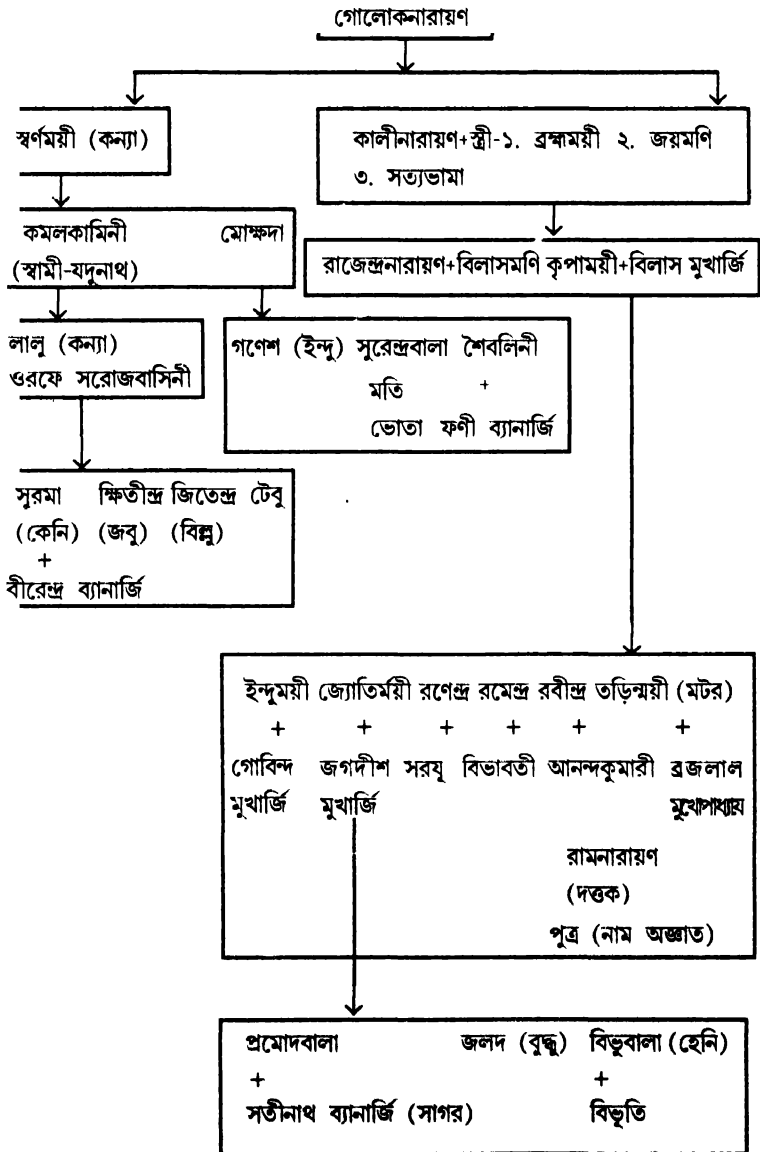
পরিশিষ্ট ১

১৯০৯ সালের মে থেকে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সন্ন্যাসীর জীবন

এই সময়ের মধ্যে কুমারের নাম শোনা যায় নাই বা কোথায় আছেন তাহাও জানা যায় নাই। কুমার জীবিত আছেন এই গুজব থাকা সত্ত্বেও কেহ তাহাকে জীবিত বলিয়া মনে করে নাই। আমি উপরে এই সময়ের যে বর্ণনা দিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে কুমারের মৃত্যু সর্বজন স্বীকৃত ঘটনা। বাদী নিজের এই সময়ের যে বর্ণনা দেয় তাহা কেবল তাহার নিজের ও দর্শনদাসের কথার উপরই নির্ভর করে। ইহাতে অন্য ভাবে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহার কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি করে না। তাহার এই বর্ণনার জন্যই সে মেজকুমার বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা নহে—সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা এইরূপ।

পাহাড়ের মধ্যে—জঙ্গলের ভিতর এক কুটীরের মধ্যে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে, এবং নিজেকে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখেন—এই চারিজন সন্ন্যাসীর নাম তিনি বলিয়াছেন। 'আমি এই স্থানে ১৫/১৬ দিন ছিলাম। এই সময় সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয় নাই। তারপর কি হইয়াছিল তাহা আমার মনে নাই। আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই চলিলাম। আমরা হাঁটিয়া ও রেলে করিয়া গিয়াছিলাম। তারপরে যাহা আমার মনে পড়ে তাহা এই যে—আমি বারাণসীতে অসিঘাটে ছিলাম। সন্ন্যাসী চারিজন তখনও আমার সঙ্গে ছিলেন। অসিঘাটে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করিতাম। এখানে আমাদের পশ্চিমা ও বাঙ্গালী সাধুদের সঙ্গে দেখা হয়। দুই জন বাঙ্গালী সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। আমি তাহাদের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলাম, বাঙ্গালাতেই কথা বলিয়াছি। পশ্চিমা সাধুর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলিয়াছি। আমি ওই সাধু চারিজনের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলিতাম—তাঁহারা আমার সঙ্গে হিন্দিতে বলিতেন। সেই সময় আমি কে, সে স্মরণশক্তি আমার ছিল না।

তাঁহার ভ্রাম্যমান জীবনের বাকী অংশ—এক তীর্থ হইতে অন্য তীর্থে ঘুরিয়াই কাটাইয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে কাশ্মীরে অমরনাথে পৌছেন। ইহা অসিঘাটের চারিবছর

পরে। এখানে তিনি মন্ত্র লইয়া গুরু ধরমদাস নাগার শিষ্য হন। যে চারিজন সন্ন্যাসীর সহিত তিনি ঘুরিতে ছিলেন ধরমদাস তাহাদের একজন। নবনগর বাজারের এক উল্কিওয়ালাকে দিয়া তাঁহার গুরুর নাম বাহুতে লিখাইয়া লন। শ্রীনগর হইতে বহু স্থান ঘুরিয়া নেপালে আসেন। নেপালে পশুপতিনাথ হইতে তিব্বতে যান এবং পুনরায় নেপালে ফিরিয়া আসেন,—এখানে এক বৎসর বাস করেন। কিন্তু নেপাল ত্যাগের পূর্ব্বে ব্রাহোচ্ছত্তরে একটা কিছু ঘটনা হয়—এখানে তিনি সেই চারিজন সন্ন্যাসীর সহিত বাস করিতে ছিলেন। "এখানেই মনে হয় যে আমার বাড়ী ঢাকায়।"

এখানে তাঁহাকে এর পূর্ব্বের মানসিক অবস্থার কথা বর্ণনা করিতে বলা হইল। তিনি যাহা বলিলেন তাহা এই যে—অসিঘাট পর্য্যন্ত তিনি অজ্ঞান ছিলেন। এমনকি অমরনাথেও আমি মনে করিতে পারি নাই যে, আমি কে, আমার বাড়ী কোথায় এবং আমার আত্মীয় স্বজনই বা কোথায়"? মন্ত্র লওয়ার পরে তাঁহার গুরুর সঙ্গে এবিষয়ে কথা হইয়াছিল এবং তিনি (গুরু) বলিয়াছিলেন। যে তাঁহাকে ভিজা অবস্থায় দার্জ্জিলিং-এর শ্মশানে পাওয়া গিয়াছিল। যখন তিনি নিজে চিন্তা করিতেন তিনি কে, তাঁহার আত্মীয়েরা কোথায়, তখন তাঁহার মন আকুলিত হইয়া উঠিত এবং তিনি গুরুকে একথা বলিতেন,— তখন গুরু বলিতেন, ঠিক সময় আসিলে আমি তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যদি তিনি সংসার ও বাড়ীর মায়া ত্যাগ করিয়া গুরুর কাছে ফিরিয়া যান তাহা হইলে তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া হইবে। তারপর ব্রাহোচ্ছত্তরে যখন তাঁহার এইটুকু স্মৃতি ফিরিয়া আসিল যে, তাঁহার বাড়ী ঢাকায় তখন তাঁহাকে বাড়ী যাইতে বলা হইল, এবং তিনি একাকী রওনা হইলেন। তারপর বহু স্থান ঘুরিয়া ঢাকায় পৌছেন। "যখন ঢাকা স্টেশনে নামিলাম তখন আমার মনে হয় যে এস্থানে আমি বহুবার যাতায়াত করিয়াছি এবং জিজ্ঞাসা না করিয়া বাক্‌লাণ্ড বাঁধের রাস্তা ধরিলাম!"

তারপর যে সকল ঘটনা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—তাহা আরম্ভ হইল। জয়দেবপুরে তাঁহার প্রথম আগমনের সময়—যখন তিনি ঘুরিতে ছিলেন—"তখন আমার কাছে সমস্তই পরিচিত বোধ হইল"।

এর পূর্বে বাক্‌লাণ্ড বাঁধে যে সমস্ত লোক তাঁহার কাছে আসিয়া বলিত 'এই ভাওয়ালের মেজোকুমার' তাহাদের কোনো কোনো লোককে তিনি চিনিতে পারিতেন। জয়দেবপুরে প্রথমবার যাওয়ার সময়ই তাহার পূর্ণস্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসে।

এই সমস্তই অদ্ভুত মনে হয়—কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এই সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করিয়া তাঁহাদের প্রামাণ্যগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেগুলিও

এই ঘটনা অপেক্ষা কম অদ্ভুত নয়। যুদ্ধের পর এই রকম রোগীর চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। এইগুলিকে ওয়ার নিউরোসিস নামে অভিহিত করা হয়। বসন্ত বা চুলকানি প্রভৃতি রোগে যেমন কোনও রহস্য নাই ইহাতে তেমনি কোনও রহস্য নাই। উভয় পক্ষ হইতেই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ চিকিৎসক আনা হইয়াছে। বাদীর পক্ষে রাঁচীর ইউরোপীয় পাগলা গারদের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট লেঃ কঃ হিল, আই এম, এস, এম, ডি, এম, এ, জবানবন্দী দিয়াছেন যে তিনি ত্রিশ বছর ধরিয়া মানসিক বিকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছেন। বিবাদিপক্ষে মেজর ধুন্‌জি ভাই আই, এম, এস, এম-বি, বি, এস, (বোম্বাই) এবং মেজর টমাস আই. এম, এস, জবানবন্দি দিয়াছেন। শেষোক্ত জনের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি ইংলণ্ডে শেল 'শকের' অনেক রোগী চিকিৎসা করিয়াছেন। মেজর ধুঞ্জি ভাই যে সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে একখানা Dr. Taylor's Reading in Abnormal Psychology and Mental Hygiene (১৯২৭ সংস্করণ)। এই বই-এর কথা উভয় পক্ষই বলিয়াছেন এবং ইহাতে বিপুল পর্যবেক্ষকের দেখা অনেকগুলি দৃষ্টান্তের কথা আছে। এই বই হইতে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি একত্র করা দরকার দেখিনা। কারণ যে সকল বিশেষজ্ঞকে এখানে জেরা করা হইয়াছে—তাহাদের মতানৈক্য দেখা হয় না। যেখানে তাঁহারা একমত নন সেইগুলিই আমি দেখাইব। এই স্মৃতিভ্রংশদোষ বা এ্যম্‌নেসিয়ার কোনো বাহ্যিক বা শারীরিক হানি না করিয়াও ঘটিতে পারে। এই গোলমালটাকে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে,—ইহা অসংখ্য প্রকারের। ইহার গবেষণা পর্যবেক্ষণ ছাড়াইয়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ইহার কতকগুলি ব্যবহারিক শ্রেণিবিভাগ করা হইয়াছে। ইহার এমন কোনো মূল সূত্র নাই যাহাদ্বারা পূর্বে হইতেই বলা হইতে পারে যেকোনো একটি অস্বাভাবিক মানসিক বিকৃতি—কীরূপে আরম্ভ হইবে, বৃদ্ধি পাইবে ও শেষ হইবে।

তবে কতকগুলি বিভাগ মোটামুটিভাবে দেখা যায়। এইগুলি (১) Regression or পশ্চাদ্বর্ত্তন (২) Double or multiple personality অর্থাৎ একই লোকের বিভিন্ন সময়ে দুই বা ততোধিক লোক বলিয়া ভ্রান্তি। প্রথমোক্তটির সুপরিচিত দৃষ্টান্ত রেভারেণ্ড্ 'হানা'র (Hanna) ঘটনা। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি মনে করিলেন যে তিনি সদ্যপ্রসূত শিশু। স্থান কাল পাত্রের সমস্ত ধারণাই তাহার চলিয়া গেল। ইহাকে Baby State বা শৈশবাবস্থা—প্রাপ্তি বলা যাইতে পারে। এই ঘটনাটি Sidis and Good heart's Multiple Personality তে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। পুনরায় সদ্যপ্রসূত শিশু অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন, সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রংশের একটি দৃষ্টান্ত। এইরূপ ঘটনা খুবই বিরল এবং বোধ হয় এই একটি দৃষ্টান্তই এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় রকমটিকে দ্বৈতীভাব বা double personality বলা যাইতে পারে। ইহাও এক রকমের পশ্চাদ্বর্ত্তনই বটে। ইহাতে মানুষ সাধারণতঃ স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করে—কিন্তু সে যে কে তাহা ভুলিয়া যায়। ইহার পরিচিত দৃষ্টান্ত রেভারেণ্ড এনসেল বোর্ণ (Rev. Ansel Bourne) এবং শেলশকের কতকগুলি রোগী। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে আমরা দেখিতে পাই এই লোক এক সময় মনে করে যে সে একজন, আবার অন্য সময় মনে করে সে আর একজন। কিন্তু এই যে কল্পিত দুইজন ইহাদের কেহই কাহাকে চিনেনা। জেম্‌সের Principle of psychology-তে ফেলিডা লিওলিনের ঘটনা ডা. প্রেথের গ্রন্থে মিস্‌ রোকাম্প-এর ঘটনা এই রকম ব্যাপার। এই সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিলেও মেজর টমাসের অভিমত এই যে বাদীর ব্যাপারটা তাঁহার নিজের বর্ণনা অনুসারে double personality-র ব্যাপার—অর্থাৎ তিনি অন্য অন্য ব্যাপারে স্বাভাবিকই ছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তিনি কে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন? Rev. Ansel Bourne একদিন হঠাৎ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, এবং দুই মাস পর Pensylvania শহরে Brown নামে এক দোকান খুলিয়া বসিলেন। (Morton Prince-এর Dissociation of Personality-র ১৮৬ পৃঃ) ঐ গ্রন্থেরই ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্ঠায় মি. চার্লসের ঘটনা উল্লিখিত আছে। তিনি একটি ট্রেন সংঘর্ষের ১৭ বছর পরে (যখন তিনি বিবাহিত ও ৪টি সন্তানের পিতা) কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না যে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর নয়। (২৪ বৎসর বয়সে এই রেলওয়ে এ্যাক্‌সিডেন্ট হইয়াছিল)। Tennet--এর বইয়ে আছে Roy যথার্থ কে তাহা ভুলিয়া গেল এবং নানারকম কাজকর্ম্ম করিয়া ৪ মাস পর তাহার জ্ঞান হইল। বাদীর বিবরণ এই যে তিনি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হইয়া ১২ বছর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাস করিলেন। তারপর একদিন তাঁহার মনে হইল তাঁহার বাড়ী ঢাকা এবং ঢাকা আসিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার পূর্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন।

মেজর টমাস মনে করেন বাদীর বিবৃতিতে এমন কতগুলি জিনিস আছে যাহা অসম্ভব। প্রথম বৎসর দার্জিলিং হইতে অসীঘাট যাওয়া সময় তিনি যে অবস্থায় ছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—"জ্ঞান ছিল না—বা এই রকম কিছু"—উহা পশ্চাদ্বর্ত্তন—উহা dissociation এবং adoptation-এর সহিত একসঙ্গে চলিতে পারে না, তাহা হইলেই বলা যায় Rev. Hanna-র ন্যায় তিনি শিশু হইয়া গিয়াছিলেন—Ansel Bourne-এর মতো তিনি দোকান করিতে পারিতেন না। দ্বিতীয়ত, তিনি আশা করিতে পারেন না যে আদিম বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার স্মৃতি আরও ভালরূপে ফিরিতে পারে। তৃতীয়ত, এইরূপ মানসিক ভাবের একতা (dissociation) সাধারণ রকমের নয়। প্রায়ই ইহা হিষ্টিরিয়ার ন্যায় স্নায়বিক রোগীদের হইয়া থাকে। মেজর ধুঞ্জি ভাই

কার্যত এই মতই দেন। লেঃ কেঃ হিলের মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞতা আছে তিনি বলেন বাদীর বর্ণনায় কিছুই অসম্ভব নয়।

বাদী শৈশব অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন, এই অভিমত সম্বন্ধে বলা যায়—যদি তাহাই হইত—তাহা হইলে তিনি প্রকৃতিস্থ না হইয়া অপ্রকৃতিস্থ হইতেন, ইহাই টঠোলজির মত। তিনি যে শৈশবাবস্থায় ফিরিয়া ছিলেন, বাদী একথা বলেন না। সেটা যে কি অবস্থা তাহা তিনি বলিয়াছেন—তিনি ইহাকে অজ্ঞান অবস্থা বলিয়াছেন। এবং জিনিসপত্র চিনিতে পারিতেন—পাহাড় গাছ, সন্ন্যাসী ঘাট এইরূপ জটিল পদার্থগুলিও চিনিয়াছেন—কেবল দার্জ্জিলিং হইতে অসিঘাট পর্যন্ত বিষয়ের অভিজ্ঞতার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বা অন্য কেউ যে তাহার মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিতে পারেন এ আশা আমি করি না। তাঁহার বিবরণ হুবহু ও কঠোরভাবে মানিয়া লওয়া স্বাভাবিক, তবে তিনি যেভাবে বিবরণ দিয়াছেন ঠিক সেইভাবে দেখিলে—ইহা যে শৈশবাবস্থাতে ফিরিয়া আসা বলা যায় না। ইহা পশ্চাদ্বর্ত্তনের শেষতম দৃষ্টান্ত। ইহাতে যে ক্রমবিভাগ নাই এ বিষয়ে আমি মেজর ধুঞ্জি ভাইয়ের সহিত একমত নহি। মেজর টমাস বলেন "স্মৃতিভ্রংশের সময়ে পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে উদাসীনতা অনেক রকমের হইতে পারে। অর্থাৎ এরূপ লোক দেখা যায়, মানসিক সুস্থতা যে ন্যূনাধিক বিশৃঙ্খল চিত্ত হইয়াও সম্পূর্ণ উদাসীন নহে, আবার এই রকম লোকও আছে যে অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াও মানসিক জীবনে বড়োই বিশৃঙ্খল। এই দুই অবস্থার মধ্যে অনেক রকম মানসিক অবস্থা দেখা যায়। এমন কোনো নিয়ম নাই যে এক জনই এ সকল অবস্থার মধ্যে দিয়া যাইতে পারে না। টেলারের বইয়ের ৩০৮ পৃষ্ঠায় সৈন্যদের পশ্চাদ্বর্ত্তনের চারিটি দৃষ্টান্ত আছে। প্রথম দৃষ্টান্তটিতে একটি ১৫ মাস বয়স্ক শিশুর অবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিল কিন্তু সে সিগারেট ধরাইতে পারিত, এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে "পশ্চাদ্বর্তনের"ও কমবেশী আছে। হানার (Hanna) মত দৃষ্টান্ত অতি অল্প। এ বিষয়ে আমি একটা অনুচ্ছেদ তুলিয়া দিতেছি।

"বিগত যুদ্ধে সৈন্যদের মধ্যে সম্পূর্ণ "স্মৃতিভ্রংশ দোষ" সাধারণ ব্যাপার ছিল আমার চিকিৎসাধীনে এরূপ অনেক রোগী পাইয়াছি। সাধারণ রকমটিকে এই বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে যে রোগী তাহার পূর্ব জীবনে অভিজ্ঞতার অনেক কাজই ভুলিয়া যাইত, চেষ্টা করাইয়াও কাজ করানো যাইত না, এই অবস্থায় একটি সৈনিক তাহার নাম, রেজিমেন্টের নম্বর, সে বিবাহিত কিনা কোথায় বাস করিত, কি কাজ করিত অথবা পূর্বজীবনের কোনো ঘটনা বলিতে পারিত না। অথচ পারিপার্শ্বিক বিষয় সমূহে তাহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল সাধারণ লোকের ন্যায় সাধারণ জিনিস ব্যবহার করিত—এবং সাধারণ

লোকের ন্যায় লিখিত ও কথা ও ভাষা বুঝিতে পারিত। কতকগুলি বিষয়ে তাহার স্মৃতিভ্রংশতা ছাড়িয়া দিলে সে এমনি সাধারণ লোকের ন্যায় ব্যবহার করিত যে কোনো অপরিচিত লোক তাহার আচারব্যবহার দেখিয়া তাহাতে কোনো কিছু অদ্ভুত আবিষ্কার করিতে পারিত না।" আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এসকল দৃষ্টান্ত দ্বারা কোনো মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না। দর্শনদাস যে বৈশিষ্ট্য বা বোকা বোকা ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছে তাহা পূর্বোক্ত ব্যাপারের মতো সামান্য উদাসীনতার ফল যে নহে তাহা আমি খুজিয়া পাই না। এই সকল ব্যাপারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তগুলি সংখ্যায় খুব কম। বেশীর ভাগ দৃষ্টান্তই মাঝামাঝি রকমের। দৃষ্টান্তগুলি নানা প্রকৃতির। একটি নিয়মের দ্বারা ইহাদিগকে ভালো করা যায় না। স্মৃতিভ্রংশের কাল কয়েক দিনও হইতে পারে, আবার কয়েক বৎসরও হইতে পারে। চার্লসের ব্যাপারে তাহা ১৭ বছর পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, এবং যখন মানুষ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে তখন তাহার পূর্ব্ব অস্বাভাবিক অবস্থার কথা কিছুই মনে থাকে না—এই অভিমতটি সর্ব্বথা স্বীকার্য্য নহে। রেভারেণ্ড হেনা (Rev. Hanna) তাহার স্মৃতিভ্রংশের কাল সম্বন্ধে আত্মজীবনী লিখিয়াছেন। স্বাভাবিক এ অস্বাভাবিক অবস্থায় এ ব্যবধান চিন্তা দ্বারা অতিক্রম করা যায়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে এমন কোন নিয়ম বা সূত্র নাই যাহা দ্বারা বাদীর বিবৃত ঘটনাকে অস্বীকার করা যায়। (মাধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়া বাদীর শূন্যে উড়িয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব এই নিয়ম এমন নহে)। সচরাচর দেখা গেলেও স্নায়বিক রোগ যে থাকিবেই এমন কোনো কথা নাই, এবং কুমারের সম্বন্ধে—এ সম্বন্ধে কেহই কোনো প্রশ্ন তুলেন নাই। মি. চৌধুরী সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলিয়া ছিলেন যে বাদীর ব্যাপারে এই সমস্ত অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়া ছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার কি কারণ থাকিতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, দার্জ্জিলিং হইতে এ পর্যন্ত অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য বাদীর যথার্থ পরিচয় করা নয়,—কিন্তু অন্যান্য ঘটনার সাহায্যে বাদীব পবিচয যেভাবে সাব্যস্ত হইয়াছে ইহা তাহার বিরোধী কি না?

ইহা যদি একবার প্রমাণিত হয় তাহা হইলে দার্জ্জিলিং হইতে ঢাকায় আগমন পর্য্যন্ত এমন কিছুই ঘটে নাই যাহাতে এই সিদ্ধান্ত অন্যথা হইতে পারে এবং একবার পরিচয় প্রমাণিত হইলে প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী বলিয়া তাহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। বস্তুতঃ ইহা কোনো নিয়মেরই বিরোধী নহে।

বাদী কি হিন্দুস্থানী?

আমার ইহা মনে হয় না দেখিতে মেজকুমারের মতো, তাঁহারই শরীরের চিহ্নগুলি লইয়াও ঢাকা আসিবার পূর্ব্বে মধ্যমকুমার কি রকম করিয়া নাম সই করিতেন তাঁহা অভ্যাস করিতে থাকে। এ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার।

বলা হইতেছে যে বাদী একজন পাঞ্জাবী। বিবাদী পক্ষ ইহার অধিক কিছু প্রমাণ করিতে বাধ্য নহেন। বাদীর যথার্থ পরিচয় কি তাহা প্রমাণ করিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন, তবুও এই মকোদ্দমায় বাদী যে পাঞ্জাব লাহোর জেলার—আজলা গ্রামের মালসিং তাঁহার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু এই ব্যাপারের উপর তেমন জোর দিয়া কিছু বলা হয় নাই এবং বাদী আজলা গ্রামের মালসিং কিনা; অথবা ধর্মদাস নাগা তাহাকে সন্ন্যাসী করার পর তাহার নাম সুন্দরদাস হয় কিনা ইহা বাদীকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে প্রমাণ বুঝিতে হইলে ১৯২১ সালে কি ঘটিয়াছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। বাদী ৪ঠা মে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। ওই মাসেরই ৬ হইতে ৯ তারিখের মধ্যে সত্যবাবু মি. লেথব্রিজের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। সেখানে মৃত্যুর এফিডেভিড তাহাকে দিয়া মৃত্যু সম্বন্ধীয় প্রমাণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। মৃত্যুর এফিডেভিটের একখানা নকল ঢাকার কালেক্টর মি. লিণ্ডসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং মি. লিজের পরামর্শ অনুসারে ইংলিশ-ম্যান পত্রিকায় একখানা চিঠি লিখিলেন, ৯ মে উহা ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং খুব বিলম্ব হইলেও ৮ মে তিনি উহা পত্রিকায় পাঠাইয়াছিলেন। তারপর ১৫ মে'র পূর্ব্বেই তিনি দার্জ্জিলিং গিয়া ১৯০৯ সালের ৯ তারিখে যে শবদাহ হইয়াছিল তাহার সাক্ষী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ২৯ মে বাদী মি. লিণ্ডসের নিয়ে উপস্থিত হইয়া তদন্তের প্রার্থনা জানান। ৩১ মে তারিখে সাব্ ইনস্‌পেকটার মমতাজউদ্দিন এবং সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে ষ্টেটের একজন আমলা বাদীর পরিচয় বাহির করিবার জন্য পাঞ্জাবে চলিয়া গেলেন। মি. লিণ্ডসে ইহা জানিতেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি এই তদন্তের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

১৯২১ সালের ২৭ জুন সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাঞ্জাব হইতে ভাওয়ালের অ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজারের নিকট এক রিপোর্ট পাঠান। (এক্‌জিবিট ৩৪৭) ওই রিপোর্টে তিনি বলেন।

তাঁহারা (সুরেন্দ্র ও মনোমোহন বাবু)—সাব ইন্‌স্‌পেক্‌টার মম্‌তাজউদ্দিন মনোমোহনবাবু নাম লইয়াছিলেন) এ তদন্তের জন্য কলিকাতায় আসেন এবং সেখান হইতে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া হরিদ্বারে পৌছেন। হরিদ্বারে সুরেন্দ্রবাবু শুনিতে পান যে কনখলে হীরানন্দ নামে একটি সাধু আছে। "আমি তাঁহাকে ফটো দেখাই। ফটো দেখাইবামাত্রই তাঁহার চেলা বলিয়া উঠে এটা ধরমদাসের একজন চেলা সন্তদাসের ফটো।" ওইদিন মম্‌তাজউদ্দিন এবং তিনি অমৃতসর চলিয়া যান এবং অমৃতসর সংগওয়ালা আখড়ায় এ ফটো হীরানন্দ ও তাহার চেলা সন্তরামকে দেখান। ইহা দেখিয়া সন্তরাম বলে যে ইহা ধরমের শিষ্য সুন্দরদাস বাবাজীর ফটো।

তারপর তাঁহারা অমৃতসর হইতে ২০ মাইল দূরে 'ছোটো সংসার' গেলেন এবং সেখানে ধরমদাসের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন যে ধরমদাস সেখানে আছেন।

জয়দেবপুরের সাধুর ছবি দেখিবামাত্রই ধরমদাস চিনিলেন এবং ধরমদাসের আর একজন চেলা দেবদাস, তিনিও চিনিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলিলেন যে ইহার নাম সুন্দরদাস।" প্রায় ১৫ বছর আগে লাহোর আজলা গ্রামের নারায়ণ সিং সুন্দরদাসকে ধরমদাসের নিকট লইয়া আসে। তখন তাহার বয়স ১৫। সে ধরমদাসের শিষ্য হয়। সুন্দরদাসের পিতামাতা কেহই জীবিত নাই। নারায়ণ সিং "মণ্টগোমারী জেলায় ৪৭নং চকে বাস করে। ১৭-৬-২১ তারিখে ধরমদাস, দেবদাস, বিসণ দাস, চিরণদাস, সন্তদাস—৭/৮ জন লোককে ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে উপস্থিত করিয়া সুন্দরদাসের ছবি সনাক্ত করিতে বলা হয। জয়দেবপুরের সাধু যে একজন পাঞ্জাবী এ আর বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

রিপোর্টে বলা হয় যে "সংসারে" আসিয়া ধরমদাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারিলাম তাহা এই—তাহার অনেক চেলা আছে—তাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া টাকা রোজগার করে ও পাঠাইয়া দেয়; ধরমদাস নিজেও নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার বয়স প্রায় ৫৫, গায়ের রং কালো—মাথায় জটা আছে, দাড়ি আছে। ধরমদাস আমাকে বলে যে প্রয়াগের কুম্ভমেলা হইতে ৩/৪ বছর আগে সুন্দরদাস কলিকাতার দিকে রওনা হয়। তাহার বয়স প্রায় ৩০। তাহার কটা গোঁফ ও কটা দাড়ি আছে। সুন্দরদাস তাহার সঙ্গেই থাকিত।

রিপোর্টে একটি পুনশ্চ দিয়া বলা হইয়াছে "সুন্দরদাসের আসল নাম ও তাহার পিতামাতার নাম জানা যায় নাই, কেবল তাহার বাপের নাম জানিতে পারা গিয়াছে।

ফণিমোহন বসু ল্যাংঠিপরা সাধুর যে ফটো দিয়াছিলেন তাহা যদি জয়দেবপুরের সাধুর ফটো হয় তবে এ নিশ্চয়ই সুন্দরদাস।"

এইত রিপোর্ট—তদন্তের ফল, মেজরাণী ৪/৭/২১ তারিখে ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়া জানান। টেলিগ্রাফটি এইরূপ—"যাঁহা আশা করা গিয়াছিল সেই ভাবেই পূর্ববর্ত্তী ঘটনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।"

২/৭/২১ তারিখে ম্যানেজার মি. লিণ্ডসের নিকট সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রিপোর্টের ইংরেজী অনুবাদ পাঠাইয়া দিয়া লেখেন তাহারা লোকটির প্রকৃত পরিচয় খুঁজিয়া বাহির করিবার সূত্র আবিষ্কার করিয়াছে। আরও লেখা যায় যে "বোর্ড শবদাহ সম্পর্কে ভালো প্রমাণ পাইয়াছেন এবং সাধুর প্রকৃত পরিচয় সত্বরই জানা যাইবে। নোটিশের অংশবিশেষ পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যদি কোনো সংকল্প হইয়া থাকে তবে তাহা পুনরায় বিবেচনা করা দরকার" (একজিবিট ৩৮৮)

উল্লিখিত নোটিশ বাদীকে জাল বলিয়া ঘোষণা করার—৩/৬/২১ তারিখের নোটিস। বাদীর পূর্ব্ববর্তী ঘটনার অনুসন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া যে তার করা হইয়াছিল তাহার কারণ মমতাজউদ্দিন—১/৭/২১ তারিখে আজলা গিয়া বাদী মালসিং বলিয়া—ধরমদাস ২৭/৬/২১ তারিখে যে খবর দিয়াছিল তাহার সত্যতা করিয়া আসিয়াছেন। এই টেলিগ্রামের পরেও ইহা কিছুতেই বলা চলে না যে সত্যবাবু এই তদন্তের কথা কিছু জানিতেন না। তাঁহার নিকটই তদন্তের ফল প্রথম আসিয়াছিল—আর ইহা অস্বাভাবিকও নয়।

২৭/৬/২১ তারিখে ধরমদাস নাগা নামে একজন লোক (ইহাকে আমি ২নং ধরমদাস বলিব—এবং বাদীর গুরুকে ১নং ধরমদাস বলিব) অমৃত সহরের ৭/৮ মাইল দুরে রাজাসংসী নামক স্থানে লেঃ রঘুবীর সিংহ নামক একজন অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছে।

হরনাম দাসের চেলা ধরমদাস—সম্প্রদায় উদাসী, বয়স ৪৫—ঠিকানা সংসার, ব্যবসা সেবাদার। আমি অমৃতসহর জেলার আজলা থানায় সংসার মৌজায় বাস করি। যে ছবি আমাকে দেখান হইয়াছে তাহা আমার চেলা সুন্দরদাসের ছবি—আগে তাহার নাম ছিল মালসিং। সে লাহোর জেলার আজলা মৌজায় বাস করিত। তাহার খুড়তুতো ভাই নারায়ণ সিং মন্টগোমারী জেলায় ৪৭নং চকে বাস করে। প্রায় ১১ বছর পূর্ব্বে সে মালসিংকে লইয়া নানকানা সাহেব'এ আমার সঙ্গে দেখা করে। তখন মালসিং-এর বয়স ২০ বছর। মালসিং-এর 'পর বারেশ'—(যাহারা তাহাকে লালনপালন করিয়াছিল) আজিলা গ্রামের তাহার কাকা মঙ্গল সিং ও লাভসিং ছয় বছর পূর্ব্বে

সুন্দরদাস আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। সুন্দরদাসের চোখ 'বিল্লি' ও রং ফরসা। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমি তাহাকে প্রয়াগে কুম্ভ মেলায় দেখিয়াছি। তার পরে আর তাহাকে দেখি নাই। এই তস্‌বীর (একজিবিট্ পি—১) আমার চেলা সুন্দরদাসের তস্‌বীর (ফটো) (পড়িয়া শোনান হইল এবং ঠিক বলিয়া স্বীকৃত হইল।)

২৭/৬/২১

লেঃ রঘুবীর সিং এই বিবৃতি প্রমাণ করিয়াছেন। এবং ইহা যে ২৭-৬-২১) তারিখে (পি ৯নং লেখা ফটো) দেখিয়া রঘুবীর সিংহের সম্মুখে ধরমদাসের বিবৃতি এ সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সময় ও ঐ স্থানে ঐ ফটো দেখিয়া আরও তিনজন লোক বিবৃতি দিয়াছে—তাহারা সংসারের দেবদাস কালা সিং, ভগত সিং ও কর্ত্তার সিং। সাবইনস্‌পেক্‌টার মম্‌তাজ উদ্দিন এই কয়জনের নাম দিয়া একটি দরখাস্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই দরখাস্ত ১৬৫ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ধারা মূলে এই ছয়জনের বিবৃতি লইয়াছেন এবং পুলিশের কর্ম্মচারীর হাতে দিয়াছেন।

লোক না দেখিলে এগুলিকে জবানবন্দী বলা যাইতে পারে না।

ধরমদাসের বিবৃতিতে মালসিংহের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। তার বাড়ী আজলা, সে নারায়ণ সিং ও লাভসিং-এর ভাইপো—ইহাতে দুজনেরই ঠিকানা আছে। ১৯১০ সালে মালসিং ধরমদাসের চেলা হয়, ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত এক সঙ্গে ছিল—এবং ১৯২৭ সালেও এলাহাবাদে কুম্ভ মেলায় দেখা হইয়াছিল। এখন ১৯২০ সালে তাহার বয়স ২০ বছর হইলে এখন তাহার বয়স ৪৬ বছর হওয়া উচিত। সে লেঃ রঘুবীর সিং-এর কাছে পি—১ লেখা ফটোতে এই লোকটিকে দেখিয়াছে।

আমি বলিয়াছি—১৯২১ সালের আগস্ট মাসে বাদীর গুরু ধর্মদাস নাগা ২৬ তারিখে ঢাকা আসেন এবং ৩০ তারিখে চলিয়া যান। মি. লিণ্ডসে তাঁহাকে তাঁহার সহিত দেখা করার জন্য লিখিয়াছিলেন কিন্তু তিনি চলিয়া যান। বাদী তাহার জবানবন্দীতে বলেন পুলিশের ভয়েই তিনি প্রস্থান করেন। তাহার বিবৃতিতে বাদী স্বীকার করিয়াছেন যে বিপক্ষদলের চক্রান্তে পুলিশের নিকট তিনি একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন।

এই মোকদ্দমার সময় বাদী, ধরমদাস ঢাকায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিতে দেওয়া হয় নাই। কারণ সাক্ষ্য দিতে না আসিলে এমন কি আসিলেও—এই বিবৃতিকে জবানবন্দি বলিয়া নেওয়া চলে না।—কোনো পক্ষ হইতেই তাহাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকার প্রস্তাব আসে নাই—যে দশ জন সাক্ষী তাহার ফটো দেখিয়া কমিশনের সম্মুখে বাদী মঙ্গল সিং এই বিবৃতি দিয়াছিল

কেবল তাহাদের কমিশনে জবানবন্দি নেওয়ার কথা হইয়াছিল মাত্র।

ছুটির পাঁচদিন পূর্বে ২১-৯-৩৫ তারিখে একজন লোককে আমার সম্মুখে আনা হয়—এই লোক নিজেকে ধরমদাস নাগা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বলে সেই লেঃ লঘুবীর সিং-এর নিকট বিবৃতি দিয়াছিল। সে বলে—বাদী (তখন আদালতে উপস্থিত ছিলেন) আমার চেলা সুন্দরদাস। সাক্ষী কখনও দার্জ্জিলিং যায় নাই এবং বাদী লাহোর জেলার আজলা গ্রামের মালসিং।

বাদীর বক্তব্য এই যে, যে লোকটি তাহার গুরু বলিয়া পরিচয় দেয়—সে জলে। সে যে জাল এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই, তাহার জবানবন্দি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। কিন্তু তাহার পূর্বে যে দশজন সাক্ষী লাহোরে বাদীকে মাল সিং বলিয়া জবানবন্দি দিয়াছে তাহাদের কথা আলোচনা করিব। কারণ কোর্টে যে ধরমদাস আসিয়াছিল তাহার ওপর ইহাদের কথার মূল্য আছে।

এই সকল সাক্ষীর নাম ঃ

মহর সিং ৪৫, আজলার লাভসিং ৪৮, আজলার উজাগসিং ৪৪, আজলার মহুয়া সিং ৬৫—ডাল্‌মুলতানী ওয়াসন সিং ৬৫—আজলার, হুকুম সিং ৫০—আজলার, ওয়ারজর সিং ৫২—আজলার মহন সিং ৪৬ অজুল ইকুমাসিং ৫০ আজলার। ১৯৩৩ সনের অক্‌টোবরে ইহাদের জবানবন্দি নেওয়া হয়। তাহাদের জবানবন্দিতে দেখা যায় যে এই জবানবন্দি দেওয়ার দুই বছর পূর্বে অরুণ সিং বলিয়া একজন লোক তাহাদের নিকট আসিয়া বাদীর ফটো দেখায়। তাহারা ওই ফটো মালসিং-এর ফটো বলিয়া সনাক্ত করে। ছেকুম সিং ও করম সিং ছাড়া আর সকল সাক্ষীই একথা স্বীকার করে। ১৯৩৩ সালে ৫ই অক্‌টোবর যখন তাহারা জবানবন্দি দিতে আসে, তখন ওই দুজন লাহোরে গুরুদ্বারায় অরুণসিং-এর সহিত দেখা করে। তাহাদিগকে বাদীর দুইখানা ফটো দেখান হয়,—একখানায় ডি ১ লেখা বাদীর ২৪ বছর বয়সের লুঙ্গি পরিয়া বসিয়া তোলা ছবি,—অন্যটি ডি ২ লেখা বাদীর বিকৃত ছবি। সাক্ষীরা এগুলিকে মালসিং-এর ছবি বলিয়া সনাক্ত করে। তাহারা আর কতকগুলি ছবিকেও এই একই কথা বলিয়াছে—এই ছবিগুলির মধ্যে পি ৪, পি ১, পি ২ প্রভৃতি ছবি ছিল। একজন সাক্ষী মেজকুমারের পি ৬ লেখা এক ফটোকে সন্দেহ থাকিলেও মালসিং-এর ফটো বলিয়া বলিয়াছে।

তাহাদের জবানবন্দিতে দেখা যায় যে, তাহার পিসি আক্কির ছেলে সুন্দরদাস সিং ছাড়া তাহার আর কোনো আত্মীয় নাই। সুন্দর সিং থাণ্ডিওরালাতে বাস করিত, ওয়াজির সিং-এর এখানেই বাস। ওয়াজির আসিলেও সুন্দর সিং কেন আসিল না তাহা বুঝা কঠিন।

মালসিংহের বিষয়ে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ—

সে অতি দরিদ্র রাঠোর শিখ শ্রেণীর আতর সিং-এর ছেলে। তার মায়ের নাম স্বানী। যখন তার বয়স ৪/৫ বৎসর তখন মা মারা যায় এবং ৭/৮ বৎসর বয়সে বাপ মারা যায়। তখন সে তাহার পিসি আক্কির কাছে তাহার কুটীরের পাশের এক কুটীরে গিয়া থাকে। আক্কি মারা গেলে তাবির কাছে থাকে, —বিমলসিং ইহার স্বামী। যখন ইহারাও মারা যায় তখন আক্কির ছেলে সুন্দরদাসের সঙ্গে বাস করে, সুন্দরদাস থাণ্ডিওয়ালা গ্রামে বাস করে এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাল্যে সে গোরু চড়াইত এবং ষোল বছর বয়সে সাধু হইয়া যায়—তার পরে চারিবার গ্রামে আসে—একবার তাহার গুরুকে সঙ্গে আনে। সে নাকি একবার তাহার হাতে উল্কিতে লেখা তাহার গুরুর নাম দেখাইয়াছে—ইহা সুন্দরদাস ধরমদাস বলিয়া লেখা ছিল। তাহাকে নানকানা সাহেবে দেখা যাইত, নানকানা খুনের ২/১ বছর পূর্ব্ব হইতে আর দেখা যায় নাই। রঘুবীর সিং বলেন—১৯২১ সালের জানুয়ারীতে এই দুর্ঘটনা হইয়াছে।

নানকানা লাহোর হইতে ৪০ মাইল দূরে। আজলার সাক্ষীরা বলে নানকানার মেলা দেখিতে যাইয়া তাহারা বাদীকে সেখানে দেখিয়াছে। বাদী ১৯২০ সালে নান্‌কানা হইতে সোজা ঢাকা আসিয়াছে—কাজেই অতুল বাবুর সঙ্গে অবোধ্য হিন্দিতে কথা বলিয়াছে।

তাহার যে দুই খুড়া ও খুড়তুতো ভাইয়ের কথা রঘুবীর সিং-এর নিকট জবানবন্দিতে বলা হইয়াছে তাহারা কোথায়? তাহারা উড়িয়া গিয়াছে—তাহার কখনও বর্ত্তমানই ছিল না। যে সকল সাক্ষীকে ইনস্‌পেকটর মমতাজউদ্দিন ১৯২১ সালের জুলাই মাসে আজুলায় দেখা পাইয়াছিল এবং যাহারা উত্তমদাস ও মালসিং-এর বাড়ীর পরিচয় সম্বন্ধে কথা বলিয়াছিল—এবং যাহাদের কথা মেজরাণী ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়া ছিলেন—তাহাদিগকে ডাকে নাই।

ফটো দ্বারা সনাক্তকরণ সন্তোষজনক নয় বলিয়া প্রতিবাদী পক্ষ খুঁটি নাটিতে গিয়াছিল—যে মালসিংহের বাহুতে একটা উল্কিচিহ্ন ছিল। ধরমদাস কোর্টে সাক্ষ্য দিতে আসিয়া এবিষয়ে পূর্ব্ব হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিল না—কারণ সে কখনও উহা দেখে নাই, যদিও সে আবার বলিয়া ছিল যে যখন এলাহাবাদে তাহার সহিত শেষ দেখা হয় তখন সে ওই উল্কিচিহ্ন দেখিয়াছিল। জেরায় লাহোরের সাক্ষীগণ অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছিল, রঙ গৌর বর্ণ, চুল তাহার পিতার মতো কালো, ছোট ছোট বাদামী গোঁফ; স্থূলকায়, লম্বা দাড়ি—চোখ কালো নয় কিন্তু বিড়ালের চোখের মতো, নাক চ্যাপ্‌টা; নাসারন্ধ্র প্রশস্ত ইত্যাদি। পিতার মতো কালো চুল এই কথাতেই যেন এই ব্যাপারের শেষ হইয়া গিয়াছিল। এবং রঘুবর সিংহের সামনে প্রদত্ত বিবৃতিতে যে

আত্মীয়গণের উল্লেখ করা হইয়াছিল, সেরূপ আত্মীয় তাহার ছিল না। এই ঘটনার ব্যাপারটি আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল এবং স্থূলকায় কথাটি ১৯২১ সালে বাদীর পক্ষে আদৌ প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং ইহা আদৌ আশ্চর্য্যজনক নহে যে মিষ্টার চৌধুরী বাদীকে সে যে অজুলার মালসিংহ এই উক্তি আরোপ করেন নাই।

কালো চুল তেল না মাখিলে ও যত্ন না লইলে কটা হইয়া যাইতে পারে। সাক্ষীগণের নিকট এই উক্তি উপস্থাপিত করিয়া—এই ব্যাপার আবার তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে ইহা স্বীকৃত হইল যে—বাদীর চুল পিঙ্গল বর্ণ বা রক্তবর্ণ এবং সাক্ষীগণ স্বীকার করিল যে বাদীর চুল দ্বিতীয় কুমারের চুলের মতো।

বাদীকে কোনো প্রশ্ন না করিয়া সে যে মানসিংহ ইহা প্রমাণ করা—এবং তাহাকে সর্ব্বপ্রকার স্থানে স্থাপন করা এবং তাহার মুখে সর্ব্বপ্রকার উক্তি আরোপ করা—প্রতিবাদীর পক্ষে যে সম্ভব হইতে পারে উহা আমার নিকট অদ্ভুত বোধ হয়, কিন্তু তৎ সত্ত্বেও এই ব্যাপারের গুরুত্ব দেখিয়া আমি—সাক্ষ্য সমুদয় বিবেচনা করিয়াছি। এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে এই মালসিংহের আদৌ কোনো আত্মীয় নাই, তাহার পূর্ব্ব আবাসের কোনো খবর নাই—কারণ আমি ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি যে—মেন্দুলওয়ালীতে তাহার এক আত্মীয় ভ্রাতা আছে। কারণ সেরূপ হইলে তাহাকে সাক্ষী ডাকা হইত। এবং এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই যে লাহোরের সাক্ষীগণ—একদল কৃষক এবং তাহাদিগকে আনা হইয়াছিল যে ফটো সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানিত না সেবিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এবং তাহাদিগের দ্বারায় এমন কতকগুলি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে বাদীর সনাক্ত নির্ধারিত হয়। ধর্ম্মদাস নাগা (প্রঃ সাঃ ৩২৭)। যে মোকদ্দমা বাস্তবিক পক্ষে শেষ হইয়া গিয়াছিল তাহাই পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য আদালতে আসিয়াছিল। অজুলার সাক্ষীগণ যাহা বলিয়াছে; রঘুবর সিংহের নিকটে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে এবং যে প্রকৃত ধর্ম্মদাস নাগা ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় আসিয়াছিলেন তাঁহার কার্য্যাবলী এই সমস্তগুলির সহিত যাহা মিল খাইবে এইরূপ বিবরণ এই সাক্ষীকে দিতে হইয়াছে।

এই লোকটিকে কীরূপে যোগাড় করা হইল—এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার বিবরণ আছে। ইনস্‌পেক্টর মমতাজউদ্দিনকে পাঞ্জাবে গিয়া—এই সাধুকে যোগাড় করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনারের নিকট হইতে তিনি একখানি পত্র লইয়া গিয়াছিলেন যাহাতে তিনি স্থানীয় পুলিশের নিকট হইতে সাধুর সন্ধান করিতে যাহা কিছু দরকার সমস্ত পাইতে পারেন। ১৯/৭/৩৫ তারিখে ইনসপেক্টার মমতাজউদ্দিন অমৃতসর হইতে যাত্রা করেন। ১/৮/৩৫ তারিখে তিনি তাঁহার ভ্রাতার

সহিত দেখা করিতে কোনও এক স্থানে গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অর্জ্জুন সিং পরদেশীর নিকট হইতে সাধু কোথায় আছে তাহা শুনিলেন, এই লোকটি অজুলায় সাক্ষীদিগকে যোগাড় করিয়া দিল। সাধু কোথায় আছে তাহা জানিয়া তাহা নির্ধারণ করিয়া অর্জ্জুন সিং তাহাকে প্রস্তুত রাখিয়াছিল—সে—আমি পত্রের উল্লেখ করিয়াছি সেই পত্রটি উপস্থিত করিতে দার্জ্জিলিং গিয়াছিল, এবং সাধুকে বাহির করিবার জন্য তাহাকে স্থানীয় পুলিশ যাহাতে সাহায্য করে এই মর্ম্মে ডি, আই, জি-র একটি আদেশ করাইয়া লইয়াছিল। ইনস্পেক্টর সাধুকে আদৌ না দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, যদিও একমাত্র তিনিই বলিতে পারিতেন যে সেই লোকটি আসল লোক কি না, যে লোককে রঘুবর সিংহের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। ইনস্পেক্টার মমতাজ উদ্দিনের সমস্ত যাত্রাটাই—একটা ছল মাত্র এবং যে পুলিশ কর্ম্মচারী ১৯২১ সালের সাক্ষীকে বাহির করিয়াছিল তাহাকেই পাঠান হইতেছে। এবিষয়ে রাজকর্ম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইহা করা হইয়াছিল।

সাধু স্বীকার করিতেছে যে সে অর্জ্জুন সিংহের সহিত আসিয়াছিল এবং তিনদিনের জন্য সত্যবাবুর বাড়ীর নিকটে একটি বাড়ীতে বাস করিয়াছিল (সত্যবাবুও ইহা স্বীকার করিতেছেন), এবং তারপর সে ঢাকা আসিয়াছিল এবং ছুটির পাঁচদিন পূর্ব্বে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়াছিল। তাহার কাঠগড়ায় আসিবার পূর্বে আমাকে বলা হইয়াছিল যে সাক্ষী কেবল পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলে, হিন্দী বা উর্দ্দু বুঝিতে পারে না, সুতরাং একজন দোভাষীর আবশ্যক হইয়াছিল। মেজর পাটনী দয়া করিয়া দোভাষীর কাজ করিতে রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হইল যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ছল, লোকটা উর্দ্দু বলিতে ও বুঝিতে পারিত, তা ছাড়া ছোটো ছোটো বাংলা কথাও বুঝিত এবং জেরার সময় যে হিন্দী, উর্দ্দু মিশাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারিত, যদিও সে এইরূপ ভাণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল যে সে কেবলমাত্র পাঞ্জাবী ভাষা বুঝিত। যদি ইহা ছল না হইবে তাহা হইলে যে ধরমদাস রঘুবর সিংহের সামনে বিবৃতি দিয়াছেন বলে ছিল সে ধরমদাস হইবে না, কেবলমাত্র এই সংক্ষিপ্ত কারণ এই যে ধরমদাস সহজ উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার বিবৃতি দিয়াছিলেন এবং ওই ভাষা বড়ো শহরে যে বাস করে এরূপ বাঙালী বুঝিতে পারিত; এবং যখনই ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে সুরেন্দ্রনাথ একজন ঢাকার লোক, তাহার রিপোর্টে অনেক সংবাদ দিয়াছিল যাহা, সে ১৯২১ সালে সাংগ্রাতে ধরমদাসের সহিত সাক্ষাতের ফলে জানিতে পারিয়াছিল, এখন কেসটি এইরূপ দাঁড়াইল যে এই ধরমদাস (প্রঃ সাঃ ২২৭) সুরেন্দ্রের বিবৃতিমত সাংগ্রাতে এইরূপ আধ হিন্দী আধা বাংলায় কথা বলিয়াছিল যাহাতে সে তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। আপাততঃ এরূপ আশা করা হইয়াছিল যে পাঞ্জাবী

ভাষা ও তাহার ব্যাখ্যারূপ অন্তরায় এবং ছুটির পূর্বে পাঁচদিন এবং তাহাও আবার একটি রবিবার দ্বারা সংক্ষিপ্ত হইবে এবং অসুখের অজুহাতে তাহার বাড়ীতে সাক্ষীগ্রহণ এই সকলের দ্বারা সে রক্ষা পাইবে। কিন্তু ইহা তাহাকে রক্ষা করে নাই।

সে প্রথমে এই বলিল যে সে রঘুবর সিংহের সম্মুখে বিবৃতি দান করিয়াছে এবং তাঁহার সামনে এ (২৪) নং ফটো ও উহার একটি কপিতে তাহার চেলা সুন্দরদাসের ফটো বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। ফটোটির ওপরে রঘুবর সিংহের দ্বারা প্রদত্ত একজিবিট পি (১) এই চিহ্নটা নাই, এবং ফটো না দেখাইলে বিবৃতির কোনই মূল্য নাই। আমি জিজ্ঞাসা করায় মি. চৌধুরী বলিলেন যে রঘুবর সাক্ষীকে যে ফটো দেখাইয়াছিলেন তাহা উহার কাছে নাই কিন্তু তিনি ইনস্‌পেক্টার মমতাজউদ্দিন ও সুরেন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট এই উপদেশ পাইয়াছেন যে ২৭/৬/২১ তারিখে রঘুবর সিংহের সামনে সাক্ষীদের যে ফটো দেখান হইয়াছিল এ ২৪নং একজিবিট সেই ফটোর একখানি কপি (২৫/৯/৩৫) তারিখের ১২৪৩ নং অর্ডার দ্রষ্টব্য) সেই ব্যাপারের সহিত মিল রাখিয়া ধরমদাস বলিয়াছে যে—রঘুবর সিংহের সম্মুখে এ (২৪) ফটো দেখান হইয়াছিল। এই ফটোতে বাদী একটি লুঙ্গি পরিয়া বসিয়া আছে। প্রতিবাদীপক্ষের কে একজন যেন লক্ষ্য করিয়াছিল যে, সুরেন্দ্রবাবুর রিপোর্টে আছে যে রঘুবর সিংহের সামনে সাক্ষীদিগকে যে ফটো দেখান হইয়াছিল উহা খাড়া ফটো (দণ্ডায়মান ফটো)। ইহা পরে এবং খুব দেরীতেই লক্ষ্য করা হইয়াছিল কিন্তু সাক্ষী তখনও কাঠগড়ায় ছিল এবং সে বলিল যে—রঘুবীর সিংহের সামনে তাহাকে যে ফটো দেখান হইয়াছিল তাহা আদৌ বসিয়া থাকা ফটো নহে দণ্ডায়মান অবস্থার ফটো। পূর্বে সে এ (২৪ নং বসিয়া থাকা ফটোটীর সম্বন্ধে হলফ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছে কি না প্রশ্ন করায় সে বলিল যে সে উহা বলে নাই, অধিকন্তু আরও বলিল যে তাহার সাক্ষ্য লইবার উদ্দেশ্যে এক উকিল যখন তাহার বিবৃতি লইয়াছিল তখন তাহাকে এই ফটো দেখান হইয়াছিল এবং রঘুবর সিংহের সামনে এই ফটো দেখান হইয়াছিল—ইহা সে অস্বীকার করিয়াছিল। অর্থাৎ ইহা সত্ত্বেও তাহার প্রামাণিক জবানবন্দীতে সাক্ষী তাহাকে এ (২৪) ফটো দেখান হইয়াছিল এবং সে স্বীকার করিয়াছিল যে এই ফটোই তাহাকে দেখান হইয়াছিল; এবং মি. এ, চৌধুরী এই পরামর্শ পাইয়াছিলেন যে এ (২৪) ফটো ২৭/৬/২১ তারিখে প্রদর্শিত ফটোর একটি কপি।

আসল ব্যাপার কি ঘটিয়াছিল, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। রঘুবর সিংহের নিকটে যে বিবৃতি দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে বিবৃতিকারীর কোনও সহি বা টিপসহি নাই। ফটো না দেখাইলে উহার কোনো মানেই নাই, এবং ওই ফটোতে রঘুবর সিংহের

একজিবিট পি (১) এবং তাঁহার সহি ছিল এবং খুব সম্ভবতঃ বিবৃতিকারীর টিপসহি ছিল অথচ তাহাতে সহি বা টিপসহি লওয়া হই নাই। সাব ইনস্পেক্টর মমতাজউদ্দিন অবশ্যই উহা লইত এবং সাধারণভাবে উহা সূচিত করে। একজিবিট পি ৮ সম্বলিত ফটো অন্য কোনো লোকের ফটো হইবে, নিশ্চয়ই বাদীর ফটো নহে, কিংবা উহা ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ ধর্ম্মদাস নাগার না হইয়া অন্য কোনো লোকের সহি বা টিপসহি সংযুক্ত হইবে কিংবা একজিবিট, এই ফটো সরাইয়া না লইলে বিবৃতিদ্বারা বাদীর কোনো ক্ষতি হইবে না, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা বিবৃতির অংশ- স্বরূপ ফটো যোগাড় করা হইয়াছিল। একজিবিট এ (২৪) এক উদ্দেশ্যে উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল কিন্তু সুরেন্দ্রের রিপোর্ট দ্বারা উহা ব্যাহত হইল এবং তখন এই গল্প সৃষ্টি হইল যে দাঁড়ানো ছবি দেখান হইয়াছিল।

আমি বিশ্বাস করি না যে—পি (১) চিহ্ন করা ফটো হারাইয়া গিয়াছে, এমনকি ২৫/৯/৩৫ তারিখেও উহা বলা হয় নাই; উহা কৌসুলীর অধিকারে ছিল না। পরবর্ত্তীকালে কোনো সাক্ষীর দ্বারা নহে পরন্তু কৌসুলীর দ্বারা উক্ত হইয়াছিল যে উহা পাওয়া যাইতেছে না। যদিও ইন্সপেক্টর মমতাজউদ্দিন বলিয়াছেন যে তিনি বিবৃতি ও ফটো মিঃ লিণ্ডসেকে প্রদান করিয়াছেন, এবং ইহা সকলেই জানে যে সাধু-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র বিশেষ ফাইলে রাখা হইয়াছে। বিবৃতিটি পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু ফটোটি পাওয়া যাইতেছে না। ফটোটি দেখানো হইয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে এই যে অপর একটি ফটো স্থাপন ইহাকে আমি কেবলমাত্র অতি জঘন্য ধরণের কৌশল বলি না, ইহাকে জুয়াচুরী বলি।

যে ধর্ম্মদাস বিবৃতি দান করিয়াছেন তাঁহাকে যে ফটো দেখান হইয়াছিল সেই ফটো ব্যতীত বিবৃতির কোনই দাম নাই এবং এটি উপস্থিত না করা এবং তাহার পরিবর্ত্তে জুয়াচুরি করিয়া অন্য ফটো স্থাপনের চেষ্টা করা এবং উহা ব্যাহত হইলে তৃতীয় পন্থা অবলম্বন করা এই সমস্ত হইতেই এইরূপ মনে করা যাইতে পারে যে—ফটোর লোকটি সুন্দরদাস, এই বিবৃতি বাদীর ফটোর পরিবর্ত্তে অন্যের ফটো দেখাইয়া লাভ করা হইয়াছিল, এবং বাদীকে যে পরে সুন্দরদাস বলা হইয়াছে এই সুন্দরদাস নামের উৎপত্তি উক্তরূপে ঘটিয়াছিল।

বিবৃতিটি গেল বটে কিন্তু লোকটি রহিল। সে যদি রঘুবর সিংহের সামনে বিবৃতিদান না করিয়া থাকে তাহা হইলে সে বাদীর গুরু ধর্ম্মদাস নাগা নহে। নিম্নলিখিত বিবেচনা মতে মাত্র একটি সিদ্ধান্ত সম্ভব।

১। ইহা স্বীকার হইয়াছে যে ২৭/৬/২১ তারিখে এ (২৪) একজিবিট বিবৃতিকারীকে

দেখান হয় নাই, কিন্তু এই লোকটি জুয়াচুরির মতলবের একটি অংশ স্বরূপ হলফ করিতেছে যে উহা দেখান হইয়াছিল। সে পরে হলফ করিতেছে যে খাড়া ফটোটি দেখান হইয়াছিল, যাহা আদৌ দেখান হয় নাই। সেরূপ হইলে উহাতে একজিবিটি চিহ্ন থাকিত।

২। সে যদি সেই একই লোক হইত, তাহা একজিবিটি মার্ক বিশিষ্ট ফটোটি উপস্থিত করা হইত।

৩। অজুলার সাক্ষীগণ যে ভুল করিয়াছিল যে সে ভুল করিবে না। সে বলিতেছে যে মালসিংহ স্থূলকায় ছিল না। তাহার চুল আমার মতো সোনালি ছিল—যেমন পাঞ্জাব হইতে আহূত একজন সাক্ষী বলিয়াছিল যে তাহার চুল ছিল 'কাক্কা ভুরা' এবং আর একজন সাক্ষী বলিয়াছিল কাক্কা অর্থাৎ তাহার ব্যাখ্যা মতে ফিকে সোনালী।

৪। এই বিবৃতিকারী বলিয়াছে যে তাহার পেশা সেবাদার অর্থাৎ সে গুরুদ্বারের পুরোহিতের ব্যবসাধারী। এই সাক্ষী বলিতেছে যে সে কোনো স্থানে সেবাদার নহে এবং সে সেবাদার এ কথা কখনও বলে নাই। দেবদাস সহ পাঁচজন সাক্ষী রঘুবর সিংহের সামনে ২৭/৬/২১ তারিখে বিবৃতি দিয়াছিল। কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত ঘটনা জানে না। অবশ্য সে বিবৃতির মধ্যে এই বর্ণনা করিতেছে কিন্তু নারায়ণ সিং ব্যতীত কোনো আত্মীয়ের উল্লেখ করিতে সাহস করিতেছে না। সে বলিতেছে যে অজুলার সাক্ষীগণ মিথ্যা প্রমাণিত করিতেছে। সে বলিতেছে যে বহুবর্ষ পূর্বে একদিন এক বাঙালী বাবু—ও একটি পুলিশের লোক তাহার কাছে গিয়াছিল এবং তাহাকে একটি ফটো দেখাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—সে কে? তাহারা আসিয়াছিল বেলা ৩টার সময় যখন সে ছোটো সংগ্রার সংলগ্ন গ্রামে গুরুকাবাস মন্দিরে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা তাহাকে একটি ফটো দেখাইয়াছিল, যে ফটোটি আদালতে তাহাকে দেখান হইল—একজিবিট এ (২১)—এবং পরে খাড়া ফটো। সে ফটো দেখিয়া বলিয়াছিল—আমার চেলা সুন্দরদাসকী হ্যায়। (আমার চেলা সুন্দরদাসের ফটো।) আগন্তুকেরা ইহা লিখিয়া লইল এবং আর কোমো কথা বলিল না। তাহারা গুরুকাবাসে রাত্রি যাপন করিল এবং পরদিন প্রাতে তাহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া গেল এবং তথায় সে এই বিবৃতি করিল। ছুটির পূর্বে উহাই ছিল সমগ্র বিবরণ। এই বিবৃতি লইবার পূর্বে ফটো দেখান ছাড়া আর কোনো কথা হয় নাই এবং 'উ লেক কে চুপ্"। ধরমদাসের সহিত সুরেন্দ্রের সাক্ষাৎ হইয়াছিল সে তাহার চেলা সেবাদাসের সহিত ফটোটা চিনিয়াছিল এবং তাহার সহিত অনেক কথাবার্তা হইয়াছিল সুতরাং সে যে সংবাদ আনয়ন করিতেছিল তাহার সবটা না হইলেও কতকটা ধরমদাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ছুটির পরে ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ কিছু কিছু কথা আরম্ভ করিল এবং রাত্রে দেবদাসের নিকট আসিল সুতরাং এরূপ বলা যাইতে পারে যে দেবদাস তথায় এবং তাঁহার সহিত ফটো দেখিয়াছিল। সে বলিতেছে যে তাহার সর্ব্বসমেত ৪/৫ জন চেলা আছে এবং পূর্ব্বে সর্ব্বসমেত ১২ জন চেলা ছিল এবং টাকা পাঠানোর কথা দূরে থাকুক তাহারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিত না। তাহার সাক্ষ্যে যে সব মিথ্যার ছাপ রহিয়াছে সেগুলি নির্দ্দেশ করা বিরক্তিকর। একজিবিট পি (১)-এর পরিবর্ত্তে অন্য একটা ফটো স্থাপন করিবার চেষ্টা এবং উহা ব্যাহত হইলে তৃতীয় ফটো স্থাপনের চেষ্টায় সে সহযোগিতা করিয়াছিল এবং উহাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিতেছে যে—একজিবিট পি (১)-তাহাকে নষ্ট করিবে। রঘুবীর সিংহের সামনে যে বিবৃতি দান করিয়াছিল সে যে-লোক নহে, সুতরাং বাদীর গুরু নহে।

তাহার সাক্ষ্য শেষ হইলে তাহাকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করা হইয়াছিল। একজন উকিল বরাবর পাঞ্জাব গিয়াছিল, তাহাকে রঘুবর সিংহকে দেখাইয়াছিল এবং রঘুবর সিংহ সত্যবাবুর পরিচিত সুন্দর সিংহের চিঠি পাইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার যে ফটো রাখা হইয়াছিল সেটিকে তাঁহার সমক্ষে বিবৃতিদানকারী ধরমদাসের ফটো বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে—তিনি পূর্ব্বে তাঁহাকে জানিতেন না। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে তাহার সাক্ষ্যদানের পরদিন উকিল তাহাকে তাহারা গৃহে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে—তিনি একদিনের জন্যও তাহাকে দেখেন নাই এবং তাহার সাক্ষ্য হইতে ইহা পরিষ্কার জানা যায় যে ছয়জন লোকের বিবৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের সম্বন্ধে তাহার আদৌ কোনো স্বতন্ত্র স্মৃতি নাই এবং সুরেন্দ্রের রিপোর্টে উল্লিখিত বিষান দাস প্রভৃতি আর তিনজনের কিছুই স্মরণ নাই।

এই ধরমদাসকে ১৯২১ সালে ঢাকায় সে কি করিত জিজ্ঞাসা করায় সে বলিতেছে যে সে সুন্দরদাসকে (বাদীকে) সে যে ঘরে বাস করে সেই ঘরে দেখিয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত বাক্যালাপ হই নাই। সে নন্দ্রের বাড়ীতে গিয়াছিল (আনন্দ রায়কে সে নন্দ্র বলিত)—তাহাকে একটি ফটো দেখান হইয়াছিল এবং তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারে নাই বলিয়া সে আবার গিয়াছিল। এবারে একজন শিখ দোভাষী ছিল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ফটোটি কাহার, এবং সে বলিয়াছিল যে সেটি সুন্দরদাসের, কুমারের নহে। ইহাই সব। আপাততঃ এরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে সে এই বলিয়া ঢাকার ব্যাপার হইতে রক্ষা পাইবে যে সে কাহারও সহিত কথা বলে নাই—সে কাহারও কথা বুঝিতে পারে নাই, কেহই তাহার কথা

বুঝিতে পারে নাই এবং এই জন্যই সে দোভাষীর জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে সকলেই তাহার কথা বুঝিতে পারিত না। সুরেন্দ্রবাবু বলিতেছেন যে ১৯১১ সালে জুন মাসে সাংস্রারায় তিনি তাঁহার আধা বাংলা ও আধা হিন্দি কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আরও যদি কিছু প্রয়োজন থাকিত তাহা হইলে সেটা ছিল তাহার তলপেটের স্ফীতি—একটা প্রকাণ্ড জিনিস—এবং সে উহা লম্বা সার্ট দ্বারা ঢাকিতেছিল, সে বলিতেছে যে সে যখন ঢাকায় আসিয়াছিল তখনও উহা ছিল, কিন্তু কেহ উহা দেখিতে পায় নাই, কারণ সে ভোর চারটার সময় স্নান করিত, এবং তাহার আসিবার পূর্ব্বে সাক্ষীরা বলিয়াছে যে গুরু সর্ব্বদা মালা জপিতেন, কিন্তু উহা না জানিয়া ওই সাক্ষী ভুল করিয়া বলিল যে সে কখনো মালা জপে নাই।

শিখ উকিল আবার সাংস্রায় ছুটিলেন এবং গুর্জ্জর সিং, চন্দ্র সিং, বুর সিং ও ভগত সিং নামে চারজন সাক্ষী যোগাড় করিয়া আনিলেন, সে যে ২৭/৬/২১ তারিখে সাংস্রায় ছিল তাই সামঞ্জস্য করিতে, এবং বহু পরে আসিলেন ইনস্পেক্টর মমতাজুদ্দীন ও সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তাঁহারা যে বিবরণ দিতেছেন তাহা এই ইনস্পেক্টার ও সুরেন্দ্র ২৬ জুন তারিখে সংস্রারায় গেলেন এবং গুর্জ্জর সিং নামক তৎকালীন এক ডাক্তারের ছাত্র, এক দোভাষী ও তাহার পিতার সহিত গুরুকাবাদে ধরমদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তারপর সেই রাত্রি ধরমদাস সাংস্রারায় গুরুদ্বারে গমন করিলেন। তথায় দেবদাস সেবাদার ছিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে—তিনি বিবৃতি করিবার নিমিত্ত একা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে গেলেন এবং তারপর অন্যান্য সাক্ষীরা গেল, সুতরাং তিনি বাকী সকলকে দেখেন নাই। এমনকি তাঁহার চেলাকেও দেখেন নাই। সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে দেখার পর তাঁহার বিবৃতি আরম্ভ করিলেন এবং তাহাকে খাড়া ফটো দেখান হইয়াছে, দেখিয়া তিনি জুন মাসের গরমে পাঞ্জাব চলিয়া গেলেন এবং অমৃতসর হইতে ৮ মাইল দূর হইতে একদল সাক্ষী পাঠাইলেন এবং তাহাদের বিবৃতি অনুমান করিয়া তাহার রিপোর্ট পাঠাইলেন কিন্তু উহা ঘটিল না। আমি এই বিবরণের একটি কথাও বিশ্বাস করি না, কারণ প্রঃ সাঃ ৩২৬ ধরমদাস যে যে বিষয়ে অজ্ঞতা দেখাইয়াছিল সেই সকল জ্ঞান ধরমদাসের ছিল না ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য এবং অগত্যা একবার তাহাকে দেবদাসের সংস্পর্শে আনিবার জন্য যাহাতে তাহারা একসঙ্গে ফটোটা দেখিতে পায় এই সকল উদ্দেশ্যে রিপোর্টটা বুদ্ধি করিয়া রচিত হইয়াছিল, কিন্তু রিপোর্ট অনুসারে তাহাকে নির্ব্বাক করিয়া রাখাও সম্ভবপর ছিল না। এই দেবদাস ছোটো সাংস্রারার সেবাদার। এই ছোটো সাংস্রার হইতে যে সাক্ষীগুলি আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ভগত সিং একজন। ভগত সিং বলিতেছে যে সে সেই ভগত সিং যে একটা অপরিচিত ফটো দেখিয়া রঘুবরের সম্মুখে বিবৃতি দিয়াছে এবং সে সুন্দরদাসকে জানিত বলিয়া প্রকাশ করিতেছে, কারণ ধরমদাস নাগা তাহার চেলা দেবদাসকে দেখিতে ছোটো

সাংস্রায় আসিতেন। দেবদাস ২০ বছর ধরিয়া সেই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। শিখ উকিল এই একদল সাক্ষী আনিতে গেল কিন্তু তথাকার গুরুদ্বারে সেবাদার দেবদাসকে আনিল না, ইহা বোধ হইতেছে যে দেবদাস রঘুবর সিংহের সামনে কি ফটো দেখান হইয়াছিল তাহা বলিয়া দিত এবং এই ধরনের লোক আদালতে কিছুতেই এই লোকটাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

এই দলের সহিত আর দুইজন লোক আসিয়াছিল, উহাদিগকে ও শিখ উকিল আনিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের ধরমদাসের গুরু হরনাম দাস। তিনি ৩২৭ নং প্রঃ সাঃ ধরমদাসের ফটোকে তাহার দেশী ধরমদাস বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিলেন এবং বাদীকে তাহার চেলা সুন্দরদাস বলিয়া সনাক্ত করিয়াছেন। ধরমদাস ও হরনাম দাসের সমস্ত বিবরণ বাদীর সাক্ষী দর্শনদাসের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু একটি কথা পাওয়া যাইতেছে না। দর্শনদাস বলিয়াছেন যে তাঁহার গুরু লুধিয়ানা জেলার বিলু নামক স্থানের এক গৌর ব্রাহ্মণ। লোকটি দর্শনদাস ওরফে গোপালদাসকে চেনা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, দিলুকে গ্রহণ করিতেছে কিন্তু সে জানে না যে সে একজন গৌর ব্রাহ্মণ। সে বলিতেছে যে ধরমদাস ১০/১২ বছর পূর্ব্বে সুন্দরদাসকে তাহার চেলা করিয়াছিল এবং সে নিজে ধরমদাসকে ২০ বছর পূর্বে দীক্ষা দিয়াছিল। সে যখন বলিয়াছেন যে সে বাকী দলের সঙ্গে আসে নাই, পরন্তু ঢাকা আসিবার পুর্ব্বে প্রায় তিনদিন কলিকাতায় ছিল তখন সে ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা বলিয়াছিল। গুর্জর সিং ও চন্দন সিং তাহাকে লুকাইতে ছিল কিন্তু ভগত স্বীকার করিতেছিল যে এই লোকটি সমেত সমস্ত দল কোথাও না থামিয়া একসঙ্গে ঢাকায় আসিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে হালসা দেওয়ানের লোক অর্জ্জুন সিং এই জাল ধরমদাস নাগাকে সংগ্রহ করিয়াছিল, যাহাতে সে আসিয়া বলিতে পারে যে যে ব্যক্তি ১৯২১ সালে রঘুবর সিংহের সমক্ষে বিবৃতি দিয়াছিল সে সেই লোক। সে আসিল এবং তারপর এই বিবৃতি যাহাতে বাদীর বিপক্ষে যায় ফটো বদলাইয়া সেই চেষ্টা আরম্ভ হইল। এবং তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভান করিবার জন্য যে ইনস্‌পেক্‌টর মমতাজউদ্দিন পাঞ্জাবে গিয়াছিলেন এবং যে সাক্ষী দিতে আসিবার পূর্ব্বে কখনও তাহাকে দেখে নাই—তাঁহাকেই আসিতে হইল এবং তিনি ১৯২১ সালে যে সাধুকে দেখিয়াছিলেন সেই সাধু বলিয়া এই লোকটিকে সনাক্ত করিতে হইল এবং কৌশুলীকে ফটোটি উপবিষ্ট ফটো পরামর্শ দেওয়ার পর বলিতে হইল যে তাহাকে খাড়া ফটো দেখান হইয়াছিল। ইহাতে ভুল হইয়াছিল বলা চলে না, পরন্তু রঘুবর সিং যে ফটোটিতে একজিবিট পি (১) চিহ্ন দেখিয়াছিলেন সেইটির পরিবর্ত্তে বাদীর একটি ফটো স্থাপন করার নীচ ষড়যন্ত্রের অংশ বলা চলে।

আমার মত এই যে ২১৭ প্রঃ সাঃ ধরমদাস নাগা যে কোনো লোক হইতে পারে।

নারোয়ালবাসী হইতে পারে তাঁহার নামও ধরমদাস হইতে পারে (উহা পাঞ্জাবে একটা সাধারণ নাম)। কিন্তু সে লোক না যে ১৯২১ সালে রঘুবর সিংহের সম্মুখে বিবৃতি দিয়াছিল। প্রতিবাদীদের কেস হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে বাদীর যিনি গুরু এবং যিনি ১৯২১ সালে ঢাকায় আসিয়াছিলেন এই লোক সে ব্যক্তি নহে। এমন কি আমি যে সকল সাক্ষী মানিয়া হইতেছি সেগুলি না থাকিলেও যথা, যে ধরমদাস ১৯২১ সালে ঢাকা আসিয়া ছিলেন। তিনি বিভিন্ন লোক এবং তাঁহার তলপেটে স্ফীতি ছিল না। গুরু পাঞ্জাব পুলিশের নিকট বিবৃতি দান করিয়াছে এই স্বীকারোক্তি রঘুবর সিংহের নিকট বিবৃতির স্বীকারোক্তি নহে। গুরু এই বিবৃতি করিয়াছে ইহা ধরিয়া লইলেও তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ না করিলে উহা সাক্ষ্য হইবে না, এবং যদি তাহাও হয় তাহা হইলেও যে ফটো দেখান হইয়াছিল তাহা ব্যতিরেকে ইহার কোনো অর্থ নাই। আমার মত এই যে উহা যে বাদীর ফটো তাহা প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস বাদীর উপর যে সুন্দর দাস নাম আরোপ করিয়াছিল সেই নামের আবিষ্কার হইয়াছে যে রিপোর্টের ফলে সেই রিপোর্ট সাক্ষ্য গ্রহণ না করিয়াই গৃহীত হইয়াছিল এবং যে বিবৃতির ফলে উহা আবিষ্কার করিয়াছিল সেই বিবৃতি অন্য লোকের ফটো দেখাইয়া গৃহীত হইয়াছিল এবং সেই ফটো এখানে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা নীচতর কার্য্য প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র—এমন এক ব্যক্তির কল্পনা যে—কোর্ট অব ওয়ার্ডসের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য একটা তাড়াতাড়ি রিপোর্ট চাহিতেছিল এবং ইহা বিদিত যে ইহা মেজরাণীর নিকট এমন সময়ে টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল যখন তিনি বা সত্যবাবু ভয় করিতেছিলেন যে প্রতারক ঘোষণা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

আমি এই সাব্যস্ত করিলাম যে ইহা প্রমাণিত হয় নাই যে বাদী অজুলার মালসিংহ এবং ২২৭ প্রঃ সাঃ ধরমদাস নাগা তাহার গুরু নহে।

এষ্টেট্ তাহার সমস্ত উপায় সত্ত্বেও এবং গভর্ণমেন্টের সাহায্য সত্ত্বেও ১২ বৎসরের মধ্যে বাহির করিতে পারিল না যে বাদীকে যদিও বরাবর কলিকাতা ও ঢাকায় বাস করিতেছিল এবং একদিনের জন্যও লুকাইয়া থাকে নাই।

কিন্তু সে যেই হউক, সেকি হিন্দুস্থানী? আমি ইহার উত্তরে বলিব, না, এবং তাহার সংক্ষিপ্ত কারণ এই যে আমি যে সমস্ত সাক্ষ্য আলোচনা করিয়াছি। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এবং দেহের চিহ্ন সকল এবং আমি যে সকল ব্যাপার দেখিয়াছি এবং তৎসহ হাতের লেখা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করিতেছে যে সেই কুমার কিন্তু আমি দার্জ্জিলিঙের মৃত্যুর ন্যায় এ বিষয়ের সাক্ষ্যেরও আলোচনা করিব এবং এই বিতর্কে মেজকুমারের বিদ্যাবত্তাই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছে।

প্রতিবাদী পক্ষের বক্তব্য এই যে ১৯২১ সালে বাদী হিন্দী বলিত এবং তাহা অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য হিন্দী অর্থাৎ পাঞ্জাবী ভাষা, এবং কমিশন সাক্ষী মি. ঘোষালের নিকট এই উক্তি করা হইয়াছিল যে ১৯২৪ সালে যখন ঘোষাল বাদীর সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন বাদী বাংলা বলিতে পারিত না। এই বলা হইয়াছে যে বাদী পরে ইহা শিক্ষা করে এবং তাহার ফল প্রাথমিক জবানবন্দীতে দেখা গিয়াছে।

বাদীর বক্তব্য এই যে সে হিন্দী বলিত এবং প্রায় ১২ বৎসর ধরিয়া সে সন্ন্যাসীদের সহিত বাস করিয়াছিল, তখন সে কেবল হিন্দীই বলিত এবং ৪/৫/২১ তারিখে তাহার আত্মপরিচয় পর্যন্ত সে কেবল হিন্দীই বলিত, এবং তারপর সে বাংলা বলিতেছে। মেজকুমার পূর্বে নিছক ভাওয়ালী ভাষায় কথা বলিত কিন্তু সে হিন্দী বলিতেও পারিত। তাহার ভাওয়ালী ভাষা এরূপ ছিল যে একবার কলিকাতায় সাক্ষী যে তাহাকে ১৯০৬ এবং ১৯০৮ সনে দেখিয়াছে সে বলিত সে উহা প্রায় বুঝিতেই পারিত না (বাঃ সাঃ ২১২) পুস্তক পড়িয়া যাহার ভাষা মার্জ্জিত হয় নাই এরূপ অশিক্ষিত লোকের ভাওয়ালী ভাষা পশ্চিমবঙ্গের অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারে।

আদালতে বাদী বাংলা ভাষায় সাক্ষ্য দিয়াছিল, এবং সে যে কতকগুলি হিন্দী কথা ব্যবহার করিয়াছিল আমি সে কথাগুলি হিন্দী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহা প্রতিপন্ন হইল যে আমি যেগুলি হিন্দী ভাবিয়াছিলাম এরূপ কতিপয় কথা বাস্তবিক স্থানীয় কথা। উদাহরণস্বরূপ তিতর কথা পশ্চিমবঙ্গে কথাটি হইতেছে 'তিতির' (পালি)। ইহা লেখা যাইতেছে যে ভাওয়ালে এই শব্দটি 'তিতর' উচ্চারিত হয়। সেইরূপ গিন্‌তে পশ্চিমবঙ্গে কথাটি হইতেছে 'গুণতে' (গননা করিতে), কিন্তু প্রতিবাদীপক্ষ এক উকিল সাক্ষীকে প্রশ্ন করিবার সময় 'গিনিতে' কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে ভাওয়ালের নিরক্ষর লোকে ওইরূপ ব্যবহার করে। (বাঃ সাঃ ৫২০) কলিকাতার হিন্দী উচ্চারণ 'কল্‌কাত্তা'। কিন্তু একজন ভাওয়ালের লোকের দ্বারা লিখিত একটি বাংলা-পুস্তিকায় কলকাত্তা দেখিয়াছিলাম (একজিবিট টি) ফণীবাবুর জয়দেবপুরের বাড়ীর নাম নয়া বাড়ী। যদি উহা জানা না থাকিত এবং বাদী যদি বাড়িটিকে নয়াবাড়ী বলিত তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হিন্দুস্থানী বলিয়া ধরা হইত। কথার উপর সিদ্ধান্ত করা বিপজ্জনক।

এরূপ করিবার প্রয়োজনও নাই। কারণ এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে বাদী হিন্দী বলিয়া ফেলিত এবং উহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিত। সে ইংরাজিও বলিয়া ফেলিত—৫০-এর অধিক ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল—যথা বিস্কুট, বডিগার্ড, জেলী, রুল, জজ ইত্যাদি। আমার ধারণা এমন কোনো ভারতবাসী নাই যে কতকগুলি

ইংরাজী কথা জানে না, যথা ট্যাক্স, ট্রেন, রেলওয়ে, গার্ড, ডাবস্ এবং যাহারা ইংরাজী জানে তাহারা তর্কের খাতিরে না হইলে পাঁচ মিনিট ধরিয়া ইংরাজী কথার ব্যবহার না করিয়া বাংলায় কথা বলতে পারে না।

সুতরাং বাদী যখন সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ১২ বছর ধরিয়া বাস করিতেছিল এবং হিন্দী ব্যতীত কিছুই বলে নাই, এবং তাহাদের মত জীবনযাপন করিতেছিল নিসঙ্গভাবে—বেড়াইতেছিল, খোলা ভূমিতে শয়ন করিত, বালিশের পরিবর্তে কাঠের গুঁড়ি মাথায় দিত এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিত এবং এই সমস্তই সময় তাহার যৌবনের প্রথম অবস্থায় করিয়াছিল, তখন আমি আশা করি যে সে তাহার মাতৃভাষার মতোই হিন্দী বলিবে এবং তাহাদের কথার টান ও উচ্চারণ ভঙ্গি লাভ করিবে, সুতরাং সে যখন আবার বাংলা বলিতে আরম্ভ করিল তখন আমি আশা করি না যে সে মধ্যে মধ্যে বাংলা বলিবে না, বা আদৌ হিন্দী বলিবে না বলিয়া সম্ভাবনা করিবে।

কেহই এমন কথা বলে না এবং ইহা বলাও বোকামি হইবে যে যেমন সে আত্মপরিচয় ঘোষণা করিল অমনি সে যেমন লোকে কাপড় ছাড়িয়া ফেলে তেমনি সে হিন্দীভাষা পরিত্যাগ করিবে। সুতরাং ইহা দেখিতে হইবে যে এই হিন্দীসুর ও মধ্যে মধ্যে এই হিন্দীবুলির এবং হিন্দীসুরে ভাওয়ালীবুলি ভাওয়ালীর মতো না বলা ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় যে—একজন হিন্দুস্থানী বাংলা বলিতে শিখিয়াছে, না একজন বাঙালী কথা বলিবার হিন্দী ধরন অৰ্জ্জন করিয়াছেন।

এই বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে দুইটি জিনিস অবিলম্বে বৰ্জ্জন করা ভাল, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে এই মত যে, কোনো বাঙালী যতদিনই হিন্দীভাষী লোকেদের মধ্যে বাস করুক না সে হিন্দী টান লাভ করিতে পারে না। অভিজ্ঞতা ইহা অস্বীকার করিতেছে। মিঃ ও, সি বাঙালী, কলিকাতার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তিনি সলিসিটর ও বিখ্যাত কলাবিদ্। তিনি এই মত পোষণ করেন যে সকল বাঙালী তাহাদের পরিবার লইয়া পশ্চিমে বাস করেন তাহাদের সম্বন্ধে একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু যখন বলা হয় যে বাংলাভাষার উচ্চারণভঙ্গী, হিন্দী বা বিদেশী দোষশূন্য তখন আমি তাহার সহিত একমত নহি। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করা দরকার বোধ করি না কিংবা যাহারা ইংরাজী ধরনে ইংরাজী বলে সেরূপ ভারতবাসীদের উল্লেখ করি না, কারণ আমার সামনে একজন বাঙালী সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং তাহার উচ্চারণের টান হিন্দুস্থানী, সুতরাং তিনি যদি ভিন্নপক্ষে কথা বলিতেন তাহা হইলে কেহই মনে করিত না যে তিনি বাঙালী। তিনি স্বামী নিত্যানন্দ সরস্বতী

(বাঃ সাঃ ৯৯০) তাঁহার বয়স ৫৩ বছর এবং তিনি ২২ বছর বয়স হইতে প্রায় দেড় বছর পূর্ব পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের সহিত বাস করিয়াছেন ও ফিরিয়াছেন। অমলেন্দু নামক আর একজন সাক্ষী ঢাকার সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার পিতা স্বামী বিষ্ণুজিৎ প্রায় ১২ বছর পূর্বে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন এবং একবার যখন তিনি বাড়ীতে দেখা করিতে আসেন তখন তাঁহার কথার টান হিন্দী হইয়াছিল।

আর একটি বিষয় হইতেছে বাদীর কথায় সামান্য বাধ বাধ ভাব। সাক্ষীগণ ইহাকে বলিয়াছে, বাজা বাজা, ভার ভার, চিবান চিবান, আটকা আটকা, ঠেকা ঠেকা, চাপা চাপা, আরা আরা, যেন কথাগুলি উঠিতেছে কিংবা চিবাইয়া বলা হইতেছে, যেন জিহ্বায় আটকাইয়া যাইতেছে, অস্পষ্ট হইতেছে, মন্থর গতিময় হইতেছে, অস্পষ্ট, ভারী ইত্যাদি। জিনিসটি বর্ণনা করা অসম্ভব কিন্তু কথা বলিবার সময় মুখে একটা জিনিস রাখিলে যেরূপ হয় কতকটা সেরূপ। মি. চৌধুরী বলিতেছেন যে, ভাষা তাহার নিজের নয়, তাহাই বলিতে যাওয়াই এরূপ ইতস্ততঃ হইতেছে, এবং বাহ্যতঃ এই কারণে প্রতিবাদীপক্ষের কোনো সাক্ষী এই লক্ষণটির উল্লেখ করে নাই, কারণ তাহারা বলিয়াছে যে— তাহারা ইহা বলিতে বাধ্য যে তাহারা তাহাকে হিন্দী বলিতে শুনিয়াছে, অবশ্য ইহা কত দূর সত্য তাহা পরে দেখা যাইবে। উহা সেরূপ কিছুই নহে। উহা তাহার কথা বলার একটা বিশেষ লক্ষণ। মি. ষ্টিফেন যাহার কাছে বাদী হিন্দীতে কথা বলিয়াছেন, তিনিও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি রামরতন সিবা মাসে পাঁচশত টাকা বেতনের উচ্চপদের ইঞ্জিনিয়ার এবং তিনি একজন পাঞ্জাবী। ১৯২৫ সালে তিনি ৭নং বোস-পার্কে বাস করিতেছেন। বাদীর সহিত প্রায়ই হিন্দীতে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইত। তিনি এই অস্পষ্টতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে বাদীর হিন্দী হইতেছে বাঙালীর হিন্দী। সে বাংলা কথা মিশাইয়া কথা বলিত এবং তাহার মতে পাঞ্জাবীর পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব হইত। আমি এই সাক্ষীকে বিশ্বাস করি।

আমি এবিষয়ে একমত নই যে বাদীকে তাহার বাক্যের এই বিশেষ লক্ষণ ব্যাখ্যা করিতে হইবে নচেৎ অন্য উপায়ে লব্ধ-সনাক্ত নষ্ট হইবে।

যদি ইহা জন্মগত না হয় তাহা হইলে যে সনাক্ত অন্যভাবে পরিষ্কার তাহা ইহা দ্বারা আদৌ নষ্ট হয় না। তাহার জিহ্বার তলস্থ পূষকোষের দ্বারা এরূপ হইতে পারে কিংবা ইহা তাহার জন্য নয় এবং বাদী বা অন্য কেহ বিষ বা অন্য কোনো কারণের উল্লেখ করিতে পারিত এবং আসল কথা এই হইতে পারে যে কেহই ইহার কারণ জানে না। কিন্তু এইরূপ হইয়াছে। এইরূপ ঘটা যদি অসম্ভব হইত, তাহা হইলে হয়ত সনাক্তকরণের সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকিত, কিন্তু পূষকোষ সিফিলিস, জিহ্বার ওপরের

দাগ এবং অজ্ঞাত অন্য কোনো কারণের কথা বিবেচনা করিলে কেন যে ইহা ঘটা সম্ভব নয় তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। এবিষয়ে জল্পনা কল্পনা করা নিরর্থক—যেরূপ জল্পনা কল্পনা বাদীর বা তাহার অপর লোকে করিয়াছে—কিন্তু অসম্ভবের কথা বলিতে গেলে উভয় পক্ষে কোনো বিশেষজ্ঞ একথা বলে নাই যে ইহা অর্জ্জন করা যায় না কিংবা বাকযন্ত্রের যথেষ্টরূপ দোষ না থাকিলে যথা চেরা জিহ্বা না হইলে ইহা হইতে পারে না। অসম্ভব সম্বন্ধে বলিতে গেলে ডাক্তার টমাসের Reading in abnormal Psychology নামক পুস্তকে ৩৯১—৫১৪ পৃষ্ঠায় বাক্ বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটি অধ্যায় আছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উহাও লিখিত আছে যে মহাযুদ্ধের সময় যে সকল সৈন্যগণের স্নায়বিক অবসাদ ঘটে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের বাক্‌দোষ রোগ দেখা গিয়াছিল—ইহা ছিল এক রকম তোতলান এবং ইহার নাম হইয়াছিল 'যুদ্ধ-তোতলান'। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকদিনের মধ্যেই—কথা বলিবার অবস্থা ভাল হইয়া গিয়াছিল কিন্তু শতকরা ৫টি ক্ষেত্রে এই অবস্থা বদ্ধমূল হইয়াছিল এবং এখনও এমন অনেক সময় প্রত্যাগত সৈনিক আছে যাহাদের বাক্য-কথনে বিশৃঙ্খলা রহিয়া গিয়াছে। (পৃষ্ঠা ৩৯২)

আমি সাব্যস্ত করিতেছি যে এই বাক্য-কথনে বিশৃঙ্খলা জন্মগত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, এবং ইহা অন্য ভাষা বলিবার দ্বিধাবোধের জন্য নহে।

বাদীর বাক্য কথন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে এরূপ বহু প্রমাণ আছে যে সে তাহার স্বরূপ ঘোষণা করার পর সে বাঙ্‌লা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভগ্নিও ও আত্মীয়গণের কথা ছাড়িয়া দিয়াও এমন বহু সংখ্যক সাক্ষী যাহারা ১৯২১ সালের কথা বলিয়াছে। এই সকল সাক্ষীর মধ্যে রহিয়াছে বাঃ সাঃ ৬২ রেবতী বসু—উকিল যাহার কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঃ

বাঃ সাঃ ২৬৩ 'যোগেশ রায় বি, এ, হেড্ মাষ্টার, যাহার কথা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি (জুন ১৯২১)

বাঃ সাঃ ৩৫৫ পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, ঢাকার প্রকাশ পত্রিকায় সহসম্পাদক এবং পক্ষিতত্ত্ববিদ্। ইনি সনাক্তকরণের সাক্ষী নহেন। (জুন ১৯২১)

বাঃ সাঃ ৩৮৭ অরুণ নাগ (মে ১৯২১)

বাঃ সাঃ ১৫৫ মণীন্দ্র বসু, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট প্রবীণ অধ্যাপক অক্টোবর ১৯২১)

বাঃ সাঃ বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায় হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট (কমিশন সাক্ষী), ইনি

বহুকাল ধরিয়া হাইকোর্টে ভাওয়াল এষ্টেটের উকিল ছিলেন।

আমি মাত্র কয়েকটি নাম নির্ব্বাচিত করিয়াছি, কিন্তু আরও অনেক রহিয়াছে তাহারা ভাওয়ালের লোক, সেই মেজকুমার ঢাকায় যে সকল লোকের সহিত মিশিয়াছিলেন সেই সকল লোক, এবং তাহারা তাহার সহিত কথা বলিয়াছিল এবং সেও তাহাদের সহিত কথা বলিয়াছিল, এবং তাহারা সকলেই বলিতেছিলেন, বাদী হিন্দীসুরে বাংলাতে বলিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করিতেছে যে সে হিন্দী কথাও ব্যবহার করিয়াছিল এবং যে সকল লোক হিন্দীতে কথা বলিয়াছিল তাহাদের সহিত সময় সময় হিন্দীও বলিয়াছিল। অসংখ্য লোকে তাহাকে জয়দেবপুরে ও ঢাকাতে নিশ্চয়ই দেখিয়াছিল এবং নিশ্চয়ই তাহার সহিত কথা বলিয়াছিল এবং যাহাদের মধ্যে— বাদীর অবশ্য অনেকগুলি সাক্ষী আসিয়াছে।

বিবাদী পক্ষের কয়েকটি সাক্ষী—লক্ষ্যের বিষয়

কিন্তু প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষী ২/৩ জন মৈমনসিংহের অতি নিঃস্ব উকিল ও নারায়ণগঞ্জের ২ জন যুবক মোক্তার এবং একটা লোক যে পূর্ব্বে চরসিন্দুর স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিল এবং তাহার নিজ সাক্ষ্যমতে মাহিনাচুরির জন্য কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, এবং এরূপ সন্দিগ্ধ চরিত্রের অপর কতিপয় ব্যক্তিকে মাত্র সাক্ষ্যরূপে আনিয়াছে। যাহা হউক কতিপয় অন্য লোকও আছে এবং তাহাদের সাক্ষ্য সম্যক বিবেচিত হইবে।

১৯২১ সাল সম্বন্ধে বলিতে গেলে, বাদী যে পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলিতেছিল এবং বাংলা ভাষার একটা কথাও বুঝিতে পারিত না, এই ব্যাপারটি—অজুলার সাক্ষীগণ যাহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছিল অর্থাৎ সে যে নানকানা হইতে আসিতেছে এই ঘটনার সহিত সঙ্গতি-বিশিষ্ট ছিল। কিন্তু ইহা তর্কের অযোগ্য। নদীর ধারে লোকে তাহার সহিত বাংলায় কথা বলিত। দেবব্রত বাবুর সাক্ষীই এবিষয়ে চূড়ান্ত।

তাহার আত্মপরিচয়ের পর ১৯২১ সালের মে মাসে জয়দেবপুরে যে বাংলায় কথা বলিতেছিল, হিন্দীটানে বাংলা এবং হিন্দী কথা মিশান বাংলা, এ বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। মিস্টার নিড্‌হ্যামের রিপোর্টে একজিবিট ৫৯ বলিতেছেন যে লোকটি বাংলা বুঝিতে পারিত না। কিন্তু যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডস বাদীর বিরুদ্ধে গিয়াছিল, সেই সময়ে ৬ই মে তারিখে লেখা মোহিনী চক্রবর্ত্তী রিপোর্টে লোকটিকে প্রতারক বিবেচনা করিবার কারণ স্বরূপ বাংলা বলিবার বা বুঝিবার অজ্ঞতার বিষয়

উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার আর একটি কারণ দেখিতেছি। প্রতিবাদী পক্ষ পাঞ্জাব হইতে যে সকল সাক্ষী আনয়ন করিয়াছেন তাহারা আদালতের এই উপকার করিয়াছে যে আদালত দেখিতে পাইয়াছে যে পাঞ্জাব হইতে নবাগত ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করে এবং আমি বিবেচনা করি যে তাহাদের মধ্যে সেই যদি বাঙালী হইবার ভান করিত তাহা হইলে সে হাস্যস্পদ হইত। সে বাংলা ভাষার একটি কথাও বুঝিতে পারিত না এবং তাহার সমস্ত আচরণ তাহাকে ধরাইয়া দিত এবং পাগল না হইলে কোনো ব্যক্তিই স্বপ্নেও তাহাকে বাঙালী বলিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিত না এবং অনুসন্ধান দাবী করিতে কালেক্টারের সম্মুখে হাজির করিত না। রায় সাহেবের তৎনমুনা সাক্ষ্যের মধ্যে—এই কথাটী আছে যে বাদী বাংলা বলিতে পারিত না এবং তিনি এক্ষণে যে সাক্ষাৎকারের কথা বলিতেছেন ওই সকল সাক্ষাৎকার পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করা হইয়াছিল এবং পূর্ব্বে যাহা উল্লিখিত হয় না এইরূপ হিন্দী কথাও বলা হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই—এই বক্তব্যের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বাদীকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কিন্তু প্রমাণ করা যায়। পূর্ব্বে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিত না।"

১৯/৫/২১ তারিখে জয়দেবপুরে থানার রেজেস্টারীতে নিম্নলিখিত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

বৈকাল ৪টা। গতরাত্রে এক প্রবল ঝড় হইয়াছিল এবং তাহাতে বাসার বেড়া উড়িয়া গিয়াছে। এই এলাকায় কোন শান্তিভঙ্গের বা—সংক্রামক রোগের খবর নাই। লোকে দলে দলে সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিতেছে এবং বলিতেছে যে 'মেজ কুমার' এবং সন্ন্যাসী—লোকের সহিত বাংলায় কথা বলিতেছে। টাকায় ৬ সের চাউল বিক্রয় হইতেছে। সাবইনস্‌পেক্টার আবদুল করিম (প্রঃ সঃ ১০২৮) তাহার কার্য্যকালে রেজেষ্টারীতে এই বিষয়টা লিখিয়াছে এবং—বাদীর সাক্ষ্যরূপে তাহাকে ডাকা হইয়াছিল, সে এখনও চাকরী করিতেছিল—এবং সে কুমারের হইয়া কারও সঙ্গে একটি কথাও বেশি বলিত না। ১৯১১ সালের ৫মে তারিখে যখন রায়সাহেব মোহিনীবাবু, সাবরেজিষ্টার গৌরাঙ্গ, বাবু ও অপর কতিপয় ব্যক্তি বাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছিল, এবং তাহাকে পরীক্ষা করিতেছিল এবং যে দিন তাহাকে পাখী মারা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় এবং যাহার বিবরণ মোহিনী বাবুর ৬/৫/২১ তারিখে রিপোর্টে দেখায়, সেই দিন আব্দুল হামিদ লিখিয়াছে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই আব্দুল হামিদই মানহানির মোকদ্দমায় তাহার বিবৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সে-ও বলিতেছে—

এই মোকদ্দমায় বাদীকে আমি দেখিয়াছি। আমি তাহাকে কথা বলিতে শুনিয়াছি। সে হিন্দীটানে বাংলা বলেন, আমি যখন ১৯২১ সালের মে মাসে জয়দেবপুরের

অফিসার ছিলাম যেন আমি তাহাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়াছি। আমি তাহার কথায় আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ছিলাম। উহা অস্পষ্ট ছিল। জেরার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে বাঙালায় বাঙালীর পক্ষে বাংলা কথা বলা আশ্চর্য্য কিনা। সে বলিয়াছিল না। ডাইরিতে উহা লিপিবদ্ধ করার কি প্রয়োজন হইয়াছিল প্রশ্ন করায় সে বলিয়াছিল—বোধ হয় সম্ভবত সে পূর্ব্বে বাংলা বলিতেছিল না। সে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে এই তারিখে বাদী বাংলা বলিতে ছিল না—সে বলে যে একটি নাম দিয়াছিল এবং আর ১ জন যে বাদী ১৯শে মে তারিখের পূর্ব্বে বাংলা কথা বলিতে পারিত কিনা সে সম্বন্ধে তাহার কোনো ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই। কিন্তু এই সাক্ষী সত্যই তাহার সহিত কথা বলিয়াছিল, কিন্তু উহা ১৯শে মে-এর পূর্ব্বে কি পরে তাহা স্মরণ করিতে পারিতেন না এবং তাহার সাক্ষ্য এই যে বাদী হিন্দীটানে বাংলা বলিতেছিল।

এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, বাদী হিন্দীও বলিত বা হিন্দীকথা ব্যবহার করিত, সুতরাং বাদীর পক্ষে সাক্ষীরা বলিয়াছে যে সে হিন্দীতে কথা বলিত ও হিন্দীসুরে বাংলা বলিলে তাহা অধিকাংশ গ্রামবাসিগণের নিকট হিন্দী বলিয়া বোধ হইবে—এইরূপ হিন্দীসুর উচ্চারিত একটি বাংলা বাক্য প্রতিবাদী পক্ষের এক সাক্ষীর নিকট হিন্দী বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। (প্রঃ সাঃ ৮৫), এবং যদি তাহার কথা বলিবার দরকার না হয় তাহা হইলে কেহই ইহা লক্ষ্য করিবে না বা স্মরণ করিবে না যে উহা সুর হইতে পৃথক্ ছিল। এই ব্যাপারের সারমর্ম্ম এই যে বাদী ১৯২১ সালের মে মাসে বাংলা বলিতে পারিত, এবং সে হিন্দীভাষা সযত্নে পরিত্যাগ করিত কিনা তাহা নহে।

আমি দেখিতেছি যে বাদী ১৯২১ সালে মে মাসে বাংলা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং যে সকল সাক্ষী বলিতেছে সে ওইরূপ করিয়াছিল এবং তাহারা তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল এবং সে তাহাদের সহিত কথা কহিয়াছিল এবং তাহারা অতীত দিনের কথা গল্প করিয়াছিল সেই সকল সাক্ষীকে অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই সকল সাক্ষীদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহাদিগকে আমি অবিশ্বাস করিব না, এবং নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলির দ্বারা তাহাদের মত দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

১৯২২ সালে বাদী বাংলা বলিতেছিল (বাঃ সাঃ ৪৫৮ ভূপেন, বাঃ সাঃ ৯১৪ বিলাস বাবু বি, ই, ইনি অমৃতসরে একটা বড়ো চাকরি করিতেন, এবং অন্যান্য সাক্ষিগণ)। সে যদি বাংলা বলিতে না পারিত তাহা হইলে জনতার মধ্যে নিজেকে উপহাসাস্পদ না করিয়া সে যে এই বৎসর রাণী সত্যভামার শ্রাদ্ধ করিতে পারিত ইহা—আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।

১৯২৪ সালে মাণিকগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার কে, সি, চন্দ্র আই, সি,

এস, ঢাকার যে বাড়িতে বাদী বাস করিতেছেন, তথায় তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। মিষ্টার চন্দ্র বলিতেছেন—"সন্ন্যাসীর সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইল। সন্ন্যাসীর সহিত আমার বাংলায় কথাবার্ত্তা হইল। এই সাক্ষাৎকার প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া চলিয়াছিল। বাদী কি ধরনের বাংলা বলিয়াছিল প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন—"প্রশ্ন বা উত্তরের ঠিক কথাগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে কিন্তু আমার এই ঠিক ধারণা আছে যে সন্ন্যাসী হিন্দী ও বাংলা মিলাইয়া বলিয়াছিল এবং বাংলা ভাষা পশ্চিমের লোকের বাংলা ভাষার মতো দোষ হইতেছে।" আর একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে "ব্যাকরণ ও শব্দরূপগুলি সবই ভুল ছিল।" সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বাদী বাংলা বলিতেছেন এবং উহা যদি হিন্দীটানে ভাওয়ালী বাংলা হয় কিংবা আগন্তুক পূর্ব্ববঙ্গের লোক নহে বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মানার্থ হিন্দীটানে কলিকাতার বাংলা বলিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ১১ বৎসর পরে স্মৃতি যে ধারণা জন্মাইয়া তুলিয়াছিল মনের মধ্যে সেই ধারণা রাখিবার পক্ষে উহা যথেষ্ট ছিল।

এই ক্ষেত্রে মি. চন্দ্রকে হিন্দী বলিতে হয় নাই, এবং বাদী যখন পরে কলিকাতায় মি. ঘোষালের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন যে তিনি বাংলা বলিতে পারে নাই, বলা হইয়াছে এই সাক্ষী তাহার উত্তরস্বরূপ। ইহা ১৯২৪ সালে জুলাই মাসের কাছাকাছি কলিকাতায় হইয়াছিল। সে তাহার সহিত কয়েক দিন পর সাক্ষাৎ করিয়াছিল। তিনি কথাগুলি লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দীটান লক্ষ্য করেন নাই। বাদী এই বৎসর বড়ো রাণীর (২নং প্রতিবাদীর) সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। বাদী কি ভাষায় কথা বলিয়াছিল তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। ১৯২৫ সালে বাদী রেভিনিউ বোর্ডে তদানীন্তন মেম্বার মি. জে, এন, গুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করে। মি. জে, এন, গুপ্ত দুই এক মিনিট তাহার সহিত কথা বলেন, তাহার 'খোট্টা টান' লক্ষ্য করেন এবং সিদ্ধান্ত করেন যে একজন পশ্চিমদেশীয় প্রতারক, সে আদৌ বাংলা বলিতে পারিত না, এবং সে যে বাংলা কথাগুলি ব্যবহার করিত সেগুলি 'খোট্টা টান' বিশিষ্ট ছিল। অন্য কথাগুলি কোন্ ভাষায় ছিল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতে পারেন নাই, "আমরা কয়েকটি কথামাত্র বলিয়াছিলাম।"

কথা হইতেছে হিন্দীটানে কথা বলিলে তাহার বিরুদ্ধে লোকের মনে যে বিরুদ্ধভাবের সঞ্চার হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। প্রতিবাদীগণ উহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তাহাকে চিনিত তাহাদের পক্ষে উহা কিছুই করিতে পারে নাই, এবং সম্পূর্ণ অনুসন্ধানের পর সনাক্ত সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহাও বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

মি. শরদিন্দু ও মি. ও, সি. গাঙ্গুলীর সাক্ষ্যও মি. জে. এন, গুপ্তের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই এবং একই কারণ দ্বারা উহার বাখ্যা করা যাইতে পারে। তা ছাড়া এই দুই ভদ্রলোকের ব্যাপারে আরও একটি কারণ আছে। তাহারা কলিকাতাবাসী বাঙালী, তাহারা ভাওয়ালী বাংলা জানে না, তাহারা যে কথা শুনিয়াছিল উহা হিন্দীটানে কলিকাতার বাংলা বলিতে চেষ্টা করা বাদীর পক্ষে হিন্দী বলাই সহজ ছিল এবং মি. গাঙ্গুলী বলিতেছেন যে এই ব্যাপার কোনোরূপে গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া সে হিন্দী বলিয়াছিল। একজন সাক্ষীকে এই প্রমাণ করিতে আনা হইয়াছিল যে ১৯২১ সালে বাদী স্বীকার করিয়াছিল যে সে বাংলা বুঝিতে পারিত না, এই সাক্ষীর সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলিতে চাহি যে ইহার প্রতিকূলে সমস্ত সাক্ষীর ভার সে বিচ্যুত করিতে পারে না। বাদী যদি প্রতারকই হইবে তাহা হইলে সে যে বলিবে 'বাংলা বুলি নেহি আতা' ইহা আমি অসম্ভব বলিয়া মনে করি ; কিংবা তাহা হইলে সে যে বাহিরে বসিয়া থাকিয়া সকলের সহিত দেখা করিবে তাহাও আমি অসম্ভব মনে করি। আমার বোধ হইতেছে যে, এই একমাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্যের কারণ এই—যেমন ইহা দেখা গেল যে হিন্দীসুরে বাংলা বলিলেও সনাক্ত প্রমাণ হইবে অমনি বাদীর স্বীকারোক্তির প্রমাণ আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইল। সুতরাং বাদীর মুখে সত্যসত্যই স্বীকারোক্তি আরোপ করা হইল—অবিরত এইভাবে নানা জিনিস তাহার সাক্ষ্য দেওয়ার পর তাহার মুখে আরোপ করা হইয়াছে। বাদী যদি একটিও বাংলা কথা না জানিত তাহা হইলে ১৯২১ সালের যেখানে সে অবস্থায় উদয় হইয়াছিল তাহা হইত না। ২৪২ নং প্রঃ সাক্ষীর সাক্ষ্য অপেক্ষা থানার রিপোর্টের পোষকতা সম্বলিত হইতে আব্দুল হামিদের (বাঃ সাঃ ১০২৮) সাক্ষ্য আমি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে করি।

আমার মতে এ বিষয়ে দুইটি সাক্ষাৎকার চূড়ান্ত বলিয়া মনে হয়, বাদীর সহিত ব্যারিষ্টার এন. কে, নাগের সাক্ষাৎকার ও বাদীর সহিত রাজেন শেঠের (প্রঃ কমিশন সাক্ষী) সাক্ষাৎকার। এই দুই সাক্ষাৎকার কলিকাতায় হইয়াছিল, প্রথমটি ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে এবং শেষোক্ত উহারই কাছাকাছি কোনো সময়ে। এই দুইটিরই আমি পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়াছি। এই দুইটিতে দেখা যায় যে একজন-বাঙালী আর একজন বাঙালীর সহিত কথা বলিতেছে—ইহা ভুল হইবার কিছুই নাই এবং উহাতে হিন্দীর কিছুমাত্র ইঙ্গিত নাই এবং কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

আমি আর একটি ব্যাপার বলিতেছি—১৯২৯ সালে ঢাকায় ১৪১ ধারার মামলায় মিষ্টার মার্টিনের আদালতে বাদী প্রকাশ্য সাক্ষ্য দিয়েছিল, ওই মামলায় মোহিনী বাবুও

এস্টেটের অপরাপর কর্ম্মচারীরাও সাক্ষ্য দিয়াছিল। কেহই বলিতেছে না যে সে হিন্দিতে সাক্ষ্য দিয়াছিল। ফণীবাবু ও মানুক ছাড়া আর কেহই এই সাক্ষ্য অস্বীকার করিতেছে না যে তাহার কণ্ঠস্বর মেজকুমারেরই কণ্ঠস্বর, এবং ফণীবাবুর অস্বীকারের কোনই মূল্য নাই—এবং মানুক একটা বাজে লোক এবং সে সম্ভবতঃ কণ্ঠস্বর কথাটি একই অর্থে ব্যবহার করিতে ছিল না। যদি কণ্ঠস্বরে কোনো পার্থক্য থাকিত উহা তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হইত এবং—১৯২১ সালের ৬ই মে তারিখের রিপোর্টে লিখিত হইত।

ভাষা ছাড়াও ইহা দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছিল যে, বাদীর মন এক অবাঙালীর মন এবং এই চেষ্টা বাদীর জেরার সময় করা হইয়াছিল। আমি এক্ষণে জেরার সে অংশের আলোচনা করিব।

এই বিষয়েই জেরা সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং বাদীকে কথার ঘূর্ণিপাকে ও শ্লেষোক্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। শিক্ষিতলোকে অশিক্ষিত অন্তঃকরণের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিবার শক্তি সহজেই হারাইয়া ফেলে এবং নিরক্ষর লোকের পক্ষে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন শব্দের মতো এবং দ্ব্যর্থক বাক্যের মতো হেঁয়ালি আর কিছুই নাই। খুব কম অশিক্ষিত ব্যক্তিই একটি অর্থ হইতে অন্য অর্থ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারে। জেরার এই অংশ কেবল ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে বাদীর এই শক্তি নাই। উদাহরণস্বরূপ তাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—

প্র:। শ্বেত, বর্ণের অর্থ কি?
উ:। সাদা।

প্র:। রক্ত বর্ণের?
উ:। লাল।

প্র:। ব্যঞ্জন বর্ণের?
উ:। বেগুনের মতো রঙ।

প্রথম দুইটির উত্তর ঠিকই হইয়াছিল এবং বর্ণ শব্দের অর্থ রঙ, কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণে বর্ণ শব্দের অর্থ অক্ষর এবং ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দটির অর্থ ব্যঞ্জন অক্ষর। বাদী উহা জানে না এবং রঙ অর্থটি তাহার মনে ছিল। ইহার ব্যাখ্যা অতি সুস্পষ্ট, এইরূপ বলা হইতেছিল সে ব্যঞ্জন শব্দের অর্থ পাঞ্জাবীতে 'বেগুণ' যতক্ষণ না মি. রামরতন সিবা (বাঃ সাঃ ৯৩৫) নামক এক পাঞ্জাবী এই ব্যাপারের সমাধা করিলেন।

শ্লেষোক্তির দ্বারা উপস্থাপিত না হইলেও ব্যঞ্জনবর্ণ শব্দটির অজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিতে

গেলে এমন লোক আছে যে a. b. c. d. ইত্যাদি জানে অথচ consonent কথাটি জানে না।

অধিকাংশ অজ্ঞতাই এইরূপ কথার ওপর মারপ্যাঁচের দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট ভাগ আমি এক নিরক্ষর বাঙালীর পক্ষে আশা করিতে পারিতাম। এই দ্বার্থক বাক্যগুলির আলোচনা করিতে গেলে অনর্থক সময় নষ্ট হইবে এবং আমি বিশ্বাস করি না যে প্রতিবাদীপক্ষ বাদীকে বাস্তবিকই যদি হিন্দুস্থানী বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে উহা সাধারণে প্রকাশ করিয়া দিবার অন্য কোনো উপায় ভাবিতে পারিত না। হিন্দুস্থানীর মনের এরূপ একটা গঠন আছে যে যাহা বাংলা দেশে বহুকাল বাস করিলেও নষ্ট হয় না, বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় না, এবং উহা বাহির করিয়া ফেলিতেও খুব বেশি কৌশলেরও প্রয়োজন হয় না, বিশেষতঃ যখন ইহা জানা ছিল যে বাদী নিরক্ষর এবং জড়বুদ্ধিসম্পন্ন।

ভাষাজ্ঞানের ...

এ বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র চেষ্টা করা হইয়াছিল, বাদীকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, এক লাইন বাংলা গান বলিতে পারে কিনা এবং সে ছেলে-ভুলানো ছড়া জানিত কিনা। সে বলিয়াছিল যে সে পারে না এবং ছেলে-ভুলানো ছড়া সম্বন্ধে বলিয়াছিল: "স্ত্রীলোকেরা এইগুলি আবৃত্তি করে।" আমি পূর্বেই এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছি— এই গানের বিষয়। শিক্ষিত না হইলে এবং শিক্ষিতের মতো মানসিক নিঃসঙ্গতা অর্জ্জন না করিলে খুব অল্প বাঙালীই অনেক লোকের মধ্যে স্বীকার করিবে যে সে গান জানে, গান করার কথাতো দূরে থাকুক, আর ছেলে-ভুলানো ছড়ার সম্বন্ধে নিরক্ষর লোকে ভাবিবে যে স্ত্রীলোকেরাই উহা আবৃত্তি করে এবং পুরুষের উহা জানা উচিত নহে। মিষ্টার চৌধুরী অবশ্য একটি ছড়া আবৃত্তি করিয়া গ্রাম্য হওয়ার ভয় ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন। এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সে উহা জানে না কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছড়াটি আদৌ পূর্ব্ববঙ্গের ছড়া নহে। তিনি তাহাকে এই ছড়াটি বলেন—

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কীসে?

ভাষাতেই দেখা যাইতেছে যে এটি আদৌ পূর্ব্ববঙ্গের ছড়া নয় এবং বিষয়বস্তুও

পূর্ব্ববঙ্গের নহে। পূর্ববঙ্গে বর্গীরা ও মারাঠারা কখনও গিয়া দেখা দেয় নাই। আজকাল ছেলে-ভুলোনো ছড়া ছাপা হইতেছে এবং প্রাদেশিক সীমা অতিক্রম করিতেছে (প্রঃ সাঃ ৯৩ গিরিশ নামক এক পণ্ডিতের সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) এই সাক্ষী স্বীকার করিতেছে যে ছড়াগুলি এখানে ছাপান পুস্তকে পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু বলিতেছে যে, সেই ছড়া সে সমস্ত জীবন ধরিয়াই বলিত। এটি আবৃত্তিও করিতে বলায় সে প্রথম জবানবন্দীতে যে আকারে বলিয়াছিল এবং বাদীর যে আকারে বলা হইয়াছিল তাহা হইতে বিভিন্ন আকারে আবৃত্তি করিল এবং 'নিমুর' পরিবর্তে দিব কথাটি ব্যবহার করিতে ধরা পড়িল। সে একটি ছাপা বই হইতে শিখিয়াছে এবং এখনও উহা খুব ভালো করিয়া জানে না। সাক্ষী আরও বলিতেছে যে সে বাদীকে যে আর একটি ছড়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহাও সে জানে। যথা, ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি, ইত্যাদি, কিন্তু সে আর কোনো ছড়া জানে না। এই ছড়াটি আলোচনা করা আমি প্রয়োজন বোধ করিয়া, ইহার সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযুক্ত হইতে পারে এবং আমি লক্ষ্য করিতেছি যে সাক্ষী এই ছড়াটি যে ভাষায় বলিয়াছে উহা পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ভাষা হইতে বিভিন্ন এবং ফণীবাবু যেভাবে বলিয়াছেন তাহা হইতেও বিভিন্ন, সুতরাং এইরূপ বোধ হইতেছে যে প্রতিবাদীগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাকে উহা মুখস্থ করিতে হইয়াছিল এবং তারপর সে উহা ভুল করিয়াছিল। এস্থলে আমি আরও বলিতে পারি যে, একজন কলিকাতার সাক্ষীকে জেরায় জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, ছেলে ঘুমানো ছড়া তাহার স্মরণ আছে কিনা, এবং সে বলিয়াছিল যে উহা তাহার স্মরণ নাই সুতারং ইহা বোধ হইতেছে যে এরূপ জিনিষ সম্ভাবনার অতীত নহে এবং তোমার কিরূপ মাতা বা ধাত্রী ছিল কিংবা তোমার সন্তান-সন্ততির কীরূপ মাতা বা ধাত্রী আছে তাহার ওপর ইহা নির্ভর করে। বাদী যে হিন্দুস্থানী বা অবাঙালী ইহা দেখাইবার জন্য যে জেরা করা হইয়াছিল তাহা আমার বিবেচনায় কেবল এব্যাপারটি লইয়া খেলা করা মাত্র এবং যদি ইহা জানা না থাকিত যে বাদী বাঙালী এবং অন্যান্য ব্যাপার হইতে যেরূপ প্রমাণ হইয়াছে তাহাকে স্বয়ং কুমার তাহা হইলে এরূপ হইতে পারিত না। আমি বিচারে এই সাব্যস্ত করিতেছি যে বাদী একজন বাঙালী।

উপসংহার

আমি এই মোকদ্দমার সমস্ত সাক্ষ্য অত্যধিক যত্নের সহিত বিবেচনা করিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস যে সনাক্তের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সূচিতে কৌশুলীগণের প্রত্যুত্তম সওয়াল

জবাবে পরিব্যক্ত হয় নাই। এই মামলা সম্পর্কীয় সকলেই বিচার্য্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে এবং এই মোকদ্দমায় যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদের দুরূহতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিল। সনাক্ত ব্যাপারে বহু জিনিষেরই শেষ মীমাংসা হয় না কিন্তু একটি মাত্র ঘটনাই সাংঘাতিক হইতে পারে, সুতরাং এই ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হইয়াছিল এবং অনুসন্ধান যতদূর সম্ভব সঠিকভাবে চালাইতে হইয়াছিল।

সনাক্তের পোষকতা-জনক প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আমি বিশ্বাস করি। সমাজের সকল স্তরের ও সর্বাবস্থার নরনারীগণ নিজেদের সুবুদ্ধি অনুসারে এই সাক্ষ্য দিয়াছে। এই সাক্ষীদের মধ্যে ছিলেন কুমারের প্রায় সকল আত্মীয় এবং তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার ভগিনী, বড়োরাণী, মেজরাণীর নিজের মামী এবং তাঁহার নিকট আত্মীয়া ভগিনী। সাক্ষীগণের মধ্যে বহু শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন, বহু সম্ভ্রান্ত প্রকৃতির প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহাদিগকে অদ্ভুত ও বিচিত্র কল্পনা প্রবল বলিয়া জগতের কেহই সন্দেহ করতে পারিবেন না, এবং যাহাদের সাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ হইবার ভয় ছিল; যাঁহাদের ব্যক্তিগত কোন লাভ বা ক্ষতি নাই এবং যাঁহাদের কুমারকে ভুল করিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ইহা কখনও সম্ভব নয় যে এই সকল লোক একজন ভণ্ডের পক্ষ হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু এই সাক্ষ্য সমুদয় ও কেবলমাত্র সাক্ষীগণের বিশ্বস্ততার ওপরে নির্ভর করে না। ইহা সর্বপ্রকার সম্ভবপর পরীক্ষায় সন্তোষজনক রূপে প্রমাণিত করিয়াছে। উহার মধ্যে একটি পরীক্ষা এই যে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মে বাদী যখন নিজেকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন এক অখণ্ডনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। সেদিনের ঘটনার সহিত কেবল ইহাই বেশ সুসঙ্গত হয় যে, যে সকল লোক কুমারকে জানিত তাহারা নিজেদের এবং বিশ্বাস অনুসারেই বাদীকে সনাক্ত করিয়াছিল। বিবাদীপক্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধান তদ্বিরকারক রায় সাহেব (প্রঃ সাঃ ৩১০) মধ্যম কুমারের আকৃতি ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সমুদয়ের মিথ্যা কাহিনী সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, ১৯২১ সালের ৪ঠা মে তারিখে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে কুমারের ভগিনী ও ভাগিনেয়গণ সৎ বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়াই সাধুকে কুমার বলিয়া চিনিয়াছিল। তিনি যদি নিজে উহা বিশ্বাস না করিতেন, তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না, কারণ তিনি নিজে সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন এবং তিনি অপর সকলের ন্যায় কুমারকেও চিনিতেন। মিষ্টার নিডহ্যামের রিপোর্ট বাস্তবিক পক্ষে তদ্বিরকারকের রিপোর্ট। সুতরাং উহাও একজন বিশ্বাসকারীর রিপোর্ট। আমি যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি এবং যে সকল বিচারবিবেচনার উল্লেখ করিয়াছি সেই সকল হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে হঠাৎ কোনো ষড়যন্ত্র করা হয় নাই, এবং হঠাৎ সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন

ভাষাভাষী এক পাঞ্জাবীকে কুমারের ভূমিকায় অভিনয় করিবার জন্য সহজ্যা গ্রহণ করা হয় নাই—সেদিন যে ঘটনার উদয় হইয়াছিল তাহার কারণ দর্শাইবার প্রতিবাদী পক্ষের এই একটিমাত্র মতবাদ রহিয়াছে। যদিও উহা দ্বারা কিছুই পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হয় না, যদি না ধরিয়া লওয়া হয় যে ভগিনীরও তাঁহার সহিত পরগণার বাকী সকলেরই মাথা খারাপ হইয়াছিল।

ভগিনী যদি সৎবুদ্ধি প্রণোদিতা হয় অন্যান্য সাক্ষীগণও সেরূপ সৎবুদ্ধি প্রণোদিত ছিল।

আর একটি পরীক্ষা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তজনক। সেটি হইতেছে দেহের সনাক্ত। শরীরের বিশেষরূপ বৈশিষ্ট্য দ্বারা এবং অন্য সাধারণ শারীরিক চিহ্নদ্বারা এই সনাক্ত সম্পূর্ণরূপে প্রতিবাদিত এবং গণিতের মতো নিশ্চয়তার সহিত প্রমাণিত হইয়াছে এবং উহা কাহারও বিশ্বাস—প্রবণতার ওপর নির্ভর করে না। এই বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নগুলি সমগ্রভাবে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্ট হইতে পারে না এবং এই চিহ্ন সকলের মধ্যে অর্ধেকগুলি না থাকিলেও চাকা চাকা দাগযুক্ত পাদ এবং বাম পায়ের বাহির গোড়ালির উপরিভাগে অসমান পদচিহ্ন এবং তৎসহ শারীরিক বৈশিষ্ট্য সমুদয় অনুরূপ নিশ্চয়তার সহিত সনাক্ত বজায় রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। কোনো ব্যক্তি বিশেষ কতকগুলি অর্জ্জিত বিশেষ গুণের সমবায় এবং এই গুণাবলী—একত্রে আরও কোথা দেখা যায় না এবং এইগুলিই সেই ব্যক্তিবিশেষকে অনন্য-সাধারণ করে।

বাদীর মনেও এমন কিছু নাই যাহা এই সিদ্ধান্ত বিচলিত করিতে পারে প্রতিবাদী পক্ষ উহার যতটা—সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিতে সাহস করিয়াছিল তাহা বরং এই সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করে। তাহার হস্তাক্ষর এই সিদ্ধান্তকে আও দৃঢ় করিতেছে। দার্জ্জিলিঙে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার মধ্যে কোনো কিছুই এই সিদ্ধান্তকে বিচ্যুত করতে পারে না এবং তাঁহার নিরুদ্দেশ সময়ের কোনো ঘটনাই উহা বিচ্যুত করিতে পারে না। সে যদি অন্ধ, খঞ্জ বা বধির হইয়া ফিরিয়া আসিত তাহা হইলেই এই সিদ্ধান্ত অবিচলিত থাকিত। তোতলামি এবং হিন্দীটানও সেইরূপ অকিঞ্চিৎকর।

বাদীর মনের দৃঢ়তা

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মের পূর্ব্বের কোনো ঘটনা বা পরবর্তী আচরণের কোনো কিছু কোনোরূপ ষড়যন্ত্রের সূচনা করে না। সেই তারিখ হইতে মামলা রুজু হইবার সময় পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও বাদী গোপনভাবে অবস্থিতি করে নাই। যে আসিয়াছিল সেই

তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল, বহু লোকই তাহাকে দেখিয়াছিল এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে প্রজাপুঞ্জের বিপুল জনতা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তুমুল আনন্দধ্বনি করিয়াছিল। বাদী তাঁহার স্বরূপতা ঘোষণা করিবার ২১ দিন পরে ২৯ মে তারিখে ঢাকা কালেক্টারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একাকী তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং তদন্তের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের মে মাস হইতে তাঁহার ভগিনীরা— এবং তাহার পিতামহী তদন্তের জন্য কালেক্টারের নিকট আবেদন করিতেছিলেন এবং বাদী মুখোমুখী হইয়া জেরার উত্তরদানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। খাজনা আদায়ের কাজে চাঁদা সংগ্রহে তিনি অশেষ কষ্ট দিতেছিলেন এবং ১৯২৯ ও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জমিদারীর খাজনা আদায় কার্য একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। তথাপি কেহ্ই তাঁহার সম্মুখীন হয় নাই। তাঁহাকে প্রশ্ন করে নাই। কিংবা তাঁহাকে ফৌজদারী সোপার্দ করে নাই। তাঁহার সম্মুখীন না হওয়ায়, তাঁহাকে কোনো প্রশ্ন না করা—কিংবা তাঁহাকে ফৌজদারী সোপার্দ্দ না করা একজনের প্রার্থনীয় হইয়াছিল; এবং সেই ব্যক্তি কে তাহা একজন ব্যক্তিকেও জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। সে ব্যক্তি কে সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। সেই ব্যক্তি রায় সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানাজ্জী বাহাদুর; যিনি কুমারের সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন এবং যাঁহার পক্ষে কুমারের প্রত্যাগমন বাস্তবিকই ভীষণ বিপদ। ৬ মে অর্থাৎ বাদী যেদিন আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার দুদিন পরেই— যখন বাদী কিরূপ সমর্থন লাভ করিবেন তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, সেই সময়েও সত্যেন্দ্রবাবু জানিতেন যে, বাদীর মৃত্যু সম্বন্ধে একাগ্র হওয়ায় এই বিপদে তাঁহার রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মি. লেথব্রিজের নিকট উপস্থিত হন, তাঁহাকে বলেন যে মৃত্যু-প্রমাণ সুরক্ষিত করিতে হইবে। সেই মৃত্যু-সংক্রান্ত যে এফিডেভিটগুলি তিনি স্বয়ং সংরক্ষিত করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। তিনি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মে তারিখের পূর্ব্বে দাৰ্জ্জিলিং যান, এবং যে সকল সাক্ষী দ্বিধাহীন চিত্তে শবদাহে যোগাদান করিয়াছিল সেই সকল সাক্ষীকে একটা চুক্তিতে আটকাইয়া রাখিতে চান। তিনি মি. লিণ্ডসের নিকট মৃত্যুর এফিডেভিট ও শবদাহের প্রমাণ প্রেরণের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং মি. লিণ্ডসে কুমারের মৃত্যু সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া এই ঘোষণা প্রচারিত করিয়াছিলেন যে বাদী একটা ভণ্ড প্রতারক। অতি অল্প সংখ্যক প্রতারকই এই ঘোষণার পর টিকিয়া থাকিতে পারিত। ইহাতে বহু সাক্ষীর মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, এই মামলা ১ম প্রতিবাদিনী ও বাদীর মধ্যে নহে, পরন্তু বাদী ও সরকারের মধ্যে। বাদীর এই ঘোষণা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও টিকিয়া রহিলেন। তিনি এখানে-সেখানে গিয়া লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে ও যাহারা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিত তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে

লাগিলেন, এবং পদস্থ রাজকর্ম্মচারীবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদন্তের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মিথ্যা আশ্বাস প্রদান

তাঁহার এই প্রার্থনায় মি. লিগুসে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন এবং ১৯২৩ অব্দে মি. কে, সি, দে, তাঁহাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়াছিলেন।

মি. চৌধুরী এই সকল ঘটনা উপেক্ষা করিয়াই মামলা রুজু করিবার বিলম্বের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া এই ইঙ্গিত করিতেছিলেন, যে অভিনয়ের প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে বাদীর সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। বাদী তাঁহার স্বরূপতা ঘোষণা করিবার ২৪ দিন পরে মি. লিগুসের নিকট তদন্তের প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভগিনী আরও পূর্ব্বে তদন্তের জন্য আবেদন- পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখনও বাদী সকল সময়ের মতোই মুখোমুখী হইয়া জেরার জবাব দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তদন্ত যে করা হইবে না একথা তাহাকে কোনোদিন বলা হয় নাই, এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহাকে বলা হয় নাই যে আদালত খোলা আছে (অর্থাৎ সে দরকার বোধ করিলে আদালতে মামলা রুজু করিতে পারে)। তারপর মামলা না করিয়া সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা করার পর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এই মামলা রুজু করা হইয়াছিল। এই ষ্টেটের জন্য মামলা করা সোজা কাজ নহে; এবং তাঁহাকে যে কতদূর শিখান পড়ান হইয়াছিল তাহা তাঁহার জেরা হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে অবস্থায় ছিলেন ঠিক সেই অবস্থাতেই রহিয়া গেলেন।

সত্যবাবুর ব্যবহার কীরূপ ছিল

বাদীর কার্য্যাবলী আগাগোড়া খোলাখুলি ছিল, কিন্তু যে সত্যবাবু এই সম্পত্তি ভোগ করিতেছিল তাঁহার ব্যবহার কীরূপ ছিল? বাদীই যে কুমার ইহা সম্পূর্ণরূপে জানিয়াও সে এই হতভাগ্য ব্যক্তিকে বাধা দিয়াছে, তাঁহার নিজের অর্থে বিবাদীরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, ব্যবহারই সব প্রকাশ করে এবং তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। ১৯২: খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে অর্থাৎ বাদী যেদিন নিজেকে কুমার বলিয়া ঘোষণা করিলেন

তাহার দুইদিন পরে সত্যবাবুর আতঙ্ক প্রকাশ পাইয়াছিল, এই আতঙ্কে অভিভূত হইয়া সত্যবাবু মৃত্যুর প্রমাণ সুরক্ষিত করিতে মি. লেথব্রিজের নিকট দৌড়িয়াছিল; সেই আতঙ্কে অভিভূত হইয়া সে মৃতদাহের সাক্ষীদিগকে আটকাইবার জন্য ১৫ মে-র পূর্বে দার্জ্জিলিঙে ছুটিয়াছিল। ইন্‌সিওরেন্স ডাক্তারের যে রিপোর্টে কুমারের দৈহিক-চিহ্নগুলি বিবৃত ছিল সেই রিপোর্টের ভয়েও সে অভিভূত হইয়াছিল। উহা ১৯২১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশ হইয়াছিল। প্রতিবাদীপক্ষ ভণ্ড প্রতারককে জাহান্নমে পাঠাইবার জন্য এই রিপোর্ট হস্তগত করে নাই। যাহারা উহা তলপ করে নাই, তাহারা আশা করিয়াছিল উহা স্কটল্যাণ্ডে কোম্পানীর অফিসে নিরাপদে সুরক্ষিত থাকিবে। কিন্তু সেই তথাকথিত ভণ্ড প্রতারকই তাহা তলপ দিয়া আনাইয়া সেইরূপ তৎপরতা সহকারে উহা দাখিল করিয়া বলিলেন, যেরূপ তৎপরতার সহিত তিনি ব্যক্তিগত দলিলগুলি হস্তগত করিয়াছিলেন। হস্তাক্ষর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতের জন্য যখন আদালত হইতে দাবী করা হইয়াছিল, তখনও আমি এই আতঙ্ক প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কোর্ট অব ওয়ার্ডস তদন্ত আরম্ভ করিয়া বাদী ও চর্ম্মকারগণের নিকট হইতে সাক্ষীসাবুদ সংগ্রহ করিলেন এবং উহা বিজ্ঞ কৌশুলীকে প্রদান করিলেন। এই সকল উপাদান হইতে একটি জিনিসও উপস্থাপিত বা প্রমাণিত হইল না, কেবল ৬ নং জুতা উপস্থাপিত হইয়াছিল, এবং উহাও কৌশুলীর পরামর্শ মত করেন নাই। ভুলক্রমে করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বাদীর জুতা বড় বলিয়া বোধ হইতেছে। বাদীর এজাহার শেষ হইলে এই অদ্ভুত অনুযোগ করা হইয়াছিল যে তিনি ইহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন যে বাদী লেখাপড়া জানেন কিন্তু এই লোকটার যে অক্ষর পরিচয় আছে এই কঠিন ব্যাপার এক্ষণে প্রমাণ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে কুমার যতটা লেখাপড়া জানিতেন, তাহা অপেক্ষা খুব বেশি করিয়া ধরা হইয়াছিল, অথচ এতদিনের অনভ্যাসে—তিনি যে অনেক ভুলিয়া যাইবেন তাহা ধরাই হয় নাই। সর্বশেষে জেরার সময় স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে বাদীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, বলা হইয়াছিল যে এ বিষয়ে বাদীকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আমি পূর্বেই ইহার আলোচনা করিয়াছি এবং এখন ইহা বলিবার প্রয়োজন হইবে না যে তাহাকে কোনরূপ প্রশ্ন না করার প্রাচীন পদ্ধতি আদালতে পর্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল। এই অজুহাত ১৯২১ সালে বলা চলিত না, এবং একথা কেহ কখনও শোনে নাই যে, শেখানপড়ান হইয়াছে বলিয়া সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই। ফাঁদকে ভয় করিবার কিছুই ছিল না, ভয় করিবার ছিল সত্য ঘটনাকে। জটিল মামলার ঘটনাবলী আপনাআপনি বাহির হইয়া পড়িয়া কল্পনাকে ধ্বংস করে, এরূপ ক্ষেত্রে কাহারও মাথা খারাপ না হইলে সে কখনও সত্যকে অধিক দিন বাধা দিতে পারে না এবং প্রতিবাদী পক্ষের কোন এক ব্যক্তির মাথা খারাপ

হইয়াছিল এবং সম্ভাব্য বিষয়ের সমস্ত জ্ঞান নষ্ট হইয়াছিল। বাদীর চেহারা সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ ছিল বিদেশী ভাষায় কথা বলিত। ভগ্নিগণ তাহাকে যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন, এক ভগ্নী তাহার দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। কেহই তাহাকে যোগাড় করিয়া আনে নাই, কিন্তু সে দৈবক্রমে ঔষধ দিতে আসিয়াছিল এবং নিজেকে কুমার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল; এবং পরিবারবর্গ অবাক হইযা তাহাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে কোনরূপে প্রস্তুত না হইয়া ভগিনী হঠাৎ প্রকাশ্যে তাহাকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কালেক্টারের নিকট তাহাকে সম্পত্তি দাবী করিতে পাঠালেন। এই ধরনের একটির পর একটি ঘটনা খাড়া করা হইল, যাহা কিছুদিন টিকিল এবং সত্য ঘটনার চাপে পড়িয়া নষ্ট হইল। সুবিস্তৃত এবং সযত্নে গঠিত ঘটনাগুলি—যাহা দার্জিলিংয়ে অসুখ ও মৃত্যুসংক্রান্ত ঘটনা কেবল যে অন্তর্নিহিত মিথ্যার লক্ষণ দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে পরন্তু পর্বতের ন্যায় অচল একটিমাত্র ঘটনার দ্বারা নষ্ট হইয়াছিল—তাহা মৃত্যুর সময় বা রক্তবাহ্যে। প্রাতঃকালের শবদাহ এবং উহার প্রকৃতি ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের আগমন দ্বারা এবং এই কাহিনী সংশ্লিষ্ট কাশীশ্বরী দেবীর অনুপস্থিত দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। টি-পার্টির স্বীকারোক্তি বাদীকে প্রশ্ন করা হয় নাই। কিন্তু উহা তারিখের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত শিক্ষা, সাহেবী ধরন, ইংরাজী ভাষা ইত্যাদি মিথ্যা গুণাবলী কুমারের প্রতি আরোপ করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মিথ্যা ঘটনা সৃষ্টি করা হইয়াছে। কারণ সত্য বলিলে তাঁহার কোনরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইত না। লেখাপড়া জানা প্রমাণ করিবার জন্য চিঠিপত্র এরূপভাবে জাল করা হইয়াছিল যে, উহা প্রমাণ হইলে মৃত্যুর মতই কার্য্যকরী হইত। ইহার এই ফল হইয়াছিল যে যদিও প্রতিবাদী মধ্যে এরূপ একদল নিজেদের লোকও কর্ম্মচারী সংগ্রহ করিয়াছিল যাহারা যাহা কিছু বলার দরকার তাহাই বলিতে প্রস্তুত ছিল, এবং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছিল যে, সাক্ষ্য হইতে মামলা গড়িয়া উঠিতেছে না, পরন্তু মামলায় অনুরূপ সাক্ষ্য গঠন করিতেছে, তথাপি তাহাদের পক্ষে বাস্তব হইতে এতদূর বিভিন্ন কুমারকে বজায় রাখা অসম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং সাক্ষীদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন তাহারা নিজেদের ভূমিকা অভিনয় করিয়া যাইতেছে; এবং কি ঘটিতেছিল তাহার উদাহরণস্বরূপ দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—ফণীভূষণ ব্যানাৰ্জ্জীর জন্য একখানি বই তৈয়ারী করা হইয়াছিল যাহাতে তিনি মুখস্থ করিতে পারেন এবং বাদী যে সব কথা জানিত না তাহা গর গর করিয়া বলিয়া যাইতে পারেন। আর ডাক্তার আশুতোষ দাসগুপ্তের পূর্ব্বপ্রদত্ত সাক্ষ্য বিবেচনা না করিয়াই তাহার মুখ হইতে অন্যরূপ বক্তব্য বলানো হইয়াছিল। প্রতিবাদী পক্ষে যে কিরূপ বিপদ হইতেছিল ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। এইরূপ চেষ্টার চূড়ান্ত দেখা গিয়াছিল

যখন রঘুবর সিংহের সমক্ষে প্রদর্শিত ফটোর পরিবর্তে মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা ও জাল লোকের দ্বারা বাদীর সাক্ষ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল।

কিন্তু ইহা কোনই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে যদিও বাদী ঢাকা ও কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন এবং অধিকাংশ সময়ই তিনি ঢাকায় বাস করিতেছিলেন, তথাপি এষ্টেট, উহার সমস্ত ক্ষমতা সত্ত্বেও ১২ বৎসরের মধ্যে বাদী যে কে তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

মিষ্টার লিন্ডসে পাঞ্জাবে একটা তদন্তের জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি জানিতেন না যে পাঞ্জাবে এজেন্টরা কাজ করিতেছে এবং তাহাদের চেষ্টায় প্রত্যেক তদন্তেরই ফল হইতেছে কিংবা জানিতেন না যে—পাঞ্জাবের রিপোর্টের ভিত্তি স্বরূপ বর্ণনাটি একটি ফটোর ওপর নির্ভর করিতেছে না, যে ফটোতে ম্যাজিষ্ট্রেট রঘুবীর সিংহের সাক্ষ্য ছিল এবং যাহা এখনও প্রকাশ্য দিবালোকে বাহির হইতে পারে নাই।

ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই যে উত্তর পাড়ায় মেজরাণীর যে সকল ধনাঢ্য ও পদস্থ আত্মীয় ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন নাই। কেবল অসাধুতার জন্য পদচ্যুত এক কেরাণী আর একটি আত্মীয় ভাই বাদীকে অস্বীকার করিতে আসিয়াছিল এবং কি ভাবে তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহা আমি পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি। যে সকল ভদ্রলোক কুমারকে জানিতেন, কিন্তু তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহাদিগকে বাদ দিয়া স্বাধীন মতাবলম্বী এবং পক্ষপাত শূন্য এমন একটা লোকও নাই যিনি হলপ করিয়া বলিতে পারিতেন যে বাদী কুমার নহেন।

আমি মেজরাণীর অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ আলোচনা করিয়াছি। তাহার ভ্রাতার সম্বন্ধে তাহার নিজের কোন সত্তা নাই। জমিদারীর আয়, আয়ের সমগ্র অংশ, তাঁহার ভ্রাতার হাতে যাইতেছে—এমনকি সেই আয়ের পরিমাণ প্রায় লক্ষ টাকা হইলেও তাহার নিজের নামে ব্যাঙ্কের কোন হিসাব নাই। এমন একখানিও কাগজ নাই যাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি হাতে টাকা রাখেন বা টাকা রাখিতে চান। জয়দেবপুরে এই নিঃসন্তানী রমণীর জীবনের সম্বন্ধ কিছুই নাই, তাঁহার অতীত জীবনের স্মৃতিতে কিছুই নাই যেদিকে ফিরিয়া চাহিয়া তিনি আনন্দ লাভ করিবেন। যে জীবনযাপনে তিনি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন সম্পত্তি মালিয়া বলিয়া যে ভান ও গর্ব্ব তিনি এতকাল অনুভব করিয়া আসিতেছেন তাহার এরূপ একটি স্বামীকে তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে যে স্বামী একটা কুচরিত্র লম্পট এবং যাহার দেহ কুৎসিত ক্ষত দ্বারা পূর্ণ এবং যখন এই সকলের উপর আবার বিষ প্রদানের অভিযোগ আসিল; ১৯২১ সালের যে মাসে

তাঁহার ভ্রাতার নিকট, টেলিগ্রাম যোগে এই অভিযোগ আসিল তখন তিনি জানিলেন যে তিনি ভ্রাতার ভগিনীরূপে বিবেচিত হইবেন কুমারের পত্নীরূপে হইবেন না। ভ্রাতার পক্ষে কুমারের এই আবির্ভাবের অর্থ এই যে তিনি একটি সুন্দর সম্পত্তি হারাইবেন এবং এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করিবেন, এবং আমি আশা করি না যে ভগিনী তাহার পথে অন্তরায় হইবেন।

আমি বিচারে এই সাব্যস্ত করিতেছি যে বাদীই ভাওয়ালের মৃত রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের ২য় পুত্র রমেন্দ্র নারায়ণ রায়।

ইসু নং ৬

এই মোকর্দ্দমায় উপযুক্তরূপে মূল্য নির্ধারণ ও স্ট্যাম্প প্রদান করা হইয়াছে।

ইসু নং ৭

এই ইসু উঠিতেই পারে না, কারণ আর্জ্জি সংশোধন দ্বারা উহা ডিক্লেরেটরি মামলা নহে উহা অধিকার সাব্যস্তের জন্য মামলা।

ইসু নং ৮

এই ইসু এইরূপে ধার্য্য হইয়াছিল আর্জ্জির ২য় দফায় শেষ অংশের যেরূপ বলা হইয়াছে, তদনুসারে বাদী আর্জ্জিতে লিখিত প্রতিবিধান পাইবার হকদার কিনা।

যেখানে এই উক্তি করা হইয়াছে যে, "বাদী তাঁহার অতীতের স্মৃতিশক্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছিল এবং সন্ন্যাসীদের দলভুক্ত হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করিত। সন্ন্যাসী জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হইয়াছিল।"

এইরূপে উল্লিখিত ঘটনার আইনের কোন মূল্য নাই। হিন্দু আইন অনুসারে সংসার ত্যাগ সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইলে আইনতঃ মৃত্যুর সমান হয়। এই পরিচ্ছেদ এইরূপ বলিতেছে না যে বাদী সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন কিংবা তিনি সমস্ত পার্থিব ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং উহা আরও বলিতেছে যে তিনি যে জীবনযাপন করিতেন, উহাই স্মৃতিশক্তি ধ্বংসের ফল। মৃত্যুর সমান ফলোপদায়ক হইতে হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ ইচ্ছাকৃত হওয়া চাই (Maynes Hindu Law 7 Edition page 801) এই ইসু কেবল মাত্র এই পরিচ্ছেদের উপর উপস্থিত করা হইয়াছে।

আমি আরও বলিতেছি যে বাদী যে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই, এবং ইহারও কোন প্রমাণ নাই যে তাহাকে সংসারের মধ্যে মৃত সাব্যস্ত করিতে যে সকল অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তাহা তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। এবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করার কোন প্রয়োজনও নাই কারণ ইসু কেবলমাত্র এই পরিচ্ছেদের উপর ধার্য্য হইয়াছে।

আমি এই রায় দিতেছি যে এই পবিচ্ছেদে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে তিনি যে প্রতিবিধান দাবী করিয়াছেন তাহার স্বত্ব ব্যাহত হয় না।

৯নং ইসু

আর্জ্জি যে ভাবে গঠিত হইয়াছে তাহাতে এই ইসু আদৌ উঠে না।

ইসু নং ২

তামাদি সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে বাদী যে সম্পত্তির দাবী করিতেছেন তাহাতে—১৯০৯ সালের ৮ই মে পর্যন্ত তাঁহার দখল ছিল, এবং সেই সময়ে তিনি অন্তর্হিত হন এবং মৃত বলিয়া অনুমিত হন। তাঁহার পত্নী তাঁহার বিধবারূপে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন এবং হিন্দু আইন মতে বিধবার সম্পত্তি রূপে উহার অধিকারিণী হন। প্রতিবাদী পক্ষে এই তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছেন ১৯০৯ সালের মে মাস হইতে উহা তাহার দখলে আছে, এবং—মামলা দায়েরের পূর্বে ১২ বৎসরের উর্ধ্বকাল উহা তাহার দখলে আছে সুতরাং এই মামলা তামাদি দোষে বাধিত। বাদীর আগমনের পূর্ব্ব পর্যন্ত তিনি হিন্দু বিধবারূপে সম্পত্তি দখল করিতেছিলেন এবং ১৯২১ অব্দের ৪ মে তারিখে অর্থাৎ যেদিন বাদী নিজেকে কুমার বলিয়া ঘোষণা করিলেন কিন্তু সম্পত্তি হইতে বেদখল ছিলেন সেই দিন তাঁহার অধিকারে বাধা উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে মামলা রুজু হইয়াছিল। এইরূপ ধারণা করা অসম্ভব হইবে যে বাদীর নিরুদ্দেশ অবস্থায় মেজরাণী এই সমস্ত কাল ধরিয়া বাদীকে মৃত জানিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ স্বত্বে বিধবার সম্পত্তি, দখল করিয়া আসিতেছিলেন। বিধবার সম্পত্তি বলিয়া উহাতে তাঁহার যে দাবী ছিল তাহার অধিক কোন কথা তিনি বলেন নাই—এবং যখনই তিনি উহা স্বীকার করিতেছেন যখন তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে তিনি স্বামীর হইয়া উহা দখল করিতেছেন—ইহাই হিন্দু আইনের সিদ্ধান্ত,

এবং এই সিদ্ধান্তে আরও বলিতেছে যে তাঁহার মৃত্যুর পর, স্বামী যদি তৎপূর্বেই মরিয়া থাকেন তাহা হইলে স্বামীর উত্তরাধিকারিরা উত্তরাধিকারী হইবে (শরৎচন্দ্র বনাম চারুশীলা দাসী ৫৫ থানি:—৯১৮) স্বামীর হইয়াই তিনি দখল করিতেছেন সুতরাং—সম্পত্তির প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁহার বিরুদ্ধ স্বত্ব একটা অসম্ভব ধারণা। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে—তাঁহার মৃত্যুর পর—স্বামীর উত্তরাধিকারিগণ সম্পত্তির অধিকারী হইবে অথচ স্বামী তামাদি দ্বারা বারিত হইবে।

১৯২১ সালে ৪ বা ৬ তারিখে বাদী—বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ তারিখের—পরেও তাঁহার দখল বিরুদ্ধ স্বত্ব হইবে কিনা তাহার বিচার করা আমার আবশ্যক হইবে না যেহেতু তিনি তখনও এই বলিতে ছিলেন যে তিনি ঐ সম্পত্তিই দখল করিতেছেন তাহার অধিক নহে। মামলা তামাদি দ্বারায়, বারিত নহে।

উভয় পক্ষের কৌঁশুলীগণের নিকট হইতে আমি যে সাহায্য লাভ করিয়াছি ইহা আমি এস্থলে স্বীকার করিতেছি। তাঁহাদের অভিজ্ঞতার এবং সাক্ষ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনার সম্পূর্ণ সুবিধা আমি লাভ করিয়াছি এবং এই মামলায় তাহাদিগকে যে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও তাহারা কোনও রূপ অনুযোগ না করিয়া আমাকে যে সাহায্য দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি।

এই মামলার দখল বহাল রাখিবার জন্য বা বে-দখল হইলে দখল পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যদিও আমি দেখিতেছি যে বাদী ১৯৩০ অব্দে খাজনা আদায় করিয়াছিলেন এবং মামলা দায়েরের পর পুণ্যাহের সময় খাজনা আদায় করিয়াছিলেন তাহা হইলেও ইহা সত্য ঘটনা যে তিনি বে-দখল হইয়াছেন এবং এই বে-দখল এখনও রহিয়াছে।

এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে বাদী যদি ভাওয়ালের দ্বিতীয় কুমার হন এবং মামলাটি যদি তামাদি দোষে বারিত না হয়, তাহা হইলে তিনি এই নালিসী সম্পত্তিতে এক অবিভক্ত অংশের অংশীদার। আমার বিচারে এই রায় যে তিনি এই নালিসী সম্পত্তির এই কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং তিনি এই অংশের মালিক।

এইরূপ ডিক্রীর আদেশ হইল, বাদী ভাওয়ালের স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ২য় পুত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইল এই নির্দ্দেশ করা হইল যে তাহাকে নালিসী সম্পত্তির অবিভক্ত এক তৃতীয়াংশের দখল দেওয়া হউক—যে অংশ এক্ষণে ১নং প্রতিবাদিনী ভোগ করিতেছেন—এবং বাকী সম্পত্তির অন্যান্য প্রতিবাদীগণের সহিত সমান দখল থাকিবে।

এই ডিক্রী ২নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে একরফা করা হইল এবং অবশিষ্ট প্রতিবাদীগণের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দেওয়া হইল।

বাদী প্রতিযোগী প্রতিবাদীগণের নিকট হইতে—বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা সুদ সহ তাঁহার খরচা পাইবেন।

(স্বাক্ষর) পান্নালাল বসু
এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ
ঢাকা
২৪শে আগস্ট ১৯৩৬।

* মূল রায়েব অংশবিশেষের শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গ্রন্থে সংযুক্ত মূল বঙ্গানুবাদ। গ্রন্থকার।

পরিশিষ্ট ২

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর আত্মকথা

আমার নাম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়, পিতার নাম রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়। আমার বয়স ৫০ বৎসর, ব্যবসা জমিদারী।

আমরা ঠাকুরদাদার নাম রাজা কালীনারায়ণ রায়। আমার ঠাকুরমার নাম সত্যভামা দেবী। মার নাম রানী বিলাসমণি। আমি বাদী। আমরা তিন ভাই, তিন বোন। আমি মধ্যম ভাই, আমার বড়ো ভাইয়ের নাম রণেন্দ্র, ছোটো ভাইয়ের নাম রবীন্দ্র, তাঁহারা মারা গেছেন। আমার বড়ো বোনের নাম ইন্দুময়ী দেবী, তিনি সকলের চেয়ে বড়ো। মধ্যম বোনের নাম জ্যোতির্ময়ী দেবী। ইন্দুময়ী দেবী মারা গেছেন। জ্যোতির্ময়ী বেঁচে আছেন। জ্যোতির্ময়ী আমার বড়ো ভাইয়ের বড়ো। আমার তৃতীয় বোনের নাম তড়িন্ময়ী দেবী। তিনি বেঁচে আছেন, তিনি ছোটো কুমারের ছোটো। আমিও ছোটো বলিয়া ডাকিতাম। ছোটো কুমার বড়ো কুমারকে বড়দা বলিয়া ডাকিত। আমার জিহ্বা মোটা হইয়া গেছে, তাই অস্পষ্ট। আমার জিহ্বার নীচে একটা মাংসপিণ্ড আছে। দার্জিলিং যাইয়া অসুখের কথা মনে আছে, জিহ্বার ওই দোষ দার্জিলিং যাইয়া অসুখের পর হইয়াছে। আমার মাতৃভাষা বাংলা।

আমি বাংলা ভাষায় কথা কহিতেছি। আমার ভাষার টান আছে কি না বুঝি না, বাহিরের লোক বুঝিতে পারেন। আমার ভাষার টানের কারণ আমি ১২বছর সন্ন্যাসীর কাছে ছিলাম ও এই ১২ বছর হিন্দুস্থানীতে কথা বলিয়াছি। তাহারাও আমার সাথে হিন্দিতে কথা বলিত। এই জন্য হিন্দির একটু টান থাকিতে পারে। বিবাহ হইয়াছিল ১৩০৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে, আমার স্ত্রীর নাম বিভাবতী। আমার বিবাহ জয়দেবপুরে হইয়াছিল। আমার বিবাহের সময় আমার বয়স ১৮/১৯ বছর হইয়াছিল, আমার স্ত্রীর তখন ১৩ বছর ছিল। আমি সত্য ব্যানার্জিকে চিনি। তিনি আমার স্ত্রীর ভাই। যখন আমার বিবাহ সময় তখন সত্যেন আমার সমবয়সী ছিল, সে তখন পড়তো। আমার বিবাহের সময় আমার শাশুড়ী, দুইটি শালী, বেঁচে ছিল, তাহারা থাকিত উত্তরপাড়া।

উত্তরপাড়া রামনারায়ণ মুখার্জির বাড়ি, রামনারায়ণ মুখার্জি আমার মামাশ্বশুর। আমার পিতা ১৩০৮ সনে মারা যান ১৩ই বৈশাখ। আমার মা ১৩১৩ সনের ৭ই মাঘ মারা যান, আমার ছেলেবেলার কথা মনে আছে। ছেলেবেলা পশুপক্ষী নিয়া জীবন কাটাইয়াছি। কবুতর, হাঁস, পাঁঠা, খাসীর গাড়ি, গাড়িতে খাসী জুড়িয়া চালাইতাম। খাসীর গাড়ি আমি নিজে চালাইতাম। লেখা-পড়ায় আমার মন যাইত না। আমার মাস্টার ছিল। আমার দ্বারিকবাবু মাস্টার ছিল। দ্বারিক মাস্টার ৭।৮ বৎসরের সময়ে আসেন। দ্বারিক মাস্টারের কাছে ক, খ, গ, ঘ লিখিয়াছি A, B, C শিখিয়াছি। লেখাপড়ার দিকে মন দেই নাই।

দ্বারিক মাস্টার বলিত, 'তুমি রাজার ছেলে, নাম দস্তখত করিতে শেখ'। দ্বারিক মাস্টারের কাছে নাম দস্তখত করিতে শিখিয়াছি। ইংরাজি ও বাংলা দস্তখত ছাড়া আর কিছু...। (The witness is asked to write and the written paper as tendered and marked).

A document is filed in court on hehalf of the plaintiff and marked Ext. 3 series the signatures of the plff. tendered and marked Ext. 3 (5-6)

জয়দেবপুরে চিড়িয়াখানা ছিল, তাহা আমার পিতার মৃত্যুর পরে হয়। চিড়িয়াখানা হওয়ার পূর্বে পশু, পাখী আমার বৈঠকখানার বারান্দায় থাকিত। চিড়িয়াখানা আমি করি; সমস্ত পশু, পাখী চিড়িয়াখানায় নেওয়া হয়। চারিটি বাঘ, দুইটি বড়ো ও ছোটো বাঘ। বারান্দার পশুপাখী আনা হয়। চারিটি বাঘ একটা শিয়াল আমাকে কৈলাশ চক্রবর্তী দেন। কৈলাশ চক্রবর্তী বলধার কর্মচারী ছিল। ২টা বনমানুষ, একজোড়া শম্বর, একজোড়া ছোটো হরিণ, একজোড়া কৃষ্ণসার, একটা উট ছিল, একটা কুমীর ছিল, একটা গাধা ছিল, কুমীরটা পুষ্করিণীর মধ্যে ছিল, একজোড়া শালিক, ১৫/১৬ টা ময়ূর ছিল, রাজহাঁস ছিল, উটপাখী একজোড়া, ধনেশ পাখী ছিল, একজোড়া তিতির পাখী ছিল, কেনারী পাখী ছিল।

আমাদের Estate-এর ও আমার নিজের হাতী ছিল। আমার নিজের চারিটা হাতী ছিল। আমার প্রধান মাহুত দিলবর ছিল। Estate-এর ১৪/১৫টা হাতী ছিল, ৪০/৫০টা ঘোড়া ছিল। অনেক গাড়ি ছিল। একটা রূপার গাড়ি ছিল। ব্রুহাম, টম্‌টম্ ছিল। আমি হাতী চড়িতে পারিতাম। কানে ধরিয়া শুঁড় দিয়া উঠিতাম, আমি ঘোড়া চড়িতে পারিতাম। আমি গাড়ি চালাইতে পারিতাম, আমি সর্বদা নীচ লোকের সাথে—যথা সহিস, কোচয়ান ইত্যাদির সাথে শিকার করিতে যাইতাম। বাঘ, ভল্লুক, হরিণ শিকার করিয়াছি। অনুকূল ঘোষ মাস্টার ছিল আর একজন ছিল নাম মনে নাই। তার বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। Westen সাহেব মাস্টার ছিল। তাহার কাছে কিছু শিখি নাই। তারপরে

সে ঘোড়া হাতীর ম্যানেজার ছিল। সে আমাদের চেয়ে ঘোড়া হাতী ভালো manage করিতে পারিত। আমি Collegiate School-এ ১০/১৫ দিন পড়িয়াছিলাম। নিজেদের Camp ছিল। সেখানে চা-বিস্কুট খাইতাম। জয়দেবপুরে Polo ground ছিল। সেই জায়গা পরিষ্কার করার সময় সেখানে বড়ো বড়ো গাছ ছিল, তালগাছ প্রভৃতি ছিল, আমি ও ছোটো ভাই Polo খেলিতাম। বড়ো ভাই খেলে নাই। আমি ভোরে চা খাইয়া হাতী, ঘোড়া দেখিতাম। ঘোড়ার দানাটানা দলামলা ইত্যাদি দেখিতাম। হাতীকে স্নান করাইতাম ও খাওয়াইতাম। তারপর চিড়িয়াখানায় বাঘ, ভল্লুক, হরিণ ইত্যাদিকে খাওয়া দিতাম। এই সমস্ত ব্যাপারে ২/৩টা বাজিত, তারপর স্নান করিয়া খাইতাম। তারপর কখনও শিকারে যাইতাম, কখনও হাতীতে ঘুরে বেড়াইতাম। এই রকম করিয়া সন্ধ্যা ৬টায় বাড়ি ফিরিতাম। বাড়ি ফিরিয়া তাস, পাশা খেলিতাম, তারপর খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। আমি একবার লর্ড কিচেনার সাহেবের সাথে শিকারে গিয়েছিলাম, দার্জিলিং যাওয়ার দেড়মাস আগে। Lord Kitchener এক হাতীতে যান, আমি ভিন্ন হাতীতে গিয়েছিলাম। দার্জিলিং যাওয়ার আগে তিন ভাই কলিকাতায় গিয়াছি। বাবার মৃত্যুর পর আমরা কলিকাতায় বড়ো দিনের সময় যাইতাম। আমার শরীর অনুযায়ী আমার পা ছোটো, আমার পা চিরকালই ছোটো আছে।

আমার মার হাত পা ছোটো ছিল। আমাদের রাজপরিবারের মধ্যে মেজবোনের, ছোটো ভাইর, বুদ্ধুর হাত-পা ছোটো ছিল। বুদ্ধু জ্যোতির্ময়ীর ছেলে। বুদ্ধু মারা গিয়াছে। তিনি ভাদ্র মাসে মারা যান। আমার হাতের কব্জায় "রেখা" আছে।

আমি ১৪৪ ধারায় মোকদ্দমায় Mr. Martin সাহেবের কাছে জবানবন্দী দিয়াছি। তখন হইতে এখন আমি মোটা হইয়াছি। তখন আমার হাতের ওই রেখা আরও ভালো দেখা যাইত। আমাদের পরিবারে আমার, বাবার, আমার ছোটো ভাইর, মেজ বোনের, বুদ্ধুর হাতে এইরকম রেখা ছিল, আমার ঠাইন পিসিরও ছিল। ঠাইন পিসির নাম কৃপাময়ী দেবী। আমার পায়ের পাতার চামড়া পুরু ও খসখসে। আমার পিতার, ছোটো কুমারের, ঠাইন পিসির, মেজবোনের, বুদ্ধু ও মণির পায়ের চামড়া এইরকম ভারী ও খসখসে ছিল। জ্যোতির্ময়ীর এক ছেলেই ছিল, নাম বুদ্ধু। আমার গায়ের রং-এর মতো জ্যোতির্ময়ীর, আমার ছোটো ভাইরও ছিল। আমার চক্ষুর মতো জ্যোতির্ময়ী, বুদ্ধু ও ছোটো কুমারের চক্ষু কটা ছিল। তাহাদের চুলও কটা ছিল। আমার গায়ে, হাতে ও পায়ে দাগ আছে। আমার ডান হাতে বাঘের থাবার দাগ আছে। বাঘ চিড়িয়াখানায় ছিল। ছোটো বাঘের বয়স ৫/৬মাস হইতে পারে। এই ঘটনা দার্জিলিং যাওয়ার ২/৪ বছর আগে হয়। সেই খাবলার দাগ আছে। আমার একটা দাঁত ভাঙা। (Broken tooth shown to the Court) দুই আনী আছে, চৌদ্দ আনী গেছে। রাজবাড়ির পশ্চিম দিক দিয়া Railway station-এর দিকে একটা রাস্তা, আমার ছোটো

ভাই হাতীতে আসিতেছিল, আমি টমটমে পশ্চিম হইতে পূর্বে আসিতেছিলাম। ঘোড়া হাতী দেখিয়া ভয় পায়, তাহাতে পড়িয়া দাঁত ভাঙে। আমাকে অশ্বিনী ডাক্তার দেখে। পড়িয়া যাইয়া যে দাঁত ভাঙে সেই ভাঙা দাঁত পাওয়া যায় নাই। আমার ছোটো ভাই ও বোনের কথা মনে আছে। তাহাদের বিয়ের সময় আমি কাঁকের নীচে (বগল দাবায়) লাঠি দিয়া হাঁটিতাম। আমার বাঁ-পায়ের উপর দিয়া গাড়ির চাকা চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া ওই রকম ভাবে হাঁটিতাম। ছোটো ভাইয়ের বিয়েব ৬/৭ দিন আগে ওই ঘটনা আস্তাবলে ঘটে। ফিটন গাড়ির চাকা চলিয়া গিয়াছিল। তাহাতে পা কাটিয়া গিয়াছিল (Shown to the Court)। পা কাটিয়া যাওয়ায় আমি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। তারপরে কাপড় ছিঁড়িয়া তেনা (নেকড়া) জলে ভিজাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার ৭/৮ বছরের সময় মাথায় একটা ফোট হইয়াছিল। দাগ আছে (Shown to the Court) আমার আরও একটা ফোট হইয়াছিল। তখন আমার ৮/৯ বছর বয়স। এই ফোটের দাগ আছে। (Shown to the Court) আমার সিফিলিস্ হইয়াছিল, দার্জিলিং যাওয়ার ৪/৫ বছর আগে হয়। মেয়ে মানুষ হইতে এই রোগ হয়। এই অসুখ আমার লিঙ্গে হয়। ত্রৈলক্য ডাক্তার এই অসুখ চিকিৎসা করে। বাড়ির লোকেরা এই অসুখ জানিত, ওই স্থানে ঔষধ লাগাইত দুইজন, বোচা ও নৈসা চাকর। আমার লিঙ্গে একটা তিল আছে। লিঙ্গের চামড়ায় তিল আছে, লিঙ্গের অসুখ সারিতে ২/১ মাস লাগে। তারপর আমার বাগী হয়, বাম দিকে। লিঙ্গের অসুখের ১ মাস পরে বাগী হয়। ডাক্তার দেখে, তাহা কাটান হয়। এলাহী ডাক্তার বাগিটা অস্ত্র করে। বাগীর অস্ত্রের চিহ্ন আছে। ঘা শুকাইয়া ছিল, তারপর পা ও হাতে সিফিলিসের ঘা হইয়াছিল। সিফিলিসের দাগ হাতে পায়ে আছে (Shown to the Court).

আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার মা Estate-এর charge নিয়াছিলেন, আমার বাবা মাকে trustee করিয়া গিয়াছে, তখন আমাদের Estate-এ রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ ম্যানেজার ছিল। মায়ের আমলে তিনি dismissed হন। মা তাঁহাকে ডিসমিস্ করিয়াছিলেন। অনেক টাকা ভাঙিয়াছিল। এই জন্য dismissed (ডিসমিস্) হন।

তিনি কাগজপত্র পুষ্করিণীর মধ্যে ও কিছুটা কূয়া-পায়খানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যান। পুষ্করিণী ও কূয়া-পায়খানার কাগজপত্র সম্বন্ধে আমি জানি। আমার হুকুমে উঠান হয়। জালওয়ালা আনিয়া জাল খেও দিয়া ৭/৮ বস্তা কাগজ পুকুর হইতে উঠান হয়। যখন কূয়া-পায়খানা হইতে কাগজ উঠান হইয়াছিল তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কূয়া-পায়খানার উপরে খের ছিল। খের তোলা হইলে দেখা যায় খাতাপত্র। তারপরে টেঁটা মারিয়া কাগজের বস্তা তোলা হয়। পায়খানায় ময়লা ছিল বলিয়া টেঁটা দিয়া তোলা হয়। আমরা টাকা ভাঙতির জন্য কালীপ্রসন্নের নামে ১০/১১ লক্ষ টাকার নালিশ করি। এই মোকদ্দমা ডিক্রি হইয়াছিল। ডিক্রি হওয়ার আগে কালীপ্রসন্ন ঘোষের

সঙ্গে ঢাকা নলগোলা আমার বাসায় দেখা হয়। তখন সেখানে আমার বড়ো ভাই ও ছোটো উপস্থিত ছিল। কালীপ্রসন্ন ঘোষ আমাদের বলিল, 'আমি পুরাণ কর্মচারী, মাকে বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও।" আমাদের কাছ থেকে কালীপ্রসন্ন ঘোষ একটা চিঠি নিয়া আসে। তাহাতে আমরা দস্তখত করিয়া সেই চিঠি জয়দেবপুর মার নিকট পাঠাইয়া দিই। ৫০০০০ টাকায় আপোষ ডিক্রি হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষের পরে আমার বড়ো ভাইয়ের শ্বশুর সুরেন্দ্র মতিলাল ম্যানেজার হন। তিনি এক বছর ম্যানেজার থাকেন। তারপর Mayer সাহেবের manager হয়।

(Ext. B is shown and he identified his signature.
The sigature is marked Ext. 2.)

Mr. Mayer দুই বছর Manager ছিল। আমার মা তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। আমার ভাইকে দিয়া সে Estate Court Wards দেওয়াইয়া ছিল। যখন court of wards-এ দেয় তখন আমার বড়ো ভাই কলিকাতায় ছিল। Mayer সাহেবের চাকুরী যাওয়ার পরে সে জয়দেবপুর ছাড়িয়া যায়। তাহার পর আমি সংবাদ পাই যে আমার বড়ো ভাই দার্জিলিং গিয়াছেন। আমার দাদার সঙ্গে দার্জিলিং-এ Mayer সাহেব ছিল। এই সংবাদ শুনিয়া আমি কলিকাতা যাই। আমার মা ছোটো ও ভাই জয়দেবপুরে থাকে। যাহাতে Estate court of ward-এ যাইতে না পারে এইজন্য আমি কলিকাতা যাই। Court of wards Estate দখল লইতে পারিয়াছে কি না তাহা আমি তখন জানি না, তার পরে আমার ছোটো ভাই ও মা কলিকাতা আসে। Estate যাহাতে court of wards-এ যাইতে না পারে সেই জন্য আমি ও ছোটো ভাই একসঙ্গে ও মা অপর এক দরখাস্ত board-এ দেই। তখন আমাদের উকীল হরেন্দ্র মিত্র ছিল, বড়ো পিউ সাহেব ও Jacason ব্যারিস্টার ছিল, board-এ কোনো ফল পাইলাম না। তারপরে আমার মা High Court-এ মোকদ্দমা করে। "Borss" attorney ছিল। ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ব্যারিস্টার ছিল। আর একজন ছিল, মনে নাই। তারপরে court of wards estate ছাড়িয়া দিল আমার মা মোকদ্দমা তুলিয়া নেন। তারপর আর Mayar সাহেব আমাদের estate-এ ম্যানেজার ছিল না। তারপর আমি আমার ছোটো ভাই, বড়ো ভাই ও মা সকলেই জয়দেবপুর ফিরিয়া আসিলাম। তারপরে যোগেশ মিত্র মানেজার হয়। তারপরে জ্ঞানশঙ্কর সেন ম্যানেজার হয়। দার্জিলিং যাওয়ার আগে শেষবার তিন ভাই, তিন বৌ কলিকাতায় যাই। বড়ো ভাই আগে যায়, লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ী থাকে।

লাভচাঁদ মতিচাঁদের বাড়ী ভাড়া করে। সেই বাড়ীতে আমরা প্রথম যাই। তারপরে আমরা ভিন্ন বাসা করি। বড়ো ভাই জলের কলের কাছে একটা বাসা করে। আমরা ওই বাসার দক্ষিণ দিকে একটা বাসা করি। দিগেন্দ্র ব্যানার্জি আমার পুত্রা। আমার

বড়োবোনের মেয়েকে তাহার ভাই বিবাহ করিয়াছে। এই সময় দিগেন্দ্র ব্যানার্জি আমার সঙ্গে ছিল। সেই সময় আমার সিফিলিস অসুখও ছিল। তখন আমার দুই হাতে ও ঠেং-এ সিফিলিসের ঘা ছিল। তখন আমার চিকিৎসা হইয়াছিল, ব্রহ্মচারী চিকিৎসা করে। আর কোনো ডাক্তার আমাকে দেখিয়াছিল কি না মনে নাই। আমার পিত্তশূলের ব্যথা জীবনে কখনও ছিল না।

কলিকাতা হইতে আমরা মাঘ মাসের শেষে শৈলেন্দ্র মতিলালের সহিত ফিরি, শৈলেনবাবু আমার বড়ো ভাই-এর শালা হয়। শৈলেনবাবু কলিকাতা হইতে আমাদের সঙ্গে আসেন। আমরা যখন কলিকাতা হইতে আসিলাম, তখন আমার শালা সত্যেনবাবু কলিকাতা ছিল। আমরা কলিকাতা হইতে আসবার পরে সত্যের সহিত আমার জয়দেবপুরে দেখা হইয়াছিল। দার্জিলিং যাওয়ার কথা আমার শালাই উত্থাপন করে। দার্জিলিং যাওয়ার আগেও Lord Kitchner-এর সঙ্গে শিকারে আমার শালা সত্য, যতীন মুখার্জি যায়। আমি ও সত্য এক হাতীতে যাই। বাঘ শিকার করিয়াছিলাম, শিকারের সময় সত্যবাবু ছিল না। যখন বাঘ ডাকছিল তখন সত্যবাবু ভয় পাইল ও তাহাকে এক বাড়িতে রাখিয়া আসিলাম।

দার্জিলিং যাওয়ার কথা বাড়ির সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। তখন আমার ঠাকুর মা ও আমার বোন জ্যোতির্ময়ী যাইতে চাহিয়াছিল। রাজবাড়ীতে বৌদের কেবল স্বামীর সঙ্গে কোথাও যাওয়ার প্রথা ছিল না। দার্জিলিং-এর বাড়ী দেখিয়ে যাওয়ার আগে আমার শালা ও মুকুন্দ গুণ জানিতে পারিয়াছিল বাড়ীর কে কে দার্জিলিং যাইবে। দার্জিলিং-এর বাড়ী ঠিক করা হইয়াছিল। সত্যবাবু ফিরিয়া আসিয়া এই খবর দেয়। বাড়ীব নাম মনে আছে। বাড়ী ঠিক করে আসার পরে আমার ঠাকুর মা বোনেরা যায় নাই। সত্যবাবু আসিয়া বলিল যে সেখানে বিধবাদের থাকিবার অসুবিধা আছে ও বাড়ী ছোটো। আমি, আমার স্ত্রী, আমার শালা সত্য, আশু ডাক্তার, আমার কেরাণী বীরেন ব্যানার্জি ও Clerk দুইজন ছিল। চাকর যামিনী, বিপিন, ঝগড়ি, প্রসন্ন, জব্বর গিয়াছিল। ঝগড়ির মা তীর্থদাই গিয়াছিল। আমরা যখন দার্জিলিং যাই তখন দিগেন্দ্র ব্যানার্জী জয়দেবপুর ছিল। দিগেন্দ্রবাবু সচরাচর জয়দেবপুর থাকে। আমরা যখন কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখন দিগেন্দ্রবাবু জয়দেবপুরে ছিল না, আমি তাহাকে টেলিগ্রাফ করাইয়া জয়দেবপুরে আনাই। দার্জিলিং যাওয়ার জন্য আনাই। তিনি দার্জিলিং যান নাই। কারণ সত্যবাবু বলিল যে মুকুন্দইতো আছে, তাহার যাইবার কোনো কাজ নেই। দার্জিলিং যাইয়া শরীর ভালই ছিল। ১৪/১৫ দিন পর আমার অসুখ হয়। রাত্রে পেট ফাঁপা ছিল। তার পরদিন আশু ডাক্তারকে কইলাম (বলিয়াছিলাম)। আশু ডাক্তার ভোরে একজন সাহেব ডাক্তার আনে। সাহেব ডাক্তার আমাকে ওষুধ দিয়াছিল। সেই ওষধ আমি খাইয়াছিলাম। তার পরের দিনও সাহেব ডাক্তারের ঔষধ খাই। তাহাতে

কোনও উপকার হয় নাই। তার পরে আশু ডাক্তার রাত্রে ঔষধ দিয়াছিল, ঔষধটা কাঁচের গ্লাসে করিয়া দিল। এই ওষুধ খাইয়া আমার কোনো উপকার হয় নাই। বুক জ্বালা করিয়াছিল, বমি হইয়াছিল। শরীর ছটফট করিয়াছিল। এই সব আশু ডাক্তার আমাকে ঔষধ খাওয়াইবার ৩/৪ ঘণ্টা পরে হয়। চিঁখের (চীৎকার) পাড়তে লাগলাম। সেই রাত্রে আর কোনো ডাক্তার আসে নাই। তার পরদিন আমার রক্তবাহ্যি হইতে লাগিল। শরীর খুব দুর্বল হইতে লাগিল। তারপরে আমি অজ্ঞান হইয়া গেলাম। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়া পর্যন্ত কোনো ডাক্তার আসিয়াছিল কিনা জানি না। তার পরে জ্ঞান হইয়াছিল। তখন আমি পাহাড়ে জঙ্গলে। তখন আমি খাটিয়ার মধ্যে শুইয়া আছি। খাটিয়া মাটির উপর ছিল, উপরে টিনের ছাপরা, সেখানে ৪ জন সন্ন্যাসী ছিল। আমার জ্ঞান হইলে আমি বলিলাম, "কোথায় আসিলাম—আমি?" সন্ন্যাসীরা বলিল, "তোমার শরীর দুর্বল, কথা কইও না" এই কথা তাহারা হিন্দিতে বলিয়াছিল। তখন আমি হিন্দি বুঝিতাম। আমার বাড়ীর সহিস, কোচোয়ান, দারওয়ান, মাহুতের কাছে হিন্দি শিখিয়াছি। তারপরে আমি কোনো কথা কই নাই।

আমি ছাপরায় ১৫/১৬ দিন ছিলাম। তখন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয় নাই। ১৫/১৬ দিন পরে আমি সেখান হইতে চলিয়া যাই। ওই ৪টি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যাই, হাঁটিয়া গেছি ও Train-এ গেছি; তার পরের কথা আমার মনে আছে যে আমি কাশীতে গেছি। কাশী অশীঘাটে ছিলাম। তখনও ওই ৪টি সন্ন্যাসী সঙ্গে ছিল। অশীঘাটে সাধুর আশ্রমে ছিলাম। সেখানে আরও লোকের সঙ্গে দেখা হয়। বাঙালী ও পশ্চিমা সাধুর সাথে দেখা হইয়াছিল। বাঙালী সাধু দুইজনের সঙ্গে কথা হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে বাঙালা, হিন্দি সাধুর সঙ্গে হিন্দিতেই কথা হইয়াছিল। ওই সাধু ৪ জনের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হিন্দিতে হইয়াছিল।

অশীঘাটে থাকাবস্থায় আমি কে, আমার বিষয় কিছুই স্মরণ ছিল না। আমি অশীঘাটে ৪/৫ মাস রহিলাম। আমার সঙ্গের ৪ জন সাধুও রহিলেন। দার্জিলিং হইতে অশীঘাট পর্যন্ত ১ বছর সময় যায়। অশীঘাট হইতে বিন্ধ্যাচল যাই। সঙ্গে ৪জন সাধুও ছিল। বিন্ধ্যাচল হইতে চিত্রকুট যাই। সেখান হইতে এলাহাবাদ, সেখান হইতে বৃন্দাবন। বৃন্দাবন হইতে হরিদ্বার। তারপর হৃষিকেশ। সেখান হইতে লছমনঝোলা। তারপর কাশ্মীর। কাশ্মীরে করামুলা Subdivison শ্রীনগর রাজধানীতে যাই। সেখান হইতে অমরনাথ পৌছি, এই স্থান হইতে হেঁটে ও Train-এ গিয়াছি। হাঁটিয়া যখন যাই তখন পাহাড় জঙ্গল দিয়া যাই। অশীঘাট হইতে অমরনাথ যাইতে ৪ বছর লাগে। অমরনাথ একটা তীর্থ। যাহারা অমরনাথ যায় তাহারা নীচে যে গ্রাম আছে সেখানে থাকে। অমরনাথে ২৩ দিন থাকি।

অমরনাথ থাকাকালীন আমি শিষ্য হই ও মন্ত্র লই। ধর্মদাসের শিষ্য হই ও তাঁহার

নিকট হইতে মন্ত্র লই। ধর্মদাস ওই ৪ জনের মধ্যে একজন। মন্ত্র আমার মনে আছে। মন্ত্র লওয়ার পরে সাধুরা আমাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া ডাকিত। মন্ত্র নেওয়ার পর আমি কোথা হইতে আসিয়াছি এই সম্বন্ধে আমার ধারণা হইয়াছিল। মন্ত্র নেওয়ার পরে আমার গুরুর সঙ্গে কথাবার্তা হইয়াছিল। এর পরে আমার ধারণা হয় যে আমাকে দার্জিলিং শ্মশানে ভিজা অবস্থায় সন্ন্যাসীরা পায়। তাহাদের সঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত আমি কে, বাড়ী কোথায় ইত্যাদি আমার কিছুই মনে নাই। আমি মাঝে মাঝে মনে করিতাম আমার বাড়ীঘর আত্মীয় কোথায় আছে এই কথা মনে করিতাম। আমার আত্মীয় স্বজনের কাছে বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার আলাপ হইত। গুরু বলতেন, সময় হইলে তোমাকে বাড়ীতে যাইতে দিব। সময় হওয়া মানে কি আমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমি এই বুঝিলাম যে, যদি সংসারের মায়া, আত্মীয় স্বজন বাড়ী ঘরের মায়া ছাড়িয়া আসিতে পারি তাহা হইলে আমাকে সন্ন্যাস দিবে। ইহা আমি অমরনাথ ছাড়িবার পরে হইল। এই কথা আমি বাড়ী ফিরিয়া আসার ১ বছর আগে হয়। অমরনাথ হইতে আমি ওই ৪ জন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আবার উত্তরে গেলাম। চম্বা পাহাড়, চাম্বা রাজধানী, বুল্লু পাহাড় তারপর শুচেতমুণ্ডী গেলাম। সেখান হইতে নেপালে যাই। অমরনাথ হইতে শুচেতমুণ্ডী যাওয়া পর্য্যন্ত ২/৩ বছর লাগে। হাটিয়া ও Train-এ গিয়াছি। শুচেতমুণ্ডী হইতে নেপাল যাইতে ২/৩ বছর লাগল। নেপাল পশুপতিনাথ তীর্থে গিয়াছি। পশুপতিনাথে একজন বড়ো সাধু আছেন। তাহার নাম বাঙালীবাবা। তাহার কাছে আমি গিয়াছিলাম। বাঙালীবাবা হিন্দি বলে। নেপাল হইতে আমরা তিব্বত যাই। তিব্বত হইতে ফিরিয়া আবার নেপালে আসিলাম। নেপাল হইতে তিব্বত ও তিব্বত হইতে নেপালে যাইতে আসিতে ৩/৪ মাস লাগে। তারপর নেপাল হইতে নীচে আসি এক বছর পরে। নেপাল হইতে যখন নামি তখন ওই ৪ জন সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে ছিল। নেপাল হইতে বরাহছত্তর আসি। বরাহছত্তরে যখন আসি তখন আমার মনে হইল যে আমার বাড়ী ঢাকা, তখন আমি এই বিষয়ে গুরুকে বলিয়াছিলাম। গুরু বলিল যাও, তোমার সময় হইয়াছে। আমি বুঝিলাম দেশে বাড়ীঘরে যাইতে হইবে। বাড়ী হইতে ফিরিয়া যদি আসি তাহা হইলে তাঁহার সহিত হরিদ্বারে দেখা হইবে, একথা সে বলিল। বরাহছত্তর হইতে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। তখন আমি একা ঘুরিয়াছি; বরাহছত্তর হইতে প্রথম পূর্ণিয়া জেলায়, তারপর রংপুর, তারপর কাম্যাখ্যা, তারপর গৌহাটি। গৌহাটি হইতে Train-এ উঠিলাম, Train-এ ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে উঠিলাম। তারপর ফুলছড়ি হইয়া ঢাকা আসিলাম। মন্ত্র নেওয়ার পর হইতে পরনে কৌপিন ছিল। চুল জটা ছিল, হাতে করঙ্গ ছিল। করঙ্গটা লাউর তৈয়ারী, করঙ্গকে কমণ্ডলু বলে।

আমার দাড়ি ছিল। আমি ঢাকায় রাত্রি ১২টা ১টার সময় আসিয়া পৌঁছিলাম। সেই রাত্রে ঢাকা স্টেশনেই রহিয়া গেলাম। ভোরে স্টেশন হইতে সদরঘাটে আসিলাম।

নিজেই সদরঘাটে চলিয়া আসিলাম। স্টেশনে নামিয়া আমার মনে হইল যে আমি এখানে বহুদিন চলাফেরা করিয়াছি। সদরঘাটে যাইয়া নদীর মধ্যে যে চর আছে সেখানে গেলাম। সেখান হইতে বেলা ১০টার সময় ফিরিয়া আসিলাম বাকল্যাণ্ডবাণ্ডে। সেই দিন Bukland Band-এ রহিলাম, রঘুবাবুর বাড়ীর গেটের সামনে থাকি। এই রকম ২/৩ মাস ছিলাম। ওখানে থাকার সময় বহু লোকজন আমার কাছে আসিত। তাহাদের এই রকম কথা হইত যে "এ-ই ভাওয়ালের কুমার, এই মেজকুমার"। তাহাদের মধ্যে আমার বহু চেনা লোক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গে আমার এমনি বাজে কথা হইয়াছে। তাহারা আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বলিত। আমি হিন্দিতে কথা বলিতাম। আমার গুরুর নিষেধ ছিল, বাংলায় কথা বলা। আত্মপরিচয় দেওয়া নিষেধ ছিল। আমি কাশীমপুরের প্রসাদ রায়কে চিনি। যখন আমি Bukland Band-এ ছিলাম তখন অতুলপ্রসাদকে দেখিয়াছিলাম। তাহার সঙ্গে আমার ২/৩ দিন কথা হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিতেন "মেজকুমার।" তিনি আমাকে ২/৩ বার কাশীমপুর লইতে চাহিয়াছিলেন।

তিনি আমাকে মেজকুমার বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন। আমাকে বলিলে আমি কাশীমপুর Train-এ গিয়াছিলাম। সঙ্গে ভুলু ছিল। ভুলুই অতুলপ্রসাদ রায়। Train-এ জয়দেবপুর গেলাম, সেখান হইতে হাতীতে কাশীমপুর গেলাম। দার্জিলিং যাওয়ার পূর্ব্বে সারদা বাবু ও ভুলুর সঙ্গে বহু চিনা ছিল। সেখানে ৫/৬ দিন ছিলাম। সেখানে খাওয়া দাওয়া করিয়াছি। তখন সেখানে সারদা, তার বড়ো ও ছোটো ভাইয়ের ছেলেরা ছিল। অতুল সারদা বাবুর বড়ো ভাইয়ের ছেলে। যখন খাওয়া করি তখন অতুলও ছিল। অতুলের পিতার নাম অন্নদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী। আমার জিহ্বা ভার থাকায় মাঝে মাঝে কথা বাহির হয় না। আমার খাওয়ার সময় খাওয়ার ঢং দেখিয়া সারদাবাবু বলিয়াছিলেন এ মধ্যম কুমার। মধ্যম কুমারও এইভাবে খাইত। তর্জনী উঠাইয়া সাক্ষী বলেন—আমি বরাবরই এইভাবে খাইয়াছি। দার্জিলিং যাওয়ার আগে আমি অনেকবার সারদা ও অতুলের সঙ্গে খাইয়াছি, আমার খাওয়া দেখিয়া সারদাবাবু বলিয়াছিল যে, "এই রকমে মেজকুমার খাইত। আমার সন্দেহ হয় এই মেজকুমার।"

কাশীমপুর হইতে জয়দেবপুর আসি। যোগেন্দ্র ব্যানার্জির ছেলে রাম আমাকে অতীতে হাতীতে জয়দেবপুর লইয়া যায়। তখন রাম কাশীমপুর Estate-এ সারদাবাবুর কর্ম্মচারী ছিল। যোগেন্দ্রবাবু তখন রাজ বাড়ীতে কাজ করে। রাম এখন কোথায় কাজ করে জানি না। ওই হাতী রাজবাড়ীর। জয়দেবপুরে সন্ধ্যা ৬টা সাড়ে ৬টায় পৌঁছি। রামের সঙ্গে ২/৩ জন লোক আসিয়াছিল। জয়দেবপুরে আসিয়া সেদিন মাধববাড়ীতে থাকি। রাজবাড়ীর মধ্যে নামি।

সেখান হইতে মাধব বাড়ী যাই। তখন আমার এই সব জায়গা চেনা মনে হইত। মাধব বিগ্রহ আছে। আমাদের জয়দেবপুরের রাজার ওই বিগ্রহ। আমি সেই রাত্রে

মাধব বাড়ীতে যে কামিনী ফুলের গাছ আছে সেই গাছের নীচে থাকি। কাশীমপুরের লোকেরা আমার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলিত। আমিও হিন্দিতে কথা বলিতাম। আমি তাহাদের হিন্দিতে বলিয়াছি কারণ আমার গুরু আমাকে আত্মপরিচয় দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই রাত্রিতে কামিনী ফুল গাছের নীচে বহু লোকজন আসিয়াছিল। সেই রাত্রে সেখানেই বসিয়াছিলাম। তার পর দিন মাধব বাড়ীর উত্তর দিকে একটা গলি আছে, বাড়ীর মধ্যে যাওয়ার সেই গলি দিয়া বাড়ীর মধ্যে গেলাম। সেই রাস্তা মেয়েদের যাওয়ার রাস্তা। ওই গলি দিয়া গিয়া খাজাঞ্চিখানার পায়খানা, আমি নিজেই চিনিয়া গেলাম। পায়খানা হইতে আসিয়া স্নান করিলাম। পায়খানার মধ্যে কল আছে, সেই কলে স্নান করিলাম। সেই পায়খানাটা Under drain-এর। সেই drain চিলাই নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। স্নান করিয়া মাধব বাড়ীতে আসিলাম। তারপরে একটা গোল বারান্দা আছে সেইখানে আমার ছোটো ভাই থাকিত, সেখানে গেলাম ও বসিলাম। সেদিন দুপুর পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম। তারপর সেখানে জয়দেবপুরের মেয়ে ছেলে স্ত্রীলোক বুড়া বহুলোক আমাকে দেখিতে আসে। তারপর বুদ্ধু সেখানে আসে। তারপর বৈকালে সাড়ে ৬টার সময় আমাকে জ্যোতির্ময়ী দেবীর বাড়ীতে নিয়া যান। সেখানে যাইয়া আমার ঠাকুরমা রাণী সত্যভামা, বোন জ্যোতির্ময়ী, ভাগিনা, (বোনের ছেলে) বড়ো বোনের ছেলে সেখানে ছিল।

তাহাদের চিনিলাম। সেখানে একটা ঘরে ছিলাম। রাজবাড়ীর অন্যান্য জায়গা দেখিয়া সমস্ত চিনিলাম, কারণ ২৫ বছর ছিলাম। আমার আত্মীয় স্বজনকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। সেখানে আমার বোন ও ঠাকুরমার সঙ্গে অনেক কথা হয়। আমি তখন তাদের সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলিয়াছি। আমার বোন হিন্দিতে কথা বলিতে পারে। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলিয়াছেন। ঠাকুরমা দাঁড়াইয়াছিল। আমি সেদিন আত্মপরিচয় দিই নাই। আত্মীয় কুটুম্ব দেখিয়া মায়া হয় না? আমারও মায়া হইয়াছিল। এক ঘরে থাকিয়া তারপরে আবার রাজবাড়ীতে ওই গোল বারান্দায় গেলাম। সেই রাত্রে সেই গোল বারান্দায় রহিলাম। তার পরদিন বুদ্ধু আমাকে খাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করিল। আমি গোটা ১২টার সময় নিমন্ত্রণ খাইতে যাই। আমি সমস্ত আত্মপরিচয় দেই নাই।

পরিশিষ্ট ৩

১৯২১ সালে মধ্যম কুমার ফিরবার আগে থেকেই বহু কবিতা পুস্তক বের হয়েছিল এবং এর অধিকাংশই ঢাকা থেকে প্রকাশিত। আমরা এখানে ঢাকা ও কলকাতা থেকে আগে-পরে প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তিকা থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। এতে বুঝতে পারা যায় যে, জজ রায় দেবার আগেও কতকগুলি স্বার্থান্ধ লোক ছাড়া সকলেই সন্ন্যাসীকে কুমার বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

অতি ছোটো রাজ্য এক ভাওয়াল নাম,
ঢাকা জেলা মাঝে তাহা ছিল পুণ্যধাম।
যতদিন রাজা বাঁচে প্রজার আনন্দ,
অমরার সুখভোগ সুরভির গন্ধ।
একে একে রাজা মরে কুমার সকল,
তিন পুত্রবধূ রাজ্য করিল দখল।
তিন রাণী ভাওয়ালে তিন অংশীদার,
কোর্ট অফ ওয়ার্ডস শুনি কর্ণধার।
পতিহীনা পুত্রহীনা তিন রাণী হয়,
রাজবংশে বাতি দিতে কেহ নাহি রয়।
বড়োরাণী মেঝরাণী ভাবে বংশ নাশ,
ছোটোরাণী পুষ্যি নিয়ে করে সুখে বাস।

* * *

ভাওয়ালে আজ আগুন জ্বলেছে কপাল পুড়েছে কার?
মামলা বেধেছে রাণী সন্ন্যাসীর রহস্য চমৎকার।
বহুদিন আগে মৃতদেহ যার পুড়ে হয়ে গেল ছাই,
কোথাকার এক সাধু এসে বলে সেই আমি মরি নাই।
ভাওয়াল রাজ্যে আমি পরিচিত মধ্যমকুমার হই,
মিথ্যা আমার মৃত্যু রটনা—জাল প্রতারক নই।
যাবে দার্জিলিং স্টেপ-এসাইডে রোগের কারণে যাই,
সে রোগে এমন মরণ হইবে কভু তাহা ভাবি নাই।

যদি মরে থাকি বেঁচেছি আবার ভূত প্রেত নহি দানা,
আমারে যাহারা চিনিয়া চেনে না নিশ্চয় তাহারা কানা।

* * *

কোর্টে গিয়ে জানায়, সাধু রাজার ছেলে সে,
মরেনি তবু মরার মতো ফেলে দিয়েছে কে?
বাধিয়া উঠিল বিরাট মামলা দুই দলে রেষারেষি,
উভয় পক্ষের জবর সাক্ষী সন্ন্যাসীর কিছু বেশি।
দুই পক্ষে হয় কত অর্থবৃষ্টি উকিল চুষিয়া খায়,
কাহার ভাগ্যে কে জানে কি ঘটে জগতে দেখিতে চায়।
তিনটি বছর মামলা চলিল কোর্টে শুধু হুড়োহুড়ি,
কত অসামাল হয়ে গেছে চাপে ছিল যার মোটা ভুঁড়ি।

* * *

পাগলা হয়েছে বাঙলা দেশটা ধৈর্য থাকে না আর,
এখনও রায় বার হয় নাই ভাওয়াল মামলার।
কেন মানুষের এত আগ্রহ 'কি হবে' 'কি হবে' রব,
চারিদিকে এই নিয়ে হৈ চৈ উন্মাদ হয়েছে সব।
কি রহস্য ভরা মামলার মাঝে ঠিক নাহি বোঝা যায়,
কুমারের বেশে অদ্ভুত সন্ন্যাসী ফেলিয়াছে সমস্যায়।
যদি রায় দেয় সন্ন্যাসী কুমার জগতে পড়িবে সাড়া,
কত ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিবে শহর নগর পাড়া।
শুধু নহে রাণী শিক্ষিতা নারীরা মাথা নীচু' করি রবে,
এমন জঘন্য লজ্জার কাহিনি কে শুনেছে বল কবে?
বাংলা দেশের কেউ দেখেনি এমন নারীর রূপ,
কেচ্ছার কথা শুনলে কানে সবাই বলে চুপ।
পিশাচিনীর মূর্তি দেখে উঠছে কেঁপে বুক,
সারা দুনিয়ার পুরুষজাতির শুকিয়ে গেছে মুখ।
টাকার বলে মামলা বাধায় ছয়কে করে নয়,
হিন্দুনারীর কীর্তি দেখে মরতে ইচ্ছা হয়।
বিচারকের খরদৃষ্টি এড়িয়ে যাবে কে?
ধরা পড়ল মেঝরাণীটি অপরাধিনী সে।

* * *

ডাক্তার হল হাতের পুতুল গোপন কথা কতই চলে,

প্রাণের রাজা হাঁফিয়ে মরে বিষের জ্বালায় পড়ল ঢলে।

* * *

ইডেন গার্ডেনে, লেক, সরোবরে মধুপ্রীতি গুঞ্জরণে,
পাশাপাশি চলে কত হাসাহাসি আবেগ-মাখানো সুখ,
বিচ্ছেদ ব্যথায় আকুল হৃদয় আঁখি জলে ভরপুর।

ভাইকে দেখে চিনতে পারো স্বামীকে দেখে বললে নাগা,
দরোয়ান ডেকে বললে হেঁকে আপদটারে লাঠিতে ভাগা।
গর্বে বেড়াও বুক ফুলিয়ে সর্বহারা স্বামীর বাড়ি,
যার শিল তার নোড়া দিয়ে তারই ভাঙো ভাতের হাঁড়ি।
শয়তানিতে বুদ্ধির ধাড়ি কীর্তি রবে চমৎকার!
বিচার হলে পড়বে ধরা নাগা সাধু স্বামী তোমার।
গর্ব গেল কোথায় এখন তেজ দম্ভ দেখাও নারী,
আর কেন গো বিধবা বেশ পর একবার সিঁদুর শাড়ি।

* * *

শত শত প্রজা সাক্ষী নিয়ে কোর্টে দাঁড়ালো সন্ন্যাসী বাদী,
রণং দেহি বলে রাণী'ও দাঁড়ালো, কে জানে কে অপরাধী।
আড়াই বছর মামলা চলিল আইনের জাল ঘেরা,
কীর্তি রহিল বাদী ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জীর জেরা।

* * *

বাঙাল রাজা কাঙাল করে উঠল হেসে সর্বনাশী,
সধবা রাণী বিধবা সেজে বাজিয়ে যায় বিষের বাঁশী।
দিনে খায় কাঁচকলা ভাতে রাত্তিরেতে পাঁঠার ঝোল,
বাইরে চলেন ডিঙি মেরে, ঘরের ভেতর গণ্ডগোল।
পাপ কি কখন ঢাকা থাকে আপনি ওঠে ফুঁড়ে,
ধরা পড়'ল সর্বনাশী কোথায় যাবে উড়ে।
বাঙালী মেয়ের সাহস দেখে চমকে ওঠে পিলে,
হাসি মুখে দিচ্ছে বিষ স্বামীর মুখে ঢেলে।

* * *

ভাওয়ালেতে ছুটল হাসি সাত সাগরের বান,
হাজার হাজার প্রজার মুখে হাসির কত গান।
চাপা হাসি মুচকি হাসি বিকট অট্টহাসি,
গোমড়া মুখে পোড়ার হাসি দেখতে ভালোবাসি।

কপট হাসি উদ্ভট হাসি হাসির কত ঢেউ,
এমন হাসি ভাওয়ালেতে দেখেনি কভু কেউ।

*   *   *

'ঘোমটা দেওয়া খেমটা নাচের খেইড় টপ্পা চলে,
রাজ পথেতে মাতাল নাচে বেতাল পড়ে ঢলে'।
চায়ের দোকানে টেবিল ফাটে মজলিসেতে ধূম,
ভাওয়ালবাসী ভুলেই গেছে রাত দুপুরের ঘুম।
শুনছি নাকি ও ঠাকুরঝি! বলছে ঘরের বউ,
কার হাঁড়িতে লুকিয়ে নাকি কে খেয়েছে মৌ।
কোন্ সাধু এক জুটলো এসে বলছে হেসে হেসে,
রাজার বাড়ির মজার কথা—দেশ গিয়েছে ভেসে।
বউ কথা কও পাখির ডাকে শিউরে ওঠে প্রাণ,
কপালপোড়া বিধবার কে ঘোমটায় দেবে টান।
রাত্তিরেতে চাঁদের হাসি সুধার ধারা ঢালে,
ঘুম পাড়ায় না চুম্ দিয়ে কেউ আমার দুটি গালে।

*   *   *

দম্ভভরে রাণী বলে ওই সাধু জুয়াচোর জটাধারী,
জয় হলে মোর একটি লাথিতে পাঠাব যমের বাড়ি।
আমার নামেতে কলঙ্ক আরোপ উহু জ্বলে যায় প্রাণ,
চাপ দাড়ী ধরে দেব ঘুরপাক ছিঁড়ে নেব দুটি কান।
দেশটা জুড়ে কেচ্ছা বেরোয় ভাওয়াল রাণীর কীর্তি বটে!
কুলবধূরা লজ্জায় মরে—ঘৃণায় তাদের ন্যাক্কার ওঠে।
কেউ বলছে দূর দূর দূর মুখে আগুন ঐ রাণীটার.
দেশ মজাল কলঙ্কিনী এমন কাণ্ড দেখিনি আর।
ছাই ভস্ম মেখে গাঁজা-গুলি খেয়ে লালসা আমার পরে,
ঠ্যাংয়ে দড়ি বেঁধে আকাশে ঝুলাবো ভণ্ড সাধু ঠিক তোরে।
দেখিব প্রজারা বিপক্ষে যাহারা সাক্ষী দিয়েছে গর্বে,
ভিটে মাটি চাটি কবির তাদের খাজনা আদায় পর্বে।
প্রজারা শুনায় বেশ! বেশ! আগে হও তুমি জয়ী,
তারপর রাণী রাঙাইও আঁখি বিভীষিকা মূর্তিময়ী।

*   *   *

তবু শোন রাণী সন্ন্যাসী রাজার নহে তাহা পরাজয়,
হাজার প্রজার অন্তরে যেজন গরবে বসিয়া রয়।

আজি শুনি কত শিক্ষিতা নারীর চরিত্র ফুটেছে বেশ,
আপনার হাতে বিষ দিয়ে মুখে স্বামীরে করিছে শেষ।

* * *

কোথা গেল বিভা! প্রাণের বনিতা জীবনের চিরসাথী,
ছাড়িয়া আমারে থাকিও না দূরে আজি এ মরণ রাতি।
অপরাধী আমি করিও না ঘৃণা ভুগিয়াছি বহু রোগে,
আপনার পাপে আপনি হয়েছি বঞ্চিত সুখভোগে।
অপদার্থ আমি, মূর্খ স্বামী তব কত না দিয়াছি ব্যথা,
আজিকার মতো সব ভুলে যাও হেসে কও দুটি কথা।
কুসুম কোমল হাত দুটি দাও একটু বুলায়ে বুকে,
এত জ্বালা কেন? কি ওষুধ ঢালি দিয়াছ আমার মুখে?
বিষের মতন জ্বলিছে নিয়ত রুদ্ধ হ'য়ে আসে শ্বাস,
শুধু হেরি চোখে সরিষার ফুল ঘটে বুঝি সর্বনাশ।
কোথায় ডাক্তার! তীব্র হলাহল ভুলে তো দাওনি তুমি?
সামান্য একটু পেটের অসুখে মরিতে বসেছি আমি।
কোথা বিভাবতী জীবনের সাথী প্রেয়সী রূপসী রানি,
এস প্রিয়া কাছে রূপ দেখে ভুলি যন্ত্রণা একটুখানি।
কে আমার কণ্ঠে ঢেলেছিল বিষ একটু কাঁপেনি হাত,
কাঁপেনি বক্ষ টলেনি চরণ বিবেকের করাঘাত।

* * *

মরণের পরে লভিয়া জীবন চিনিলাম আজি তারে,
সে আমার প্রাণে বড়ো দাগা দেছে কেমনে বুঝাব কারে।
সে আমার বুকে ভীম পদাঘাত করিয়াছে সুকৌশলে,
অতুল কীর্তি রেখেতে জগতে কুটিল বুদ্ধির বলে।
সন্ন্যাসী বলে, আশ্চর্য ব্যাপার সকলে চিনিছে যারে,
কি লজ্জার কথা! আপন বনিতা চিনিতে পারে না তারে?
মরিলেও স্বামী জীবনে ভোলে না পতির মুরতি সতী,
হিন্দু-নারী আজ একি কথা কয়, কেন হেন মতি গতি?
সন্ন্যাসী বলে, মরি নাই আমি বেঁচেছি পুণ্যের বলে,
আমার মৃত্যুর গোপন রহস্য প্রকাশিতে ধরাতলে।
গুরুজী যখন কহিল কুমারে পরিচয় তব দাও,
কাহার সন্তান কোথায় নিবাস ঘরে ফিরে আজি যাও।
হলাহল পান করেছিলে তুমি কিসের কারণে শুনি,

পাহাড়ের নীচে মৃতের সমান পড়েছিল দেহখানি
সেদিন আকাশে প্রলয় গর্জন লয় হবে যেন সৃষ্টি,
ভীষণ দুর্যোগ প্রকৃতির খেলা মুসলধারায় বৃষ্টি
বিযে ছিলে মরমর আহত বিক্ষত দেহ,
স্বেচ্ছায় তোমার এ দুর্দশা কিংবা অপরে করিল কেহ।

*　　　*　　　*

ললাটে তোমার রাজার চিহ্ন চেহারা রাজার মতো,
সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমি দেশে দেশে বহুদিন হ'ল গত।
যাও ফিরে এবে ঘরের সন্তান আত্মীয় স্বজন বুকে,
বনিতা সংসার যদি থাকে হেথা কাটাও কিসের দুঃখে?
কহিল কুমার গুরুজী আমার পরিচয় তবে শোন,
ভাওয়ালে মোর জনম হইল রাজার সন্তান কোন।

*　　　*　　　*

মধ্যমকুমার আমি—হায়! ভাগ্যদোষে,
গৃহহীন দীনহীন বিধাতার রোষে।
পরীক্ষা করিতে চাও চিহ্ন আছে তার,
বন্দুকের গুলি বিদ্ধ উরুতে আমার।
শিকার সন্ধানে গিয়ে এ বিপদ ঘটে,
একথাটা দেশময় রটেছিল বটে।
প্রজারা চিনিয়া রাজা আনন্দে উতল,
জয় জয় নাদে তব কাঁপে দিঙ্‌মণ্ডল।
ঢাক ঢোল বাজে শাঁক উলু উলু ধ্বনি,
চারিদিকে ভারি গোল রহস্যের খনি।

(নগেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত *ভাওয়ালে রাণী সন্ন্যাসী লড়াই সিরিজের পুস্তকাবলী* থেকে গৃহীত।)

"মা তোর লীলাক্ষেত্র ভারত ভূমে কালক্রমে
কত লীলা হয়।
মা তোর পূর্ববঙ্গ রঙ্গ স্থল, অমঙ্গলে সুমঙ্গল
হতেছে কত লীলার অভিনয়।
(মাগো) শুনলেম অতি প্রিয় পুত্র তোমার
জয়দেবপুরের মধ্যমকুমার, মরেছিল দার্জিলিং পাহাড়ে,
সৎলোকেরা শ্মশান ঘাটে এলো সৎকার করে।

শ্রাদ্ধ শান্ত হয়ে গেল, আবার মরা মানুষ ফিরে এল,
বার বৎসর পরে
দেশের রাজা প্রজা জমিদার সব কি উৎসাহে ছুটল,
ভাওয়ালের আকাশে উঠল অমাবস্যার পূর্ণ শশী,
রাজার স্বার্থের বন্ধু যারা যারা, স্বার্থ সাধন করতে তারা
রাজকুমারকে বিষ খাওয়াইয়েছিল,
শ্মশান বন্ধু হয়ে তারাই শব শ্মশানে নিল।
বিষম শিলা বৃষ্টি ঝড় বাতাসে, শব ফেলে সব পালায় ত্রাসে,
নাগা বাবা ধর্ম দাসে, এসে পুনর্জীবন দিল।
এখন সম্মিলনের মহাযজ্ঞে, দেখতে পাব যোগ্যাযোগ্যে
শালার ভাগ্যে রানির ভাগ্যে, জানি শেষকালে কি হবে?
এমন মায়া মোহে পেয়ে দাগা, কত রাজ্যের কত হতভাগা,
কত রাজ্য করে দিল মাটি? কত সোনার সংসার করলি ছারখার।
তুই শ্মশানের বেটি।
আমরা হয়ে জীবন্মৃত, ছাইতে ঢালিয়ে ঘৃত
অন্ধকারে অবিরত কেবল ভূতের বেগার খাটি।

* * *

অনেকের মন দেহ, সন্দেহের কেন্দ্র,
অঙ্গের চিহ্নক দেখে, অনেকে কয়, এই সন্ন্যাসী সেই রমেন্দ্র
আধার বর্ধমানের রাজার মতো, হয়না যেন জাল প্রতাপচন্দ্র।
দেখতে সে চাঁদ বদনখানি, সতী লক্ষ্মীর শিরোমণি, এলোনা সে
রাজাররাণী, রাজার শালা সত্যেন্দ্র।
শুনলেন মুনসেফপুরের মুকুন্দ গুণ,
দিন দুপুরে হয়েছে খুন, পাপের আগুন জ্বললে কি আর নিভে?
হলো আশুবাবুর বাতব্যাধি—ধর্মে কয়দিন সবে?—(হরিচরণ)

* * *

হায়, বিভাবতি!
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুইলো অভাগী,
সে কাল জয়দেবপুরে, কালকূট দিতে
তার মুখে,—নিয়ে কোন সুদূর পাহাড়ে
কিম্বা—সমুদ্রের পারে?
কানে কানে পরামর্শ দিয়েছিলে মোরে
(আশু তার হইল সহায়)।

মজালে ভাওয়াল রাজ্য মজিলি আপনি!

* * *

বৃথা গর্ব, মোরে তুমি দাদা!
কণ্টকে কণ্টক দিব্য হইল উদ্ধার
কে মানিবে এ আদেশ?
উড়াও ফুৎকারে দাদা—ও কাগজগুলা
চলুক চলুক রণ, বলুক জগৎ
কলঙ্কিনী মোরে, তবু—হব না বিরত।
সত্যেন্দ্র সোণার ভাই—আশু যে সারথি
মণি কাঞ্চনের মতো রাখিবে আমারে
(তা'হলে) আমি কি ডরাই দাদা পাঞ্জাবী সাধুরে?

* * *

কিন্তু দাদা বড়ো সাধে ঘটিল বিষাদ,
কোন্ গৃহ-শত্রু কিম্বা, ত্রেতার দুর্মুখ
গুপ্তভাবে গুপ্তমন্ত্র করিয়া প্রকাশ
সর্বনাশ করেছে সাধন।
ভাগ্যবান সে মুকুন্দ গুণ,
দেখিল না পাপের আগুন,
লাগিল না তাৎ তার গায়।
বল দাদা কি হবে উপায়?
চল যাই উকিলের কাছে—
দেয় যদি ডিক্রিজারী—কি হবে তখন
ধরে যদি অস্থাবর বলে—রাখিবে কেমনে?

* * *

কহ রাণি!
কেমনে দেখাবে মুখ মানব সমাজে?
কেন আজি মত্ত সবে উৎসহ-কৌতুকে
কেন আজি নাগরিক সবে ধিক্ ধিক্ করিছে তোমারে?
ব্যবস্থা আফিং দড়ি কলসির কেন করিছে সকলে?
কার লাগি?

* * *

ভালই হলো, ভরসা হলো
আসল ভাওয়াল রবি,

কাঁপায়েয় পাপী, দাপায়ে তাপী
ভাসলো সোণার ছবি।
তাই ভাওয়ালে, দলে দলে
কু-চক্রী কাক শ্যাল
শকুন কুকুর জুটছে প্রচুর
কোত্থেকে এক পাল।
মাথা তুলি কুকুরগুলি
রাজার পানে চায়,
নাক দে শেষে, মাটি বসে
খত দিতেছে পায়।
* * *
(লয়ে) বোচকা বগলে, কুকুর দলে
ইস্টিশনে যায়।
পাপের বোঝা, নয়ত সোজা
পেছন পানে চায়।
খেংড়া খেয়ে, নেংড়া হ'য়ে
চেংড়া ছোটো জাত।
বাপের ভিটে, কেউবা ছুটে
কেউবা কুপোকাৎ।
এই বেলা, সুযোগ মেলা,
আশু সত্য..........লা
থাকতে কাণ, বাঁচা প্রাণ
জলদি করে পালা।—(কু—চ—ভ)

৩। হায় কি করলি সর্বনাশী ভায়ের সাথে মিশে
লাজের মাথায় বাজ হানিলি—মুখ দেখাবি কিসে?
মন যদি না-ই ছিল তোর করবি না তুই বিয়ে
কে নিছিল কলাতলায় গামছা গলায় দিয়ে।
তোর লাজেতে ছায় কপালি বাঙলা মরে লাজে,
কেমন ক'রে ভাবছি ওমুখ খুলবি লোকের মাঝে?
যা করলি তুই বেদ পুরাণে তার তুলনা নাই,
ভাত মুখে দিস, আর কেউ হলে মুখে দিত ছাই।
শাড়ি পরে গাড়ি চ'ড়ে লেকে মারিস পাড়ি,
দুত্তোরি তোর বাবুগিরির, মুখে খেংরামারি।

লজ্জাহীনের গোষ্ঠী তোরা দড়ি বজ্জাতিতে চাঁই,
ভাবিস কিগো এর পর তোদের মিলবে কোথা ঠাঁই।
বাপের বেটা ঘুচায় লেঠা জানল সেটা দেশ,
গলায় দড়ি গলায় দড়ি নাইকো লাজের লেশ!
দেশে করে কানাকানি আসলে নাই (তার) মূল,
গুরু লিখতে প্রথমেই তোর হ্রস্বউকার ভুল।
তোর ভুল, তোরই থাক আরও সাপটে ধর।
শুনগো কথা, বলছি ভালো, জলে ডুবেই মর।
আর করিস না দেরি—তোর মুখ দেখাবার আগে
ডুবে মর গঙ্গায় গিয়ে ধার কি ধারি রাগে?

* * *

আমি তারে ভালোবাসি, সে বেশি সুন্দর,
নারীর বৈধব্যে যার, প্রাণ করে হাহাকার
স্বজাতি সমাজে রহে করিয়া সমর,
লাজ ভয় করি ভষ্ম, যে বলে, 'সমাজ কস্য'?

* * *

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি
আপাতত স্বামী নাম কহিবারে নারি।
যমালয় বিপরীত সেই পাড়া খান,
আমার বাপের বিয়ে হয় সেই স্থান। (কু—চ—ভ)
আরও বেশি পরিচয় পেতে যদি চাও,
খোলা আছে ট্রাম বাস, সেইখানে যাও।
লাট নামে পথ ধরে করিও নজর
কুড়ি উন দেখেনিও বাড়ির নম্বর
কড়া নেড়ে সাড়া দিও সাধু না তস্কর
দেখা পাবে প্রায় সবে যথা পূর্বাপর।—(কু—চ—ভ)